শারদীয়া ১৩৮৬

প্রগতি

গোবিন্দচন্দ্র দাস ● সংগৃহীত লোকসংগীত ● চীনা গল্প ●
সাক্ষাৎকার : সলিল চৌধুরী ● বাংলা 'প্রগতি' নাট্যচর্চা ●
আলোচনা : মহাশ্বেতা দেবী ● মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য ●
বৃটিশ-ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ● কবিতা ● সংস্কৃতি সাময়িকী ●

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : দিব্যেন্দু সিংহ রায়

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সূচীপত্র

প্রস্তুতিপর্ব জুলাই-অক্টোবর ১৯৭৯

আলোচনা

চীন বিপ্লব (১৯১১) : গোবিন্দচন্দ্র দাসের একটি কবিতা এবং প্রসঙ্গতঃ—পুলক চন্দ···১

বঙ্গরঙ্গে অসামাজিক বুদ্ধিজীবী—পারঙ্গম রায়···৪৯

আজকের লেখা : কি ও কেন—মহাশ্বেতা দেবী···১৩৫

প্রবন্ধ

বৃটিশ শাসনে বিজ্ঞান ও কারিগরী নীতি : ১৭৯২—১৯১৩ —দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী···৮২

সাক্ষাৎকার : সলিল চৌধুরী—প্রসঙ্গ গণনাট্য···৬৭

গল্প

বসন্ত উৎসবের দিনগুলি—ওয়াং ওয়েন-সি (অনুবাদ : মণি দেব)···২৭

গান

চারটি লোকসংগীত···১৪

মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য—হেমাঙ্গ বিশ্বাস···৭৮

কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়···১৪৩ / মণিভূষণ ভট্টাচার্য···১৪৪

সব্যসাচী দেব···১৪৫ / সব্যসাচী সেনগুপ্ত···১৪৬ / রণজিৎ সিংহ···১৪৮

সংস্কৃতি সাময়িকী : ১৫১—১৬৮

সংসদীয় গণতন্ত্র এবং ভারতীয় সমাজ-গণতন্ত্রী / রাজহরা

সংবাদ / রাজনৈতিক থিয়েটার গড়ে উঠেছে কি ? / চীনে

ব্রেশ্‌ট্‌-চর্চা / গ্রন্থ সমালোচনা

'প্রস্তুতিপর্ব'র জন্য লেখা পাঠান

১। আজকের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিষয়ে গল্প, কবিতা, আলোচনা, এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ (বিশেষ ক'রে জনগণের সংগ্রামী ইতিহাস বিষয়ে) সাগ্রহে গৃহীত হবে। জনগণের সংগ্রাম ও সংস্কৃতিকে হেয় করে এমন লেখা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২। লেখককে নয় লেখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নির্বাচনের দায়িত্ব যৌথভাবে সম্পাদকমণ্ডলীর ওপর।

৩। লেখা নির্বাচিত না হলে তার কারণ জানানোর চেষ্টা করা হয় এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে অবশ্য ফেরত পাঠানো হয়। উত্তর পেতে দেরী হলে লেখকদের অধৈর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৪। লেখায় বিদেশী ভাষার উদ্ধৃতি থাকলে তার বঙ্গানুবাদ সঙ্গে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। মানি-অর্ডার কুপনে নাম, ঠিকানা ও কি কারণে টাকা পাঠাচ্ছেন স্পষ্ট অক্ষরে লিখবেন।

৬। বছরে চারটি সংখ্যা (জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর) প্রকাশিত হয়।

পরিবেশক : **কথাশিল্প** ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকার গ্রাহক হোন

গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক সডাক বারো টাকা। কোন বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত না হলেও গ্রাহকেরা মোট চারটি সংখ্যা পাবেন।

'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকার এজেন্ট হোন

এজেন্সী জমা দশ টাকা মানি-অর্ডার 'কথাশিল্পে' জমা দিতে হবে। প্রতি সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ কপি নিতে হবে। ভি. পি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক ব্যয় এজেন্টের। কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা—একশ কপি বা তার বেশি হলে শতকরা তিরিশ টাকা। ভি. পি. পি. ফেরৎ এলে জমার টাকা থেকে ডাক ব্যয় বাদ দেওয়া হবে। এজেন্সী নাকচ করতে চাইলে জমার টাকা শেষ অর্ডারের সাথে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হবে।

সম্পাদকমণ্ডলী : অনুপম মজুমদার, আশীষ লাহিড়ী, পুলক চন্দ,
প্রবীর মুখোপাধ্যায়, প্রাবৃট দাসমহাপাত্র

কার্যালয় ॥ কথাশিল্প : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

আশীষ লাহিড়ী কর্তৃক কল্পতরু প্রেস ৩০ বি জয়মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৫
থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ

বেঁচে থাকার কবিতা ৩·০০ দিবস রজনীর কবিতা ১·৫০ মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে (৩য় সং) ১·০০ পৃথিবী ঘুরছে (২য় সং) ১·০০ শীত বসন্তের গল্প ১·৫০ বাহবা সময়, তোর সার্কাসের খেলা ৭·০০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা (১ম খণ্ড) ১০·০০ এই জন্ম, জন্মভূমি ১·০০ ভিয়েতনাম, ভারতবর্ষ ১·৫০।

॥ কবিতা বুলেটিন ॥

ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে ০·৩০ আমাদের ইতিহাস স্যার ০·৩০ শিশুর কান্নার ঘর, শিশুর স্বপ্নের ঘর ০·৩০ জল পড়ে, পাতা নড়ে ০·৩০ আমার প্রতিবাদের ভাষা ০·৩০ এই সব দিনরাত্রি ০·৩০।

প্রাপ্তিস্থান ঃ কথাশিল্প—১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
উচ্চারণ—২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
প্রত্যয় কার্যালয়—ক্রীক রো, কলকাতা-১৪

সেপ্টেম্বরেই প্রকাশিত হচ্ছে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সে-তুং চিন্তাধারার আলোকে ঃ
(১) কমিউনিস্ট বিপ্লবী (নকশালপন্থী) আন্দোলনে বাম বিচ্যুতির প্রথম বিশ্লেষণ ; (২) **প্রকৃত প্রগতিশীল ও বস্তুবাদী স্বদেশপ্রেমিক** রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন ; (৩) ভারতীয় নয়াগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রূপরেখা সম্বলিত—

'প্রগ্রেসিভ স্টাডি গ্রুপ'-এর দ্বিতীয় নিবেদন

॥ মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর ॥

লেখক ঃ অমল ঘোষ

আনুমানিক ২৭৫ পৃষ্ঠার বইখানির সম্ভাব্য মূল্য—তের টাকা

পরিবেশক ঃ **'কথাশিল্প'** ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

Space donated by :

A WELL-WISHER

With best compliments from :

THE GOUREPORE COMPANY LTD.

Jute Goods Manufacturers

4, Fairlie Place
CALCUTTA 700 001

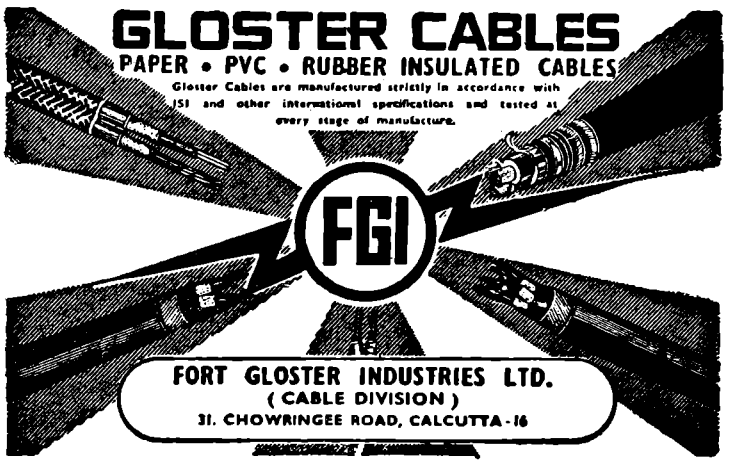

Space donated by :

A WELL-WISHER

আমাদের কথা

হাভানার জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন বুঝিয়ে দিল যে আজকের পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়াই সবচেয়ে আগ্রাসী ভূমিকায় আছে। রাশিয়ার দালালবর্গ—কিউবা, ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, কাম্পুচিয়ার ক্ষমতাসীন চক্রগুলি—যেভাবে পুরো আন্দোলনটাকে **খোলাখুলিভাবে** রাশিয়ার স্বার্থে পরিচালিত করতে চেয়েছে, তাতেই সেটা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালদের দেখা গেছে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায়। এটা লক্ষ্য করবার যে ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি হাভানাতে সরাসরি সোভিয়েত সুরে সুর মেলাননি, বরং যুগোশ্লাভিয়া প্রমুখ দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্লজ্জ সোভিয়েত-স্তুতির লাইন থেকে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনকে সরিয়ে আনতে সাহায্য করেছেন। ভারতে উভয় মহাশক্তিরই অর্থনৈতিক কব্জা এত শক্ত যে কোনো-একটিকে পুরোপুরি বাতিল করে স্থায়ীভাবে অন্য একটির কুক্ষিগত হয়ে পড়া ভারতের শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তারা সম্ভবতঃ সোভিয়েত এবং আমেরিকার প্রভাবের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

দেশের অভ্যন্তরে শাসকশ্রেণীগুলির সংকট যত তীব্র হয়ে উঠছে, একটি সঠিক সংগঠিত বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অভাব যত প্রকট হয়ে উঠছে, ততই জনগণের রুদ্ধ রোষ বিপথগামী হচ্ছে। দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার যে আগুন জ্বালছে শাসকশ্রেণীগুলি তা জনগণকে আত্মক্ষয়ী এক সর্বনাশা আবর্তের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে—তৈরি হচ্ছে ফ্যাশিজ্‌মের জমি। কেবল সমাজ-গণতন্ত্রীদের গাল দিলেই সমস্যা মিটবে না, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকেও জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হবে, এই ভঙ্গুর অথচ সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক কর্তব্য কতটুকু পালন করতে পারলেন।

এবার একটু চোখ ফেরানো যাক আমাদের পত্রিকার ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে।

গত সংখ্যা সম্পর্কে মিশ্র মতামত পাওয়া গেছে। অনেকেরই ভালো লেগেছে, অনেকে বলেছেন বেশি গুরুভার হয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, তাঁরা গুরুভার বিষয় দেখলে পেছিয়ে যাবেন, এটা খুব আশার কথা নয়। 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, ১৯৭৯' কবিতাটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বর্তমান সংখ্যার বিষয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার আছে। প্রথমতঃ, গত সংখ্যার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ সংখ্যায় আমরা 'গুরুভার' এবং সহজপাঠ্য লেখার মধ্যে একটা সমতা বিধানের চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ প্রবন্ধ মাত্র একটিই আছে—বৃটিশ-ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস। দ্বিতীয়তঃ, **সাম্প্রতিক** সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কে দুটি আলোচনা থাকছে এ সংখ্যায়: মহাশ্বেতা দেবীর 'আজকের লেখা: কি ও কেন', এবং পারঙ্গম রায়ের 'বঙ্গরঙ্গে অসামাজিক বুদ্ধিজীবী'। প্রস্তুতিপর্বে এ ধরণের লেখার অনুপস্থিতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তৃতীয়তঃ, স্থানাভাববশতঃ বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশ করা গেল না। চতুর্থতঃ, লেখাগুলি ঠিক ঠিক সময়মতো হাতে না পাওয়ায়, বিষয়ক্রম অনুসারে সুষ্ঠুভাবে ছাপা সম্ভব হয়নি—আগে পরে হয়ে গেছে। সূচীপত্রে অবশ্য পাঠকের সুবিধার্থে বিষয়ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত সংখ্যায় আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই গ্রাহক হয়ে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু পত্রিকাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুস্থ রাখতে গেলে আরো গ্রাহক চাই, তাই পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এ ব্যাপারে পুনরায় আবেদন রাখছি।

লেখা দিয়ে, অর্থ সাহায্য করে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়ে, সমালোচনা করে যাঁরা পত্রিকার প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ রেখেছেন, তাঁদের সকলকে এবং পাঠক-সাধারণকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসবের আনন্দ-মুখর দিনগুলিতে সর্বত্র সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। আপনার আনন্দের আতিশয্য যেন অন্যের অসুবিধার কারণ না হয়।

উৎসবের সময় অর্থ ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। চাঁদা আদায়ের নামে যাঁরা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও যানবাহন সমস্যার কথা না ভেবে যাঁরা পথের ওপর উৎসব আয়োজন করেন, মাইক্রোফোনের অত্যাচারে যাঁরা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেন তাঁদের সংযমী আচরণে উদ্দীপিত করা শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোনো মানুষকে বিব্রত করা নয়, সকলের মধ্যে প্রীতির বিনিময় করা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ন না হয়।

যুব সম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আমার আবেদন, শারদীয় উৎসব পালনের সময় সংযম ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখুন। অন্যের অসুবিধা না করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন।

আই সি এ ১০০৭৮/৭৯

পুলক চন্দ

চীন বিপ্লব (১৯১১) ঃ গোবিন্দচন্দ্র দাসের একটি কবিতা এবং প্রসঙ্গতঃ

সামন্ত শাসকের অত্যাচারে 'জন্মভূমি' থেকে একদা নির্বাসিত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস আজও আর এক অর্থে নির্বাসিত তাঁর স্বদেশে। নির্বাসিত জনমন থেকে—'স্বভাব কবি' অথবা 'ভাওয়ালের কবি' এই দুই শ্বাসরোধকারী অভিধার অন্তরালে। সেই গোবিন্দচন্দ্রের একটি অবহেলিত দিক ও একটি অপরিচিত কবিতার সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করানোই বর্তমান রচনার সীমিত উদ্দেশ্য। গোবিন্দচন্দ্র দাসের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন পরবর্তী সংখ্যার 'প্রস্তুতিপর্বে'র জন্য প্রতিশ্রুত।

১. তিনটি বই ঃ দুটি কথা

গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর (১৮৫৫-১৯১৮) ষাট বছর গড়িয়ে গেল। অন্তর্বর্তী দীর্ঘ বিস্মৃতির পর আজ আবার ব্যবসায়িক ও ভিন্নতর প্রয়োজনে তাঁর সামান্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস ইতস্ততঃ দেখা যাচ্ছে। অন্ততঃ তিনটি বই সম্প্রতিকালে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমটি কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্যের 'উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস'। গ্রন্থকারের শ্রম, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর সামান্য যান্ত্রিকতা এবং গোবিন্দচন্দ্রকে 'সামন্ত বিদ্রোহী' প্রমাণিত করবার মাত্রাতিরিক্ত ব্যাকুলতা বইটিকে অংশতঃ বিপথগামী করেছে। এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ মিলবে আমাদের আগামী সংখ্যার প্রবন্ধে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গোবিন্দচন্দ্র দাস কাব্য সম্ভার'। ৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধের প্রথাবদ্ধ চর্বিতচর্বণটুকু বাদ দিলে অরুণবাবু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন সন্দেহ নেই। গোবিন্দচন্দ্রের দুষ্প্রাপ্য সমস্ত কবিতার বই এবং বেশ কিছু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাকে (যদিও আরও

অজস্র কবিতা এখনও ছড়ানো আছে তৎকালীন পত্রপত্রিকায়) তিনি একত্রিত ক'রে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

তৃতীয় এবং আপাততঃ সর্বশেষ গ্রন্থটির একমাত্র গুরুত্ব পাঠকদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা, জালিয়াতির নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হিসাবে। বারো হাত বই-এর তেরো হাত অবান্তর পাদটীকায়, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে, পাঠকেরা জানতে পারবেন অনেক জ্ঞানগর্ভ তথ্য : 'এরণ্ড—ভেরেণ্ডা গাছ'…'চন্দ্র—পৃথিবীর উপগ্রহ'…'পোলো—এক প্রকার খেলা' ইত্যাদি।' এ ছাড়া, সমস্ত বইটিই প্রায় নির্ভেজাল আবর্জনা। যে সামান্য পদার্থ এতে আছে তাও আবার অপরের কাছ থেকে স্বীকৃতিবিহীন চুরি (যেমন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'গোবিন্দ চয়নিকা'র বিষয়-বিন্যাসটুকু কাঁচি দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছেন লেখক নিজের ঘোষণা ক'রে)। সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু পাঠকদের একটি তথ্য জানাবার আছে : স্থূল অজ্ঞতার এই নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশকে ভূমিকা লিখে অভিনন্দিত করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'পাণ্ডিত্য তাঁর হস্তামলক, তা তাঁকে কষ্ট করে অর্জন করতে হয়নি।' তবে, পাণ্ডিত্য না অসিতবাবু, কী যে আসলে জয়গুরু গোস্বামীর হাতের আমলকি সন্দেহ জাগে!

২. 'জন্মভূমি প্রীতি', স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা[১]

সে যাই হোক, আপাতদৃষ্টিতে পরিস্থিতি সব মিলিয়ে আশাপ্রদ। অন্ততঃ গোবিন্দচন্দ্র দাস সম্পর্কে দীর্ঘকালের জড়তা ভেঙ্গেছে। এবং কিছু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু আজও গোবিন্দ দাস 'সাহিত্যের ইতিহাসে'র ভাষায় "বাংলা সাহিত্যের **মার্জিত** অঙ্গনে…অভিনব আগন্তুক।"[২] এবং প্রধান দিককে অপ্রধান ও অপ্রধান দিককে প্রধান করে তুলতে পারদর্শী প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকদের শেষ বিচারে গোবিন্দচন্দ্র মুখ্যতঃ 'নির্জলা দেহানুরাগ' বা 'বলিষ্ঠ দেহানুগত্যের'ই কবি। তাঁর স্বদেশভাবনাজাত কবিতার, অন্ততঃ 'স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে'র, উল্লেখ অবশ্যই আছে সর্বত্র। কিন্তু সেখানেও সকলের বক্তব্য দু'একটি মন্তব্যেই

১। অবশ্যই সীমিত অর্থে।

২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৫ পৃঃ ৫৩০।

নিঃশেষিত। একজন গবেষক 'কোন কোন কবিতার দু'চারটি হারানো পংক্তি' (যদিও একটির বেশী কবিতার উল্লেখ তিনি করেন না) 'পথ ভিখারীর কণ্ঠে' শুনতে পান (আমাদের সৌভাগ্য!)। এবং তার 'সরল প্রত্যক্ষ আবেদনের' উল্লেখ করেই দায়িত্ব মুক্ত হন।[৩] আবার কিছু গবেষক ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে অনেক বেশী নির্দ্বিধ ও সাহসী। তাঁদের একজনের মতে গোবিন্দচন্দ্র 'চড়া গলা'র অসংযত আবেগের 'দেশপ্রেমের মোটা দাগের কবিতা লিখেছেন'।[৪] আবার প্রমথনাথ বেশী (যাঁর বক্তব্যের উপর পূর্বোক্ত গবেষকের মতামত সর্বতোভাবে নির্ভরশীল) গোবিন্দ দাসকে কেবলমাত্র 'স্বগ্রামের' সঙ্কীর্ণ অর্থে 'জন্মভূমির'—অর্থাৎ ভাওয়ালের জয়দেবপুরের কবি হিসাবেই সার্থক দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে কবির স্বগ্রাম-প্রীতি 'শিশুর মাতৃব্যাকুলতার মতই আন্তরিক বস্তু' এবং শেষ পর্যন্ত 'জন্মভূমির প্রীতি'র কবিতার সঙ্গে তুলনা এনে 'জীবনের বস্তু নয়' বলে খারিজও করে দিয়েছেন গোবিন্দ দাসের দেশাত্মবোধ-সঞ্জাত সমস্ত কবিতাকে।[৫]

ঠিকই, স্বগ্রামের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার প্রচুর কবিতা গোবিন্দ দাস লিখেছেন। কিন্তু সেই আঞ্চলিকতাকে আশ্রয় করেই আবার তিনি ক্রমশঃ আঞ্চলিকতামুক্তও হতে পেরেছেন। স্থানীয় সামন্তপ্রভুর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ ব্যক্তিগত গণ্ডিতেই পরিসমাপ্ত হয়নি। তারও উত্তরণ ঘটেছিল। সামন্ত শাসকের হাতে অত্যাচার, উৎপীড়নের যে ব্যক্তিগত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা কবির হয়েছিল তাতেই এক অর্থে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল তাঁর দেশপ্রেম। * অর্থাৎ প্রমথনাথ বিশী এবং অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 'জন্মভূমি প্রীতি' প্রসূত ও 'Patriotism সম্বন্ধীয়'[৬]—এই যে **আন্তঃসম্পর্কবিহীন** দুটি বিভাগে গোবিন্দ দাসের কবিতার একটা বড় অংশকে বিভক্ত করেছেন তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সত্য নয়। উদ্দেশ্য: গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার একটি দিককে বড় করে তুলে, তার সহায়তায় তাঁরই আর একটি, এবং রাজনৈতিকভাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ,

৩। ঐ, পৃঃ ৫৩২

৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা, 'গোবিন্দচন্দ্র দাস কাব্য সম্ভার', পৃঃ ৪৩, ৪৫

৫। প্রমথনাথ বিশী, কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, বাংলার কবি, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৬৬

* এ বিষয়ে বিস্তৃত, তথ্যভিত্তিক আলোচনা আমাদের আগামী সংখ্যার প্রবন্ধে থাকবে।

৬। প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত।

অংশকে পরাস্ত ও নগণ্য প্রতিভাত করা। বস্তুতঃ এদুটি কোন ভাবেই পরস্পর-বিরোধী বা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেশপ্রেম যেমন একদিকে নিছক তত্ত্বজাত নয়, তেমনি অন্যদিকে তা সংকীর্ণ 'স্বদেশিকতা'তে ক্লিষ্ট নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, গোবিন্দ দাস উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের সেই বিরল সংখ্যক কবিদের অগ্রগণ্য যাঁদের কবিতা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ অথচ খণ্ডিত দেশ সীমার ঊর্ধ্বে সংগ্রামী আন্তর্জাতিকতাতেও পরিব্যাপ্ত।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবি মন ছিল তীব্র সংবেদনশীল। এক কথায়, এটাই ছিল তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতার কেন্দ্রীয় উৎসভূমি। মনের এই অত্যাশ্চর্য সংবেদনশীলতা, কবিজীবনের প্রাথমিক পর্বটুকু উত্তীর্ণ হবার পর আর কোন নির্দিষ্ট দেশকালের অধীন ছিল না! সমস্ত ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও এই স্বীকৃতিটুকু না দিয়ে তাই উপায় থাকেনা যে তাঁর মনের জানালা ছিল আশ্চর্যরকম উন্মুক্ত—উন্মুক্ত, শুধু 'স্বগ্রাম' তো নয়ই, শুধু বাংলা দেশও নয়—সমগ্র ভারত এমনকি বহির্বিশ্বের দিকে। বলাই বাহুল্য, এর পিছনে কোন নিস্পৃহ, নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানপিপাসা নয়, ছিল তাঁর অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহা। যে স্বাধীনতার মূল্য স্বগ্রাম থেকে নির্বাসিত কবি নিজের অস্থিতে মজ্জায় বুঝে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনের চরম দুঃখ চূড়ান্ত দারিদ্র্যের বিনিময়ে, সন্দেহ কি যে কোথাও তারই সামান্যতম অবহেলা তাঁকে বিদ্ধ করবে তীব্রভাবে অথবা তার প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রয়াস লাভ করবে তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা। এই মন্তব্যের প্রাথমিক সমর্থন হিসাবে একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি :

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
ছিলি নাকি ট্রান্সভালে, কোন দিন কোন কালে
কিম্বার্লী, জোহান্সবার্গে হীরা সোনা ঢালি ?
নীরক্ত বুয়ার বুক, নাহি তেজ একটুক,
ক্রুগার আগার আজ, প্রিটোরিয়া খালি।
সে দেশ ছাড়িলি তুই, সেখানে আদর নাই!
তোর কি আদর জানি আমরা বাঙ্গালী ?

এছাড়া তাঁর অজস্র কবিতায়, অসংখ্যবার এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের শোষণ বঞ্চনা ও মুক্তিসংগ্রামের প্রসঙ্গ। বিস্তৃত আলোচনা ও দৃষ্টান্ত

আগামী প্রবন্ধের জন্য মুলতুবী রেখে আপাততঃ দুটি মাত্র কবিতার উল্লেখ ক'রে আমরা আলোচনায় ছেদ টানব।

১৮৯৪-এ গোবিন্দচন্দ্র দাস এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন চীন জাপান যুদ্ধের উপর। পশ্চিমী শক্তির চালে পড়ে একে একে বার্মা, আন্নাম, সিকিমের মতন সমস্ত আশ্রিত রাজ্যই রাজতন্ত্রী চীনের কবলের বাইরে চলে গেলে শেষ সম্বল কোরিয়ার উপর কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করেই চীন ও জাপানের মধ্যে ১৮৯৪ সালের অগাস্ট মাসে বেধে উঠেছিল সংঘর্ষ। যুদ্ধারম্ভের মাস খানেকের মধ্যে লেখা গোবিন্দদাসের কবিতা :[৭]

'যা হয়েছে এই ঢের, থামরে জাপান
বুঝেছি বুঝেছি তোর, আছে বেশ গায়ে জোর,
উদ্ধত যুবক তুই বীর বলবান।···
মারিতে পারিস বেশ, বন্দুক কামান!
'মানচুরিয়া' মান চুরিয়া 'মোকদেন' মুখে নিয়া
'প্রাচীর' ভাঙিতে চাস করি খান খান।
'কোরিয়া' কাড়িয়া নিলি 'পিগাঙ্গ' ফেলিলি গিলি···
রিরাট বিশাল চীন ভয়ে কম্পমান
যা হয়েছে এই ঢের, থামরে জাপান।

বিজয়ী জাপানকে কবি নিরস্ত হতে বলছেন। কারণ, কবির স্বদেশ বিদেশী শাসনের অত্যাচারে বর্তমানে 'ভস্ম ছাইয়ে' পর্যবসিত। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের (গোবিন্দ দাসের ভাষায় 'রাজ্য চোরা'দের) ব্যাপক চক্রান্তে বিধ্বস্ত এশিয়ায় একমাত্র আশা ভরসার জায়গা তাঁর কাছে তাই এখন চীন ও জাপান :

মালয় লেয়স লয়, আনাম আনাম নয়,
আ-ব্রহ্ম-ভারত ভস্ম—নেপাল ভুটান।
পশ্চিমের মহাঝড়ে, পৃথিবী ভাঙিয়া পড়ে,
এশিয়া পেষিয়া যাবে হয় অনুমান!
কেবল তোরাই বাকি, তাও বুঝি যাস নাকি,

৭। প্রসঙ্গতঃ এই কবিতাটির উল্লেখ শ্রীমতী ইন্দিরা সরকার করেছিলেন তাঁর ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত 'Social thought in Bengal (1757—1947) a bibliography-তে।

হা অদৃষ্ট, হা কপাল, হায় ভগবান
এসিয়া আফ্রিকা হবে—অহল্যা পাষাণ।

যুদ্ধের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি তাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে তিনি অনুধাবন করলেন পরিস্থিতির তাৎপর্য। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারিত হল কবিতায় :

অই যে সাগর পীতে, রুশ আর ফরাসীতে,
হরষিতে আছে চেয়ে খাড়া করে কান।
বৃটনের রণতরী, পূরব সাগর পরি
খুঁজিছে কোথায় ছিদ্র কোথায় সন্ধান।

.....

সিংহ ও ভল্লুক বাঘে ছিঁড়ে খাবে চীনা ছাগে,
পাবি না প্রসাদ তুই কণিকা সমান।

এই কবিতার পর দীর্ঘতর আর এক কবিতায় (বর্তমান রচনার সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত) গোবিন্দ চন্দ্র, ১৯১১-তে, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়গান করলেন :

...ঈশান কোণে লাগছে ঝট্‌কা, নিশান কাঁপছে কামস্কাট্‌কা
আমেরিকায় বিষম খটকা ভরে ভয়ে জয়দগব !
যুগল সূর্য্য উঠছে পূবে, পশ্চিমেতে সন্ধ্যা ডুবে,
'ক্যা হুয়া ? ক্যা হুয়া ?' তাই শ্বেত শিয়ালের কলরব !
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

কোনো যান্ত্রিক জয়ধ্বনি উচ্চারণ নয়, উদ্দীপ্ত কবিকল্পনার চিহ্ন কবিতাতে ছড়ানো :

স্বাধীন তরু স্বাধীন লতা পুষ্পে হাসে স্বাধীনতা
বহে মন্দ মধুগন্ধ স্বাধীনতার সুসৌরভ

বিস্ময়করভাবে সহজ, অনাড়ম্বর অথচ অব্যর্থ তাঁর চিত্রকল্প :

ইয়াং-সিকিয়ান দিচ্ছে হুলু, শত জিহ্বায় কুলুকুলু,
ঘোর রোলে সিন্ধু তোলে বজ্র শঙ্খে বিজয়স্তব,

স্বদেশে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত রোগশয্যায় (কবিতাতে 'মৃত্যুশয্যায়') শায়িত কবি গঙ্গায় ইয়াংসিকিয়াং-এর 'নূতন বানে'র আহ্বান ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন এবং 'অনুভব' করেছেন 'নব জীবন' :

'ইয়াংসিকির নূতন বানে, নূতন চিন্তা আনে ধ্যানে,
শতমুখে গঙ্গায় আনে নূতন চীনের নূতন বিভব ;'...

শুধু চীন বিপ্লবের জয়গানই নয়, মৃত্যুর এক বছর আগে লেখা তাঁর এক কবিতাতে শোনা গিয়েছিল রাশিয়ার ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ও জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জয়ধ্বনি :

'রুষিয়া পেষিয়া দিছে উষীর বিলেপন
চূর্ণ করি জীর্ণ জারের মুকুট সিংহাসন'

সুতরাং, এই গোবিন্দচন্দ্র দাস যে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়-জয়গুরু গোস্বামী অধ্যুষিত 'মার্জিত' [৮] বঙ্গ সাহিত্য অঙ্গনে নিতান্তই অমার্জিত বেমানান এক 'অভিনব আগন্তুক' তাতে আর সন্দেহ কি ?

৩। চীন বিপ্লব (১৯১১) ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা

গোবিন্দচন্দ্র দাস 'চীন জাপান যুদ্ধ' কবিতায় লিখেছিলেন 'সিংহ ও ভল্লুক বাঘে ছিঁড়ে খাবে চীনা ছাগে'। কবির ধারণা ছিল জাপানের ভাগে কোন 'প্রসাদ'ই জুটবে না। এই ভ্রান্তিটুকু বাদ দিলে ১৮৯৪-৯৫-এর পরবর্তী ইতিহাস আশ্চর্যভাবে তাঁর ভবিষ্যৎবাণীর বাকী অংশের সত্যতা প্রমাণ করল। জাপানের হাতে পর্যুদস্ত চীন ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াল সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই সমৃদ্ধ মৃগয়া-ক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক মাঞ্চু শাসকেরা শ্রেণীস্বার্থ থেকে দেশের এক-একটি অংশ আপোসে বিকিয়ে দিতে লাগল বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির কাছে। অন্যদিকে ১৮৯৫-এ সম্পাদিত শিমোনোসেকি চুক্তির ফলে চীনের সমস্ত কলকারখানাও চলে গেল জাপান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে। ফলে চীনের জাতীয় অর্থনীতিতে লাগল একটি বিপর্যয়কর আঘাত। স্বভাবতই শোষণে শোষণে জর্জরিত হতে লাগল দেশের সাধারণ মানুষ।

মাও সেতুং লিখেছেন : ১৯১১-র বিপ্লব ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

৮। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', পূর্বোল্লিখিত।

পরিচালিত। আর চীনের মানুষ চিং শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত করেছিল, কারণ তা ছিল সাম্রাজ্যবাদেরই লেজুড়।

১৯১১-র বিপ্লবের পিছনে একদিন নয়, প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘকালের। ১৯০১ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে লাখ লাখ মানুষ সারা দেশ জুড়ে হাজারেরও বেশী স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র আন্দোলনে রুখে দাঁড়িয়েছিল মাঞ্চু রাজবংশের অপশাসনের বিরুদ্ধে। সরকারের অত্যাচার একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তারই সঙ্গে তাল রেখে বৃদ্ধি পাচ্ছিল আন্দোলনগুলির ব্যাপকতা ও সংখ্যা। সর্বোপরি সান ইয়াৎ সেনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে চলছিল চীন বিপ্লবের প্রস্তুতি।

শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনা বিপ্লবী আন্দোলনের পথকে প্রশস্ততর করে তুলল। চীন দেশের বুকে রেলপথ নির্মাণ দীর্ঘদিন যাবৎ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির একটি উপায়। সেই কারণেই 'সংবিধানতন্ত্রীরা' (যারা একসময় চেয়েছিল নতুন চেহারায় রাজতন্ত্রকে চীনের বুকে পাকাপাকিভাবে কায়েম করতে) যখন নিজেদের স্বার্থে আঘাত পড়ায় রেলপথ 'জাতীয়করণে'র বিরুদ্ধে সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে জনশক্তিকে জাগ্রত করতে চাইল তখন আন্দোলন দ্রুত চলে গেল তাদের হাতের বাইরে। এবং রূপ নিতে থাকল রাজতন্ত্র উচ্ছেদকারী বিপ্লবী আন্দোলনে। অবশেষে ১৯১১-র অগাস্ট মাসে চিং সরকারের মদতে ফরাসীদের 'য়েচুয়ান-হ্যাংকাও রেলপথ' নির্মাণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করল। জনসাধারণ কর ও লেভী না দেবার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিলে সৈন্যবাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাল। প্রাণ হারালেন অনেকে। চেংতুর 'চীন বিপ্লবী সংঘ'-এর স্থানীয় সদস্যরা কাঠের তক্তাতে তক্তাতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বাণী লিখলেন এবং তা বার্নিশ করে অয়েল পেপারে মুড়ে ভাসিয়ে দিলেন চিংকিয়াং নদীতে। নদীর স্রোত ধরে দক্ষিণপূর্ব য়েচুয়ানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল সেই বিপ্লবী 'জলবার্তা' (water telegram)। সমস্ত য়েচুয়ান প্রদেশ জুড়ে ঘটল সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

য়েচুয়ানের পর উহানের বিপ্লবী আন্দোলন আরো গুরুতর আকার ধারণ করল। সামরিক আইন জারি হল সমস্ত হুনান প্রদেশে। উহানের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিঘাতে চাংশা উদ্বেল হল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিপ্লবীরা শহর দখল করলেন এবং অচিরে শত্রুর সম্মিলিত আঘাতে পতন ঘটলেও, গঠন করলেন বিপ্লবী সামরিক সরকার। চীনের ২১টি প্রদেশের মধ্যে ১৪টিই চিং শাসনের প্রতি

তাদের আনুগত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। যেখানে স্বাধীনতা ঘোষিত হল না সেখানেও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক বিদ্রোহ এবং শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র আন্দোলনের ঘটনা ঘটতে থাকল। অবশেষে আতঙ্কিত শাসকচক্রের ঘোষণা অনুযায়ী শিশু-সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করলে নিমেষের ভিতর পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন চীন-সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ল। নিক্ষিপ্ত হল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েতে। প্রতিষ্ঠিত হল চীনা প্রজাতন্ত্র।[৮]

কী তাজ্জব !

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১

কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !
তিন দিনে চীন হল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কেমন উদ্যম কি উৎসাহ, কেমন বীর্য বিশ্বদাহ,
কি প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ কেমন ভীষণ—কি ভৈরব !
কি প্রতিজ্ঞা—বজ্রপণ, দারুণ সাহস দারুণ মন,
দারুণ দৃঢ় অধ্যবসায় শত বজ্র পরাভব।
নাইক চিন্তা মরণ বাঁচন, কেবল কুদন কেবল নাচন,
নাই ঔদাস্য শোক নৈরাশ্য অট্টহাস্য—কি তাণ্ডব !
সবাই ক্ষিপ্ত খড়্গ হস্ত, রক্তে রাঙ্গা দেশ সমস্ত,
খণ্ড খণ্ড রাজদণ্ড চরণ তলে রাজশব !
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৮। এই ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে প্রধানতঃ দুটি বই থেকে :

১. The Revolution of 1911, Foreign Languages Press, Peking, 1976
২. The Political history of China, 1828—1928, Li Chien-hung, Stanford University Press, 1967 Edn.

২

কেমন বাঁধন প্রাণে প্রাণে, অস্থি, মাংসে, রক্তে জানে,
পাহাড় উড়ায় টানে টানে অসীম শক্তি—অসম্ভব,
যুবক বৃদ্ধ ছুঁড়ী ছোঁড়া, সমান মত্ত কানা খোঁড়া,
কি জিঘাংসা কি জিগীষা কি জীবন্ত জয়োৎসব !
কি দুর্জয় সে বজ্রলাথি, চূর্ণ চূর্ণ মাঞ্চুজাতি,
কেমন দম্ভ ভূমিকম্প কেমন গর্ব কি গৌরব।
কাঁপছে ধরা থরথরি, কে বা বাঁচি কে বা মরি
ইউরেলে লাগছে ধাক্কা ইউরোপটা কাঁপছে সব !
ঈশান কোণে লাগছে ঝট্‌কা, নিশান কাঁপছে কামস্কাটকা
আমেরিকায় বিষম খটকা ডরে ভয়ে জরদ্গব।
যুগল সূর্য উঠছে পূবে, পশ্চিমেতে সন্ধ্যা ডুবে,
'ক্যা হুয়া ? ক্যা হুয়া ?' তাই শ্বেত শিয়ালের কলরব।
'তিন দিনে চীন হল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৩

দাসত্বের কলঙ্ক-টীকা, নাই সে শিরে দীর্ঘ শিখা,
কীর্তি-কিরীট দীর্ঘ ললাট কি সৌভাগ্য কি গৌরব !
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বাণী নাই সে আজ আর কানাকানি,
ভৃত্যযোগ্য নিত্যভোগ্য দুরারোগ্য সে রৌরব !
হলস্কন্ধে হাসছে কৃষাণ, হাতে উড়ছে বিজয় নিশান,
পুলকিত শস্যক্ষেত্রে—স্বর্ণশীর্ষ নূতন যব,
স্বাধীন তরু স্বাধীন লতা, পুষ্পে হাসে স্বাধীনতা,
বহে মন্দ মধুগন্ধ স্বাধীনতার সুসৌরভ !
ইয়াংসিকিয়াং দিচ্ছে হুলু, শত জিহ্বায় কুলুকুলু,
ঘোর রোলে সিন্ধু তোলে বজ্রশঙ্খে বিজয় স্তব,

আজকে 'মেলিং' সবার সেরা, চন্দ্র সূর্য নূপুর বেড়া,
'ধবল' নহে সবল, সে যে নগাধিরাজ অভিনব !
তিন দিনে চীন হল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৪

কতই মাটি কতই পাথর, বুকে চাপা ছিল কাতর,
যুগ যুগান্তের অধীনতা দাসত্বের ঘোর উপদ্রব,
আজকে তাহা ভেদি মহী, ছুটছে ঊর্ধ্বমুখে বহ্নি,
কি কালান্ত অতলান্ত জলদগ্নি মহার্ণব !
বিশ্ব আজ বিস্মিত নেত্রে, দেখছে ঐ অগ্নিক্ষেত্রে,
কোটী শীর্ষ কোটী বাহু জনশক্তির সমুদ্ভব,
রাজার শির আজ রাজমুকুটে, চাষার পায়ে ধূলায় লুটে,
মর্ত্যে থাকুক স্বর্গ উঠে ইন্দ্রালয়ে হাহারব !
পদাঘাতে ঘৃণার সহ—রাজার দান—রাজ-অনুগ্রহ
ফেলিয়ে দূরে দীনভিক্ষু—জগতে যা অসম্ভব,
আত্মবলে আত্মস্বত্ব, করেছে সে আজ আয়ত্ত,
কেমন তাহার পুরুষত্ব কি মহত্ত্ব কি গৌরব !
তিন দিনে চীন হল স্বাধীন,
জগৎভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৫

ক্রূর যারা ধূর্ত যারা, পীতাতঙ্কে আত্মহারা,
চমকে উঠছে আজকে তারা কাপুরুষরা যতসব,
আত্মদ্রোহে লিপ্ত চীন, এই তো সুযোগ, এই শুভদিন,
দল বেঁধেছে শক্তি নবীন কর্ত্তে তাহার পরাভব।
নতুবা সে দুদিন পরে, মুটিত্ করে টুটিতে ধরে,

পার করিতে কাস্পিয়ান সি বেরিং স্ট্রেইট বাবেলমাণ্ডব !
তাই কেউ বা বসে কাম্বোডিয়া, পাদ্রীর টুপি মাথায় দিয়া,
কেউ বা আছেন ফিলিপাইনে, আপ্‌খোরাকী বিনা মাইনে,
মাথা পাই ত ধ্বজা পাইনে রাহুর মত উপল্লব !
চড় খেয়ে জাপানের কাছে, মঙ্গোলিয়ার পাছে পাছে,
কেউবা আবার ভালুক নাচে—কি আত্মীয় ! কি বান্ধব !
ভেবে ছিলেন আফ্রিকাটা, যেম্নি কল্লে ছিঁড়াকাটা,
তেমনিতর এসিয়াটা বেঁটে নেবে দৈত্য দানব,
খেয়ে খেয়ে বাড়ছে জিভা, তুরুগ মুরুগ খোকন খিবা,
পার্সি গোলাপ—মধু ডিবা দ্রাক্ষা খেজুর কাবুল আরব !
যত সকল রাজ্য চোরা, অজগর আর উইলা বোড়া,
মরার মত পড়ে থাকে এম্নি জানে কায়দা আদব,
কিন্তু আবার সময় পেলে, ছায়া ধরে আস্ত গেলে,
সুরসী সাপিনীর মত মুখটি মেলে আকাশ অর্ণব।
অভিমন্যুর সপ্তরথী, চীনের এখন তেম্নি গতি,
ভরসা কেবল বিশ্বপতি নাশেন যিনি মধুকৈটভ,
জনলক্ষ্মী তারই কৃপা, হাসায়ে ধরা সপ্তদ্বীপা,
উঠিয়াছে পূব সমুদ্রে রাতুল পদে অতুল বিভব !
এক পা জাপের হৃদয় মনে, এক পা চীনের জীবনপণে,
বিরাজিছে মাতৃমূর্তি কি অপূর্ব কি অভিনব,
সত্য ধর্মে মুকুট গড়া, সর্ব বিদ্যা বসন পরা,
স্নেহ দয়া হৃদয় ভরা শান্তি সর্ব অবয়ব !
শক্তি আর স্বাধীনতা, দুই ভুজ দুই কল্পলতা,
চরণতলে অমরতা দুঃখ দৈন্য নাশে সব,
এক হাতে তার বরাভয়, আরেক হাতে যশ আর জয়,
স্বর্গমর্ত্য ত্রিভুবনময় সারাবিশ্ব করে স্তব !
তিনদিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব,
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৬

এই যে আছি মৃত্যুশয্যায়, নাইক শক্তি অস্থি মজ্জায়,
কর্ণে শুনি তবু চীনের জয়ধ্বনি বজ্র ভৈরব,
কি আহ্লাদে কি আনন্দে, হৃদয় নাচে বিরাট ছন্দে
নবোদ্যমে নবোৎসাহে, নবজীবন হয় অনুভব !
নূতন স্বাস্থ্য, নূতন আয়ু, শ্বাসে বহে চীনের বায়ু,
চীনের শিরা চীনের স্নায়ু স্পর্দ্ধা স্পন্দন তেমনি সব,
তেম্নি চীনের পীত-পিপাসা ঠেকছে গিয়া 'লিয়াখব'।
ইয়াংসিকির নূতন বানে, নূতন চিন্তা আনে ধ্যানে,
শতমুখে গঙ্গায় আনে নূতন চীনের নূতন বিভব,
নূতন কিরণ, নূতন ঊষা, নূতন চীনের নূতন ভূষা,
ভারতবেড়া সাগরজলে প্রতিবিম্বে জ্বলছে বাড়ব !
রামলক্ষ্মণের লঙ্কাজয়ে, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়ে,
অশোকের সে দিগ্বিজয়ে, এভাব মনে হয়নি উদ্ভব ;
জাগে নাই আর এমন হর্ষ, আজকে যেমন ভারতবর্ষ,
বর্ণে নাই আর কোন কবি এমন ছবি দেবদুর্লভ !

* * * *

তিন দিনে চীন হল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব,
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

['নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৩১৮]

কালী দাশগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত

কয়েকটি লোকসংগীত

১

এবার নষ্ট করে কষ্ট দিল জার্মানী।
এবার মইলো রে সব পাইট্‌খাটা
টাকায় চাউল হইল্ এককাঠা, এ বিষম ল্যাঠা।
কত সৎ গিরস্ত উপাস কইরে খাচ্ছে তারা চালপানি
নষ্ট করে কষ্ট দিল জার্মানী॥

এবার গিন্নি বলে মিন্‌সিরে কাপড় এনে দ্যাও মোরে
বলি তোমারে।
বলি ভালো দেইখে এনো কাপড়,
নইলে মজা বুঝবে নি।
নষ্ট করে কষ্ট দিল জার্মানী॥

ও তার মিন্‌সি বলে গিন্নীরে—কাপড় নাই শহরে
কাপড় দেই কেমন করে।
ও তোর কাপ্‌ড়ের কথা মনে কইরে
মুছে ফেল চউকের পানি।
নষ্ট করে কষ্ট দিল জার্মানী।

বলি কাপ্‌ড়ের দোকান গেলে পরে
আটহাতি কাপড় দেয় এনে
নওহাতি বলে॥
ও তোকে কাটি ফেলে মাপতে গেলে
আট হাতে টানাটানি॥
নষ্ট করে কষ্ট দিল জার্মানী।

এ পন্ত ক্ষ্যান্ত করি হিন্দুরা সব বল হরি
আহা মরি মরি,
আর চান্দ-বদনে মোমিনগণে
বলরে আল্লার ধ্বনি।
নষ্ট করে কষ্ট দিল জার্মানী॥

জার্মানির উল্লেখ থেকে মনে হয় গানটি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী বোমার ভয় গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়েছিল—বিশেষতঃ কলকাতাত্যাগী বাবুদের আবির্ভাবে। গানটি আবদুল ও সত্তার মিঞার নিকট গৌরীপুরে সংগৃহীত।

২

শুন সবে পুণ্যভাবে করি নিবেদন,
১৩৪৮ সনের কথা করিব বর্ণন,
বলিব প্রকাশ করি॥
বলিব প্রকাশ করি দশের কাছে যেরূপ ঘটিল,
দিনের বেলা হাটের হুকুম হাকিম সাহেব দিল,
—ঘুরিছে পুলিশ যত—
ঘুরিছে পুলিশ যত, হ্যাট আর কোট লাগাইয়া গায়
বারো-হাতিয়া লাঠি ঘাড়ত্ দেখি প্রাণ শুকায়
—আত্মারাম খাঁচা ছাড়ে—
আত্মারাম খাঁচা ছাড়ে, বলব কিরে, হুকুম করে জারি
চারটার সময় হাট ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে বাড়ি
—শুনিয়া 'দরবারু' কয়—
শুনিয়া 'দরবারু' কয়, 'গাদ্‌লু' মশায় আর কি রইলেন দেখি
ভার ধরিয়া আমের তলৎ এটি ছোপি থাকি
—করিস না কাশাকাশি—
করিস না কাশাকাশি এটি বসি চুপ করিয়া থাক
আস্তে আস্তে মাথা তুলি পুলিশ গুলাক ছ্যাখ

—শুনিয়া 'গাদ্‌লু' বলে—

শুনিয়া 'গাদ্‌লু' বলে, 'দরবারু'রে কেমন কথা হইল
বন্দুক কাঁধে লবণদাদা যুদ্ধেতে চলিল।
সঙ্গে তার কেরাচিন যায়, কাপড় মশায় গামছা নিয়া সাথে,
তোপ কামান আর গোলাগুলি চারজনারই হাতে।
চলিছে পিরান মশায়, তার সাথে যায় ধুতি আর শাড়ি—
'পাবনাই' আর 'ফরাসডাঙা' কটনমিলের খাড়ি
পরে যায় 'ঢাকেশ্বরী', ভারত ছাড়ি কুষ্টিয়া মিল সাথে।
তসর, গরদ, চট, ছালা ভাই চললো লাখে লাখে,
শুধু ভাই নেংটি রইল, তাক্ রাখিল দেশরক্ষার বাদে।

কাণ্ড দেখি রসুন পেঁয়াজ কুস্তি দিয়া ওঠে।
বলিছে, "ও সুপারি, চিনি, মিশ্রি, খানাগুড় আর নালি,
আলকাৎরা, 'ফেনাইল' ভাই তোরাও আয়রে চলি;
আমরা তো ভীরু নইরে কই তোমারে, নাই কি তোমার কান,
দেশের জন্য যুদ্ধ করি দিচ্ছে সবাই প্রাণ।
সাজ ভাই জিরা, মেথি, পটল, আলু, কলা, ঝিঙ্গা, মানা,
'গারোকচু', লাউকুমড়া, সাজরে সজনা।"
শুনি ওল ফোপেয়া উঠি মাটি ফাটি—"সহ্য হয় না আর
গলায় ঢুকি শত্রুদলের করিব ছারখার।
সঙ্গেতে আয়রে 'মানা', ভয় করিস না বিষ কচু নে সাথে,
প্রাণপণেতে করবো যুদ্ধ যা থাকে বরাতে।"

শুনিয়া 'দরবারু' কয়, 'গাদ্‌লু'মশায়, ফ্যালাও মাতার বোঝা
দেশসুদ্ধ চললো যুদ্ধে, আমরা কি ভাই খোজা?
'বাকুয়া' সই করি ধর, ছাড়ো ভয় ডর, ছাড়ো হাঙা জোঙা,
ভারতবাসীক ছায় আশ্রয় আমাদেরই ঠ্যাঙা।
বন্দুক দেখি নাই রে, কেমন করি আওয়াজ করে তায়
আসমান থাকি, বোমা পড়ি, মানুষ মরি যায়।

এগিলা ভয় কায় করে, গাদ্‌লু ভাইরে, পেন্টি নে তুই সাথে,
ফুতি খেলার ফুতির বোমা ফেলবো লাখে লাখে।
সাজ ভাই ভারতবাসী, রাশি রাশি ঠ্যাঙা নিয়া ঘাড়ে!
দীনবন্ধু কয়, সাবাস 'গাদ্‌লু, রাজযুক্তি তোর এ॥

কবিতা সাঙ্গ হইল।

১৩৪৮ সনের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের রচনা। গানটি শ্রীমতী নীহারবালা বড়ুয়ার সংগ্রহ।

৩

আরে নইমুদ্দি কয় সভাতে
আশ্চরিয্য কী ঘটনা ছ্যাখায় ইংরাজে।
ওরে সেটেলমিণ্টের আমিনে
নজর করে কম্পাসে সেই দিগ্‌পিনে।
ওই এক চৌকে নজর করে সামিলে নিশান গাড়ে।
ওরে তিন সীমিনা ঠিক করিয়া সেইখানে পাথর গাড়ে।

আমিনে সব মাপ করে
কানুনগো আর ডিপুটিসাব সেই মাঠোতে ঘুরে,
আরে সরেকুমে নাইপ্যা যায়,
পাকে তোলে পাচকানি সেই পাকিতে,
দুইজনে শিকল টানে, আমিনে নক্সা তোলে,
কি হিক্‌মতে বাংলা মুলুক লেইখ্যা নিল ইংরাজে।

আরে আইলরে খানাবাড়ী লেইখ্যা নিল ঘর বাড়ী
সব আনাজ তরকারী।
ওরে আম, কাঁঠোল, গুয়া গাছ বড়াই নারকোল
বাঁশের থোপা ঝাড়বাড়ী।
লাউ কুমুড়া সন্ধক চকি
হাল গরু আর গাই বকরী।

আরে ভাঙ্গা ঘরখান লেইখ্যা নিল
সঙ্গে আইল গুজরাটি।

আরে বউ বলে মা শ্বাশুড়ী বকরীপালা কি করি
আর পালন গ্যালো না।
ওরে ন্যাংরা বকরীর দুইটা ছাও, তাই ব্যাটারা লেইখ্যা নেয়,
সই বাছলাম না।
ওরে মায় দিয়াছে হাঁসের ছাও, তাও ব্যাটারা লেইখ্যা নেয়
আরে আণ্ডাভরা মুরগী আছে, তাও য্যান মা কয়ো না।
নইমুদ্দি কয় সভাতে··· ॥

কোনো একটি settlement (জরিপ)-কে কেন্দ্র করে এই গানটির রচনা। মনে হয় রচনার কাল বেশ পুরোনো। জরিপের ব্যাপারে ইংরেজের চাতুরী এবং আমলাদের অত্যাচারের সাক্ষ্য রয়েছে গানটিতে। গানটি আবদুল ও সত্তার মিঞার নিকট গৌরীপুরে সংগৃহীত।

সাগর আলি সরকার

দেশ বাঁটোয়ারা

আরে পহেলাতে বিস্‌মিল্লা বলি আল্লা ধরিনু কলম
রহমান রহিম আল্লা আমি যে অধম, করি আগবারি,
করি আগবারি দয়া করি, মোরে দেহ পানা
তবে যে বলিতে পারি দেশের রচনা, আমি মূঢ় অতি
আমি মূঢ় অতি মম প্রতি আদেশ কর দান
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান—
এবার দেশের কথা।

এবার দেশের কথা সবার হেথা করিব প্রচার
সোনার বাংলা কাঙাল হলো, হলো ছারখার
এলো ঘোর কলি—

এলো ঘোর কলি, দলাদলি, লোক হইল কত,
পুণ্যকাজ ছেড়ে দিয়ে পাপ কাজে রত, মানে না গুরুব্রহ্ম—
মানে না গুরুব্রহ্ম, ধর্মাধর্ম, করে অত্যাচার
ভাত বেঘোরে মরে ঘরে হৈল হাহাকার।
পূর্বপুরুষ যারা—
পূর্বপুরুষ যারা মোদের তারা এমন বলে গেছে
ওলট পালট এই দুনিয়া হবে কলির শেষে, হবে ছাড়াছাড়ি—
হবে ছাড়াছাড়ি, বাড়ি বাড়ি জামাত করে খাবে,
গ্রামে গ্রামে হাট ভাই তখন বসিবে,
এখন দেখ চোখে সর্বলোকে হইল গণ্ডগোল
গ্রামে গ্রামে হাট বসিল এলো কণ্টরোল,
আসিল কোথা থেকে ?—

আসিল কোথা থেকে দেখি চোখে এমেরিকার রাজা
বাঙালিকে দিয়ে গেল কণ্টরোলের মজা,
এলো কি কারণে ?
এলো কি কারণে লহ শুনে সে সব খবর
সোনার বাংলা মরগেজ দিল নব্বই বছর,
দিল কি কারণে ?—
দিল কি কারণে লহ শুনে : এই রাজ্যের বাণী
দুটি জাহাজ এসেছিল নামে রাজারাণী—
ছিল রাজারাণী—
ছিল রাজারাণী ভাল জানি দুই জাহাজের নাম
জলের তলে কলে কলে এই ছিল তার কাম,
অনেক অস্ত্রভরা—
অনেক অস্ত্রভরা ছিল তারা কে করে ভব
লম্বা চওড়া ছিল যেন চৌদ্দ দিনের পথ,
ছিল দরিয়াতে—
ছিল দরিয়াতে চলে তাতে গোং দিয়া ধুঁয়া উঠে

তাহা দেখে দেশের কর্মী উড়োজাহাজে ছোটে
প্যারাশুট সঙ্গে নিল—
প্যারাশুট সঙ্গে নিল ঝম্প দিল ধুঁয়া লক্ষ্য ক'রে
দুটি জাহাজ মেরে ফেলে সমুদ্দর মাঝারে
এই দেশের জন্যে—
এই দেশের জন্যে মইলো প্রাণ দিল নিজের প্রাণ
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান ॥

ভাঙিল মেরুদণ্ড—
ভাঙিল মেরুদণ্ড, লণ্ডভণ্ড হইল জগৎ জুড়ে
নইলে কার বাবার সাধ্য রাজ্য নিতে পারে।
এই দেশের কারণ কত মহাজন ভরে না যে নাম
স্বইচ্ছায় নিল ফাঁসি বালক ক্ষুদিরাম।
ক্ষুদিরাম মারা গেল—
ক্ষুদিরাম মারা গেল, কি হইল অবশেষে ?
গান্ধীবাবার জন্ম হইল মোদের ভারতবর্ষে।

ছিল গান্ধীরাজা মহাতেজা বণিকনন্দন
তব তরে কান্দি মোরা যত প্রজাগণ
সবাই পরাণ ভরে—
সবাই পরাণ ভরে গান্ধীর তরে গাহ জয় গান !
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান ॥

গান্ধী বাল্যকালে—
গান্ধী বাল্যকালে মায়ের কোলে লেখাপড়া শিখে
একদিন কয় কথা মায়ের তরে ডেকে,
ওমা শোনো মাতা—
ওমা শোনো মাতা আমার কথা বলিতে তোমারে
একবার যাবো আমি বিলাত সহরে।

মা বলে, শোনো ছেলে—
মা বলে, শোনো ছেলে যাচ্ছি বলে বিলাতে না যাবে,
বিলাত সহরে গেলে ধর্মভ্রষ্ট হবে।
বাঙালি বাবু যারা—
বাঙালি বাবু যারা, হতমূর্খ তারা এই যে সংসারে
শুটকি চুরুটের লাগি অম্বুরি তামাক ছাড়ে।
দুইদিন ইস্কুলে গেলে—
দুইদিন ইস্কুলে যাবে ভুলে যত দেশি খানা,
আহা মরি হায় কি হেরি কলির কু-কারখানা।
যত সব ইয়ংবেঙ্গলে—
যত সব ইয়ংবেঙ্গলে খানা খায় হোটেলে বসে একসাথে
মুন্সী মুচি ঠাকুর কুকুর একই টেবিলেতে।
নব্য দলের হিন্দু ছোঁড়া—
নব্য দলের হিন্দু ছোঁড়া মুরগী খেয়ে করলো সারা।
বাধা কেউ মানে না, আট আনাতে যা মিলিত
দুই টাকাতে মেলে
এই কলিকালে—
এই কলিকালে ধর্মাধর্ম নেইরে জ্ঞান
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান॥

এই যে পশুর মতন—
এই যে পশুর মতন ব্যাভার কত করতেছে এই ভবে
যতই হাসি ততই হাসি এর প্রতিফল পাবে
দিনে একশ আটবার—
দিনে একশ আটবার ভারত উদ্ধার কতই জাগজারী
কাজের বেলা লেজ গুটিয়ে মারি টেনে পাড়ি।

শুনে মায়ের কথা—
শুনে মায়ের কথা পেল ব্যথা, গান্ধী মহারাজ কয়

অধর্মপথে যাব না যা বলি যে তোমায়।
গান্ধী এত বলে কুতুহলে বিলাত সহর গেল
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ দুই পরীক্ষা দিল।
পেল বেরিস্টারি—
পেল বেরিস্টারি হা হা মরি শান্ত হলো প্রাণ
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান॥

বেরিস্টার হইল যদি—
বেরিস্টার হইল যদি মহাত্মা গান্ধী ভাগ্য সফল হইল
মোহনদাস করমচাঁদ উপাধি পাইল।
একদিন ফুটপাতে—
একদিন ফুটপাতে খোসালিতে করিছে গমন
হেনকালে এলো তথা সাহেব একজন
দেখে কালোবদন—
দেখে কালোবদন ফিরা নয়ন ক্ষুব্ধ হইল ভারি
ডার্কি বলে মুখ খিচিয়ে মারে ব্যাতের ছড়ি।
খাইয়ে ব্যাতের ছড়ি—
খাইয়ে ব্যাতের ছড়ি করে জারি হলো পেরেসান
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান॥

একদিন কোন করমে—
একদিন কোন করমে প্লেটফর্মে গান্ধী গিয়েছিল
নেটিভ বলে লাথ মারিয়ে চৌরাস্তায় ফেলিল।
সবাই জাগ জাগ—
সবাই জাগ জাগ চেয়ে দেখ নাই কি তোদের কান
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান॥

গান্ধী মাইর খাইল—
গান্ধী মাইর খাইল শপথ করলো হলো কিছু ধৈর্য
ঈশ্বর যদি সহায় থাকে নিব একদিন রাজ্য।

গান্ধী তথা হইতে—
গান্ধী তথা হইতে এ ভারতে আবার এলো চলে
স্বদেশী আন্দোলন জারি শুরু করে তোলে।
আন্দোলন জারি করে—
আন্দোলন জারি করে ঘরে ঘরে সবাই করে মানা
চৌকিদারি দিও নাকো, জমিদারের খাজনা
সবাই রাঙ্গা বোন—
সবাই রাঙ্গা বোন চরকা কিনো প্রতি ঘরে ঘরে
হবে স্বাধীনতা—
হবে স্বাধীনতা, দেশের নেতা করিল প্রচার।
বলে বন্দে মাতরম, আল্লাহো আকবর
এই কলিকালে—
এই কলিকালে পালে পালে ভলান্টিয়ার পাল
হাটে ঘাটে দোকান বন্ধ হইল রে হরতাল
বৃটিশ টের পাইল—
বৃটিশ টের পাইল—ইকি হলো, করে ধরাধরি
ভয়ে টুপি লুকাইল আহা মরি মরি
মইল মহম্মদ আলি—
মইল মহম্মদ আলি সওকত আলি দিল নিজের প্রাণ
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান॥

ইংরাজ ধরে যখন—
ইংরাজ ধরে যখন, কি করে তখন খাটেনা আর ফন্দি
গান্ধী রাজার তরে ধরে করে নজরবন্দী।
এইভাবে ছত্রিশ বৎসর—
এইভাবে ছত্রিশ বৎসর জেলের ভিতর গান্ধীরাজা ছিল
স্বরাজ স্বরাজ করে গান্ধী অনেক কাঁদিল।
করে কান্দাকাটি—
করে কান্দাকাটি ভিজায় মাটি, কবি করে উক্তি

ধন্য দেশের রাজা মিলে গান্ধীকে দিল মুক্তি
গান্ধী খালাস পাইল—
গান্ধী খালাস পাইল জানা গেল শোনো তার বয়ান।
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান॥

তারপর শোনো কথা—
তারপর শোনো কথা দেশের নেতা জোর করিয়া উঠে
উঠাইল রেলের নাইল টেলিগ্রাফ কাটে
সবাই একতা হইল—
সবাই একতা হইল জানা গেল হৈল দাঙ্গা হাঙ্গা
ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল পারিন্যা মারা দাঙ্গা
পুলিশ চালায় গুলি—
পুলিশ চালায় গুলি শুন শুন কয়জনা মইল
ফুলুদাদা ধীরেন বর্মণ চালান হইয়া গেল
আইল স্বাধীনতা—
আইল স্বাধীনতা দেশের নেতা জোর করিল জোড়া
তেলিঘাটা লুঠ করে ভাই বালুরঘাট দিল পোড়া।
বালুরঘাট পোড়া গেল—
বালুরঘাট পোড়া গেল হারাইল শরৎবাবু নেতা
তারপর কী হৈল শোনো তাহার কথা।

ইংরাজ হার মানিল—
ইংরাজ হার মানিল রাজ্য দিল শোনো গান্ধী রাজা
লহ তুলে আপন স্বরাজ পালন কর প্রজা।
স্বরাজের হুকুম দিল—
স্বরাজের হুকুম দিল জানতে পাইল মিস্টার জিন্না দিল
ইংরাজের তরে কথা কহিতে লাগিল।
শোনো ওহে দাতা—
শোনো ওহে দাতা আমায় কথা দান করিবে তুমি
আধাআধি ক'রে তবে ভাগ নিব আমি।

যদি নাহি দিবে—
যদি নাহি দিবে বিবাদ হবে কর অবধান
লড়কে লেঙ্গে লড়কে লেঙ্গে এই পাকিস্তান।
ভেবে কহে সাগর—
ভেবে কহে সাগর দেশের খবর দুঃখে ফাটে প্রাণ
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান॥

শোনো সব দেশের নেতা—
শোনো সব দেশের নেতা কহে কথা, স্বরাজ নিলাম আমরা
কোথা হতে এসে এখন ভাগ চাইস তোরা?
মোরা ভাগ দিব না—
মোরা ভাগ দিব না, করি মানা বাড়াইস না আর হাত
কলিকাতায় শুরু হইল ভীষণ উৎপাত
লোক হইল দুই পারটি—
লোক হইল দুই পারটি কাটাকাটি বিবাদ হৈল মুষ্টি
বাঙালীর বিবাদ দেখে ইংরাজ দিল দৃষ্টি :
কেন বিবাদ করো—
কেন বিবাদ করো, কথা ধরো শোনো সমাচার
সেইজনা পাবে রাজ্য ভোট বেশি হবে যার।
হলো এই কথাটি—
হলো এই কথাটি মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস পার্টি
য র ভোট বেশি হবে রাজ্য পাবে খাঁটি
হইল ভোটের ব্যাপার—
হইল ভোটের ব্যাপার কী চমৎকার দুইদিকে সমান
আধাআধি ক'রে ইংরাজ রাজ্য দিল দান।

যখন স্বরাজ পেল—
যখন স্বরাজ পেল ফিরে এলো দেশের যত নেতা
তারপর কী হইল শোন তাহার কথা।

কেবা ভাগ করিল—
কেবা ভাগ করিল বলি ভাগের শোনো সমাচার
রেডক্লিপ্, বেষ্টিক্‌ছ্, নাম আছিল তাহার
দিল ভাগ করে—
দিল ভাগ করে তারপরে নিজদেশে গেল
লণ্ডনের সাহেব যত জিজ্ঞাসা করিল :
কেমন ভাগ করিলে—
কেমন ভাগ করিলে কেহ্ বলে শুনিতে বাসনা।
সাহেব বলে বাঙালীদের হবে বিড়ম্বনা
দিয়ে আগুন জ্বেলে—
দিয়ে আগুন জ্বেলে এলেম চলে, সাহেবজাদা কয়
ধিকি ধিকি জ্বলবে আগুন নিব্বিবার তো নয়।
সাত সমুদ্র তেরো নদী—
সাত সমুদ্র তেরো নদী সিচে যদি তুইলে ফেল পানি
তথাপিও না মিটিবে ভারতের অগনি।
কহে সাগর আলি
কহে সাগর আলি ভেইবে বলি খাটেনা মাকান
জয় হিন্দুস্থান মোদের জয় হিন্দুস্থান।

বাঁটোয়ারা হইল সারা ॥

এই গানটির মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্যনীয়। বিদেশী শাসনের সমস্ত গ্লানি, বেদনা 'গান্ধী' নামক একটি বিমূর্ত চেতনাকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। স্পষ্টতঃই গান্ধী সম্পর্কে যে 'তথ্য' দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে গান্ধীর জীবনের সম্পর্ক সুদূরতম। কিছু ভাসা-ভাসা তথ্য, কিছু কল্পনা মিলে কী ভাবে 'মিথ' তৈরী হয়, তার এক উদাহরণ গানটি। কিন্তু গানটির সবলতম জায়গা হলো দেশবিভাজন সম্পর্কে রচয়িতার আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি। দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে যে আগুন জ্বেলে গেল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তা যে 'নিব্বিবার নয়', এই উপলব্ধিটা গ্রাম্য কবির অন্তরের গভীরতম স্তর থেকে উঠে এসেছে। এইখানেই গানটি প্রকাশের সার্থকতা।

ওয়াং ওয়েন-সি

বসন্ত উৎসবের দিনগুলি

অনুবাদ : মণি দেব

বসন্ত উৎসবের অবসর বিনোদন সবে শেষ হলো। সারা গ্রাম এখনও উৎসবের আমেজে ভরপূর। উজ্জ্বল রোদের তাপ বাড়ার সাথে সাথে কৃষকরা কিন্তু প্রাতঃরাশ সেরে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ল। পুরুষরা সার বোঝাই গাড়ী সমবায়ের জমিতে ঠেলে নিয়ে যেতে ব্যস্ত, মেয়েরা ঘরে সুতো পাকিয়ে তাঁত চালিয়ে পরিবারের লোকদের গরমের পোশাক তৈরীতে মসগুল। চাকা ঘুরছে, গুন গুন শব্দে চলছে তাঁত, সর্বত্র কোলাহলমুখর।

একমাত্র ব্যতিক্রম নানচাও গ্রামের তা-চিয়ে। যদি কাউকে বলা যায় তা-চিয়ের কাজে স্পৃহা নেই, শুধু রাগে জ্বলছে—কেউ বিশ্বাস করবে না। জানলার গোড়ায় আলো এসে পড়া সত্ত্বেও সে এখনো সকালের খাবার বানায়নি, বিছানা ঠিকঠাক করেনি, উঠানও পরিষ্কার করেনি। উঠানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কুকুর মুরগী তাড়িয়ে দিল সে। একটা লাঠি নিয়ে আলগা খোঁয়াড় ভেঙে বেরিয়ে আসা শুওরের বাচ্চাগুলোকে উঠানভর ধাওয়া করেই চলল। মুরগী কুকুর আর শুওর ছানাগুলোকে বের করে দিয়ে সে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বড়ো ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করছিল।

হুড়কো ও তালা লাগানো বাইরের দরজাটার দিকে সে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। হুড়কো আর তালা ঠিকমতো বন্ধ থাকায় সবই, এমনকি জাগ্রত বসন্তও, আটক ছিল দ্বারে—চুপিচুপি সাদা দেবদারু গাছ বেয়ে উঁকিঝুঁকি মারা ছাড়া আর উপায় নেই তার। উঠোনে সব এলোমেলো। মুরগি ও শুওরের ছানার জন্য পরিপাটি করে রাখা খড়ের গাদা আর কাঠের জ্বালানি এখন সারা উঠোনে ছড়ানো ছিটানো।

তা-চিয়ে ম থা নুইয়ে হঠাৎ বুঝতে পারলো, যে লাঠিটা এতক্ষণ সে হাতে ধরেছিল সেটা গরু মোষের জাবনা গুলবার লাঠি। হাতে যেন ছেঁকা লাগল—

এমন ভঙ্গিতে সে বিতৃষ্ণায় নাক কুঁচকে ভাবল এ তার দুর্ভাগ্য। উত্তরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সে সর্বশক্তি দিয়ে লাঠিটা দেওয়ালের বাইরে ছুঁড়ে ফেলল।

ঘরে ছেলে কাঁদছিল। ঘরে ঢুকে রেগে বলল, "কাঁদ, কেঁদে মর, আমার জ্বালা জুড়ো। তোরা মরলে আমার শান্তি।" মনকে হাল্কা হতে দিয়ে অন্য-মনস্কভাবে খাটে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলের কান্নায় ততক্ষণে তার মন নরম হয়ে এসেছে। কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিল তা-চিয়ে।

গ্রামের গলিগুলো থেকে আনন্দধ্বনি মাঝে মাঝে দেয়াল টপকে ভেসে আসছিল। মানুষের কথাবার্তা, চাবুকের আওয়াজ, চাকার ঘরঘরানি, দই ফেরিওয়ালার ডাক। সব মিলিয়ে একাকার। এরই ফাঁকে ভোগ্য সমবায়ের চলমান দোকানীর চোঙা ফোঁকার আওয়াজ, "প্রতিবেশী ভাইসব—ঝকঝকে চিনি, মিষ্টি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, চা……।" পেছন পেছন ছেলেদের বিচিত্র কলকল শব্দ। ভারি চমৎকার! তা-চিয়ে হারিকেনটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো, "এটা এখনই ভরে রাখা দরকার। চিনিও ফুরিয়ে এসেছে।" খাটের মাদুরটার এককোণ টান দিয়ে তুলো ব্যাংকের কড়কড়ে নতুন নোট বের করে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে টাকাটা আবার বালিশের তলায় রেখে দিল। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সেখানে অনড় মূর্তির মত বসে রইল।

একটা গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে তার অহেতুক চিন্তায় ছেদ টেনে দেয়। সে মাথা তুলে মনোযোগ দিয়ে শুনতে সচেষ্ট হোল। শোনা যাচ্ছে, "চাবুকটা আমাকে দাও।" তারপর আবার "উ উ উ!"—পশু থামানোর আওয়াজ। তারপর ছড়ির পরিষ্কার আওয়াজ আর লোকটার চিৎকার: "হ্যাঃ, হ্যাঃ, হঃ…হঃ…হ্যাঃ, হ্যাঃ, হঃ…হঃ…হঃ…উ!…দেখেছ? এভাবে করতে হয়। তুমি যেভাবে জোর খাটানোর চেষ্টা করছ, সেভাবে হবে না। বুড়ো, গরুবাছুরকে তোমার আরো যত্ন করা উচিৎ! কি হবে বলতো, যদি একটাকে মেরে ফেল? এজন্য দাম দিতে হবে তোমাকে, বুঝলে? হ্যাঃ…হ্যাঃ।"

কথাগুলোর মধ্যে সারাক্ষণ দুঃখ ও নিঃসঙ্গতার লেশটুকু অন্বেষণ করার চেষ্টা করে তা-চিয়ে সামান্যতম সান্ত্বনা পেতে চাইল। কিন্তু না, কিছু খুঁজে পেল না। ছোট্ট অজ্ঞান শিশুর উদ্দেশ্যে সে বিরক্তিতে বলল, "অবোধ শিশু, তোর অকৃতজ্ঞ

বাবা আমাদের দুজনকে ফেলে পালিয়ে গেছে। আমাদের বিনিময়ে নিজেকে সে নিষ্কলুষ ভাবছে!" বাইরের কথাবার্তায় সে কান না দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অসম্ভব। একান্ত আপন মানুষের মধুর ধ্বনি কানের কাছে এই মুহূর্তে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, তার বুকের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল তা। আওয়াজ নিকটবর্তী হচ্ছিল। মনে হোল তার দরজার কাছে এসে থামল।

"ও ফিরে আসছে!" সে ভাবলো। মুহূর্তের জন্য ভেবে পেল না কি করবে। তড়িৎগতিতে ছেলেকে নামিয়ে রেখে একটা ন্যাকড়া নিয়ে রান্নার সরঞ্জাম ও টেবিলের উপরটা মুছে ফেলল। তারপর চুলে চিরুনী চালিয়ে আয়নায় মুখ দেখল।

দুম্, দুম্, দুম্! কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

"দরজাটা বন্ধ করে রাখা আমার উচিত হয়নি। কেমন করে ওর সামনে দরজা খুলে দাঁড়াব?" তার অনুশোচনা হোল। তারপর আবার, "না, এমন কিছু খারাপ ব্যাপার হয়নি! ওর যেমন খুশী আসুক! না, রর পক্ষে ব্যাপারটা তাহলে বড্ড সোজা হয়ে যাবে।"

দুম্, দুম্, দুম্!

তা-চিয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘর পরিষ্কারে লেগে গেল।

দুম্, দুম্, দুম্!

আয়না হাতে ঠোঁট বেকিয়ে ঈষৎ হেসে আস্তে আস্তে আপন মনে বলল, "দাও, ধাক্কা দিয়েই যাও। যতক্ষণ না সব পাড়াপড়শী শুনতে পায়, চালিয়ে যাও, আমি সেটাই দেখতে চাই।"

দুম্, দুম্, দুম্!

"তা-চিয়ে, দরজা খুলে দাও!"—এক বৃদ্ধার গলা।

সে বিস্ময়ে আবিষ্ট হলো। শরীর থেকে যেন সমস্ত শক্তি উবে গেল। আয়নাটা হাত থেকে খসে খাটে মাদুরের ওপর গিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ থেমে থেকে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "আসছি!"

ইন চাও মাসী। ভাগ্য যাদের প্রতি সুপ্রসন্ন, তাদের একজন। সব সৎ কঠোর পরিশ্রমী ছেলেপিলে নাতিনাতনির বড় সংসারের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি খোলা মনে সুশৃঙ্খলভাবে সংসার দেখাশোনা করেন। একবার ছোট বৌয়েরা নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করায় গত দশ বছর ধরে বড় ছেলের বৌয়ের

উপর সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং সবাই তাঁকে সম্মান করে এবং সমবায় সমিতির কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করার যথেষ্ট সময় ও উৎসাহ তিনি পান। বয়সে প্রায় সবার থেকেই বড় হওয়া সত্ত্বেও সবার সাথে নিরহংকার বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন বলে গ্রামের সবাই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করে। ছোটদের তিনি নিজের ছেলেমেয়ে নাতি নাতনির মতো মনে করেন। কিন্তু প্রাপ্য সমালোচনার জন্য তিনি কখনো কাউকে রেহাই দেননি।

তা-চিয়ে দরজা খোলার সাথে সাথে মাসী তিরস্কার করলেন, "এ সবের মানে কি? এত বেলা হয়েছে, তোমার দরজা এখনও বন্ধ, সমস্ত উঠানটা একাকার হয়ে আছে! এইভাবে কি কোন বৌয়ের চলা উচিত? সত্যি, তোমাদের মতো অল্পবয়সী মেয়েরা…"

উঠানে পা রেখে তিনি আবার ধমকে উঠলেন, "একবার দেখ দেখ! আগাগোড়া নোংরা, এলোমেলো; এটা কি খুব সম্মানের?"

ঘরে ঢুকে আবার ভ্রূকুটি করলেন, "না, এ আমার মোটেই পছন্দ নয়! খুবই লজ্জার কথা! এত নোংরা! এত বেলায় এখনও লেপ ভাঁজ করে রাখনি, ঘরদোর গুছোওনি, বাচ্চাটা এখনও সেই কবেকার পোশাকে হামাগুড়ি দিচ্ছে…এটাকে ঘর বল তুমি? আমি বলি মুরগীর আস্তানা! বাসাটাকে একটা কসাইখানা বানিয়ে ফেলেছ কেন, কিসের জন্য? ওঃ, তোমাদের মতো অল্পবয়সী বৌদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে যাচ্ছে…।"

তা-চিয়ে মাসীকে খাটে বসতে বলে বিছানা ঠিক করতে করতে বিষণ্ণ মনে বলল, "জীবনের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে মাসী! নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একদিন দুচোখ বুজবো, ঠিক তাই করব।"

"অপদার্থ! এরকম বাজে কথা বলো না। অলক্ষুণে কথা বলতে ভয় করছে না?"

"অতীতের অপরাধের মূল্য দিতে হবে আমাকে: কেন আমার আজ এই দুঃসময়? মাসী, বসন্ত উৎসবের সকালবেলার প্রথম ঘটনা তুমি তো জান না…।"

চাও মাসী তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, "এ সব তোমারই দোষ। তুমি যদি সেদিন তাকে এমন কঠিনভাবে মনে দুঃখ না দিতে তাহলে এমনটা হোত না। তোমাদের দুজনের এই অবস্থা দেখে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছে গো। ঠিক আছে, আমি এখনই যাচ্ছি, তাকে ধরে নিয়ে আসছি।"

"না, যাবে না। এ আমারই দোষ। আমিই ভুল কাজ করেছিলাম। ওকে গ্রহণ করতে সম্মত হওয়াটা গোড়াতেই আমার উচিত হয়নি, কিন্তু এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। যা হবার তা হয়ে গেছে।"

ছেলেটা কান্না জুড়ে দিল। কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে চোখের জল মুছে আবার শুরু করল তা-চিয়ে: "দেখ, আমাকে কেমন বিপদে ফেলে গেছে! আমি না হলে সে না খেয়ে থাকতো, নয়তো প্রাণে মারা পড়তো! এখন সে গরু ঘোড়া দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে আর এজন্য খুব গর্ব তার। মানুষটা এত হৃদয়হীন, অহঙ্কারে এত বেশী ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে, তার কাছে ছেলের বা আমার কোনোই প্রয়োজন নেই। ওকে ডেকো না তুমি, ওকে আমি ঢুকতে দেব না। ওর এই উন্নতির জন্য আমি কী না করেছি বলো তো?"

চাও মাসী তা-চিয়ের দিকে সরে এসে ঘাড় নেড়ে আদর করে বললেন, "এ্যাই মেয়ে! কই এ ক'বছর তো তোমাদের কোন গোলমাল ছিল না। আর এখন এ সব বাহাদুরির কথা বলছ? তোমার মাসী জানে কি তোমাদের অসুবিধা। ন্যাকামি করো না। পুরোনো প্রবাদটা জান তো, 'মানুষকে পৃথিবীতে তার রাস্তা করে নিতেই হয়'। তুমি তো তাকে আঁচলে বেঁধে রাখতে পার না। চেঙ-সু'র মতো একজন সৎ ভালো মানুষ অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয়টি খুঁজে পাবে না। শুধু তাই নয়, এ ক'বছর কেমন সুন্দর চালিয়ে এসেছে সেটাও বল। জেলার যেখানে খুশী সে যেতে আসতে পারে, জেলা প্রধান লিউ বা সম্পাদক ইয়াং-এর সাথে সমানে সমানে কথা বলতে পারে।"

"ও সোনার সিংহাসনে বসলেও আমি এতটুকু ভাবি না। আরো এগিয়ে যাক, সম্মান প্রতিপত্তি অর্জন করুক, আমি আমার এই নুন ভাত শাক পাতার ঝোলে সন্তুষ্ট। এই তো গত তিন দিন বেশ চালিয়ে নিয়েছি, এভাবেই জীবনের বাকি কটা দিনও চালিয়ে নিতে পারব।"

"ভেবো না মাসী তোমাকে বকতে চাইছে, কিন্তু তুমি বাছা ভাল কাজ করনি। তুমি বলতে চাইছ এ-কদিন খুব কষ্টে কাটিয়েছ। কিন্তু সে ঢের বেশী কষ্টে কাটিয়েছে এ-কদিন। এর-তার বাড়ীতে সামান্য কিছু খাবার কি একবাটি ঝোল খেয়ে…।"

"ভিক্ষে করার জন্যই ও জন্মেছে। ওর যদি একটা সোনার বাটি থাকতো তো তাই দিয়েই ভিক্ষা করত। আমি কি করতে পারি?"

"তোমাকে এখন আমার একটি থাপ্পড় মারা উচিত, বুঝলে! অবিবেচকের মতো আর কখনো এমন কথা বলো না। এ ক'দিন সে কোথায় কিভাবে ঘুমিয়েছে সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। খাটের বদলে দুপাল্লা দরজার তক্তার ওপর রাত কাটিয়েছে, মাথার ওপর হাট করে খোলা ছাদ। বরফে লেপ ভেজা। পরশুদিন রাতে একটা ষাঁড় এমনভাবে তার কানের কাছে এসে পড়েছিল যে অল্পের জন্য মুখটা বেঁচে গেছে। কাল রাতে একটা গাধা আর একটা খচ্চর-এর মারামারি লেগেছিল। এক জায়গায় খেতে খেতে একে অন্যেরটা নিয়ে টানাটানি করছিল। গুঁতোগুতি করতে করতে, যেখানে সে ঘুমিয়েছিল সেই দরজার পাল্লার ওপর লাফ দিয়ে উঠে সেটা ভেঙে ফেলল··· ।"

বিস্ফারিত চোখে তা-চিয়ে উদ্বেগাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "উঃ! খুব চোট লেগেছে?"

"তোমার জানা উচিত···।"

"কোথায় ওর লেগেছে? সাংঘাতিক নাকি, মাসী?" সে গভীর চিন্তান্বিত হলো। "আমাকে আগে বলনি কেন?"

মাসী মুচকি হেসে শান্তভাবে বলল, "তোর এটুকু জানা উচিত, আর যে-কেউ নিঃসন্দেহে আঘাত পেত, কিন্তু চেঙ-সু না। গরুবাছুর নিয়ে ও এত ভাবে যে প্রয়োজনবোধে কথা বলতে বা সামান্য অসুবিধা হলে যাতে লাফ দিয়ে উঠে পড়তে পারে সেজন্য প্রায় এক চোখ খুলে ঘুমোয়। ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে খচ্চরটা গাধাটাকে নির্ঘাত মেরে ফেলত।"

তা-চিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার গলার সুর পাল্টে ফেলল: "আমি যদি খচ্চর হতাম তাহলে তার পিঠে বেশ ভালো করে কয়েক ঘা লাগাতাম।"

"এটা তুই নিজেই নিজেকে বললি। তুই দেখছি উত্তেজনা ছড়াতে ওস্তাদ। নিজেদের মধ্যে দশটা গোলমালের সমান তুই একাই।"

তা-চিয়ের মুখটা লাল হয়ে গেল। সে ভুল বুঝতে পেরে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল। "শোন, সত্যি আমি তা বলতে চাইনি। আসলে ও মংল কি বাঁচল সে নিয়ে আমি কিছু ভাবি না। তার নিজেরই শুধু নিজেকে দোষ দেওয়া উচিত। ঢাকা ঘর, গরম খাট নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। আমি কি করতে পারি? সে ঐ সব জন্তু জানোয়ারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পায়ের

কাছে একটা গরু আর বগলে একটা বাছুর নিয়ে শুতে ভালোবাসে। এজন্য আমি কি করতে পারি? আমি তো আরো দুটো পা গজিয়ে নিতে পারি না।"

"তোমার এইসব আজেবাজে কথা আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না। হাস্যাস্পদ হতে তোমার ভয় করে না?" এই কথা বলে মাসী খাট থেকে নেমে পড়ল। "আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর।"

"মাসী, এসব তুমি বাদ দাও। তোমাকে পরিষ্কার বলে দিলাম, এত সহজে তাকে ঘরে পা ফেলতে দেব না। এখন যদি আমি শক্ত হয়ে দাঁড়াতে না পারি তাহলে পরে সে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করবে বুঝতে পারছ?"

মাসী রাগ-রাগ ভাব করে উত্তেজিত হয়ে বলল, "এখনই আমি বুঝে নেবার জন্য তাকে ডাকতে যাচ্ছি। ভাল লাগুক আর না লাগুক, তুমি আমার কথা শুনবে। এ ব্যাপারে গুরুজনদের মতের সাথে আমি একমত নই, ওতে কিছু এসে যায় না। এই মুহূর্তে তাকে ডেকে আনতে যাচ্ছি। সে যদি তোমার সাথে অন্যায় কিছু করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা চেয়ে নিতে দাও। সে এ কাজ করুক তুমি যদি না চাও, তাহলে তাকে তা ছেড়ে দিতে বল। স্বামী-স্ত্রীতে মনকষাকষি কখনো হয় না এমন তো নয়, কিন্তু এভাবে কেমন করে তুমি তার সাথে ঝক্কি ঝামেলা সামলাবে?"

মাসীকে বেরিয়ে যেতে দেখে তা-চিয়ে চঞ্চল হোল। উৎসবের জন্য তৈরী নতুন পোশাকে ছেলেকে সাজিয়ে দিল, খাটের ওপর থেকে একটা ঝুমঝুমি-পুতুল নিয়ে তার হাতে খেলতে দিল। তারপর কুয়ো থেকে এক বালতি জল আনল, কাঠ এনে জল গরম করল, রান্নার বাসনপত্র হাঁড়ি কড়া মেজে পরিষ্কার করল। আসবাবপত্র দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে নিল। উৎসবের আগে বাড়ীটাতে বসন্তকালীন ঝাড় পোঁছ হয়েছিল। জানালার মাথায় নতুন কাগজ সেঁটে তার ওপর লাল রঙের কাগজ লাগানো হয়েছিল, আর খাটের ওপর দেওয়ালে চারটে নতুন বৎসরের ছবি। পরিষ্কার করার পর নোংরা ভাব চলে গিয়ে বসন্ত উৎসবের সময় ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত বাড়ীটা সেইরকম ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠল। সে একটা ঝাঁটা নিয়ে উঠানে গেল। রোদ ঝলমলে সূর্য তখন মাথার ওপর। পুরো জায়গাটা পরিষ্কার করার মতো সময় ছিল না। তাই সে শুধু উঠোনের মাঝখানটা আর দরজার কাছটা পরিষ্কার করল। অবিশ্বাস্যরকম অল্প সময়ে, মাত্র কয়েক মিনিটে, বেশ পরিপাটি করে পরিষ্কার করল।

"দুপুরে কী রাঁধব?" তা-চিয়ে চিন্তান্বিত হলো। সয়াবীনের দুধ বিক্রেতা বুড়ো লোকটা এখনো যায়নি। "কেন, কিছু পিঠে! বসন্ত উৎসবের দিনেও আমরা পিঠে খাইনি।" ঝাঁটা রেখে হাত ধুয়ে, বালিশের তলা থেকে কিছু পয়সা আর টেবিলের ওপর থেকে একটা বড় বাটি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

চালাকচতুর আর কাজের-মেয়ে হিসেবে গ্রামে তা-চিয়ের খুব নামডাক। তার মন্দ ভাগ্যের জন্য সে গোড়া থেকেই সবার সহানুভূতি পেয়ে আসছে। সতের বছর বয়সে বিয়ের পাল্কিতে বসিয়ে তাকে নানচাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক বছর পরেই তার একটি ছেলে হয়েছিল। সেই বছরেই তার স্বামী কুওমিনটাঙ্ বাহিনীতে নাম লেখানো এড়াতে নিজের আঙুল কেটে ফেলে, কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়। কেঁদে কেঁদে তা-চিয়ে হৃদয় উজাড় করে বুক ভাসায়। এর থেকেও মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটে, চোখের জল শুকোবার আগেই তার ছেলেটি নিউমোনিয়ায় মারা যায়। অসম্ভব, অসহনীয় জীবন। পরপর এরকম দুটি দুর্ঘটনা, জীবন-অনভিজ্ঞ, কষ্ট করতে-অনভ্যস্ত কুড়ি-অনূর্ধ্ব এই অসহায় মেয়েটিকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করল। কেমন করে সে সহ্য করবে? কেমন করে সে বাঁচবে? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাবে? প্রতিবেশীরা তার জন্য উদ্বেগে চোখের জল ফেলল। কিন্তু সে পাগলও হয়নি, এবং বাস্তবিক পক্ষে কিছু ফেলতেও পারে নি। কারণ শাশুড়ীকে তার দেখাশোনা করতে হয়েছে। পুত্র ও পৌত্রহারা ষাট বৎসর-ঊর্ধ্ব এই অসহায় দুঃখী বৃদ্ধাকে দেখার আর কেউ ছিল না। তা-চিয়ে'র মা-বাবা আছে এবং সে যুবতী, কিন্তু এই অশান্ত বৃদ্ধা বিধবাকে কে দেখবে? সুতরাং তা-চিয়ে শাশুড়ীর মনে শান্তি আনতে চোখের জল লুকিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে নিজেকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করল। চাষবাস শিখল সে, বাজারে কেনাবেচা, মহাজন ও আদালতের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয় সব শিখল। একবার জমির খাজনা না দিতে পারায় তাকে আদালতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং মাটি খোঁড়ার কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই যুবতী বিধবার প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না লোকের। প্রতিবেশীদের মধ্যে কম সহানুভূতিসম্পন্ন লোকেরা প্রায়ই মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকত।

তার ধৈর্য ও ভীরুতা অচিরে রূপ নিল চাতুর্য ও সাহসিকতায়। তার যৌবনের কথা ভেবে ও ছেলে না থাকার জন্য তার শাশুড়ী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাকে বিয়ে করতে জোর করল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হলো না।

একদিন সন্ধ্যার সময় মাঠের কাজ থেকে ফিরে যেতে যাওয়ার সময় সে তার শাশুড়ীকে কোথাও খুঁজে পেল না। বার কয়েক ডাক দিয়ে কোন সাড়া না পেয়ে শঙ্কিত হোল সে। শাশুড়ীর ঘরের দরজা দেখল ভালভাবে বন্ধ এবং ভেতর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। জোর করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরার পর সে বুঝতে পারল, নিজের ভরণ পোষণের ভার থেকে তা-চিয়েকে মুক্তি দিতে গলায় দড়ি দেবার উদ্যোগ করছিল তার শাশুড়ী। দুজনে মিলে চোখের জলে নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য অনুশোচনা করতে লাগল।

অল্পদিনের মধ্যে সবকিছু ভালোর দিকে যেতে আরম্ভ করল তা-চিয়ের বর্তমান স্বামী চেঙ-সুর উপস্থিতির জন্য। বুড়োরা বলে পনের বছর আগে নানচাও আসার আগে পর্যন্ত সে আশ্রয়হীন বেওয়ারিশ যাযাবর জীবনযাপন করতো। গোড়ায় সে এক জমিদারের চাকর হিসাবে কাজ করে, পরে চাঙ্ নামে এক বৃদ্ধ পশুপালকের সাথে কাজ করতে চলে যায়। কোন নাম ছিল না তার, লোকে নাম দিয়েছিল চাও কুয়ান-তাও।

তা-চিয়ের দুর্ভাগ্যের বছরের শেষ মাসে চাও কুয়ান-তাও সেখান থেকে চলে এল এবং সে পারবে এমন কাজের সন্ধানে নানচাও গ্রামে এল। মধ্যস্থতাকারী কিছু লোক তাকে বিয়ে করার জন্য তা-চিয়েকে চাপ দিল। সে জানতো চাও কঠোর পরিশ্রমী, তার সম্পর্কে তা চিয়ের অনেকদিন ধরেই ভাল ধারণা হয়েছিল, সেকারণে তার বিশেষ আপত্তিও ছিল না। তবু সে আপত্তি করল এই ভয়ে যে তিন বছরের নিয়মমাফিক অশৌচ শেষ হওয়ার আগেই তার পুনর্বিবাহের জন্য লোকে হয়ত কানাকানি করবে। ঠিক সে সময় তার কিছু ধনী কৃষক আত্মীয় এরকম একজন দূরদেশী লোককে বিয়ে করতে বাধা দিল। তা-চিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল: "যখন বিপদে পড়েছিলাম তখন তোমরা কেউ কিছু করনি," সে ভাবল। "যখন আমাদের দুমুঠো খাবারের সংস্থান ছিল না তখন তোমরাতো কেউ সাহায্যের হাত বাড়াওনি। উপরন্তু এমন ব্যবহার করেছ যেন আমাকে চেনোই না। এখন তোমরা আশা করছো গুরুজন বলে সব মেনে নেব! আমার ধারণা তোমরা অপেক্ষা করছিলে মা মরে যাওয়া পর্যন্ত—যাতে আমাকে বিক্রি করে দিতে পার, আর সামান্য যা কয়েকফালি জমি আছে তা হাতিয়ে নিতে পার।" সুতরাং সমস্ত বাধা সত্ত্বেও সে তার শাশুড়ীর ইচ্ছা অনুযায়ী চাও কুয়ান-

তাওকে বিয়ে করতেই মনস্থ করল। সেই থেকে সেও নিজের নাম বদলে রাখল চাও-চেঙ-সু—মানে যে সংসারী জীবনযাপন করে।

বিয়ের ছমাস পর শাশুড়ী মারা যায়। মূল ভূখণ্ড পুরোপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সবই অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলছিল। তারপরেই জীবনযাত্রার মান বাড়তে শুরু করলো, বিশেষ করে খাজনা কমানো ও ভূমি সংস্কারের আন্দোলনের পর থেকে। সংসারের উন্নতির জন্য এই তরুণ দম্পতি কঠোর পরিশ্রম করলো। চেঙ-সু বেশ শক্তসমর্থ, চাষের কাজেও পাকা। তা-চিয়েও দুর্বল ছিল না। নিশ্চিন্তমনে যে কোন কাজ হাতে নিয়ে সে স্বামীর পাশে থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করেছে। এর পাশাপাশি, বাজারে বিক্রির জন্য সে সন্ধ্যার সময় সুতো পাকিয়ে কাপড় বুনেছে। এইভাবে, একটাও দিন নষ্ট না করে সারা বছর কাজ করেছে। দিন ফিরে আসায় তা-চিয়ের মুখে হাসি ফুটল, যেন নতুন যৌবন ফিরে পেল।

আধুনিক রীতি অনুযায়ী গৃহবধূরা সংসারের টাকাপয়সা নিয়ন্ত্রণ করে; সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে তা-চিয়ে সাংসারিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করল। চেঙ সু খুব অল্প কথার লোক হওয়ায় আরো সুবিধা হোল। সে শুধু জানে কাজ আর কাজ। কোনকিছু সিদ্ধান্তের ব্যাপার হলেই স্ত্রীর উপর ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করতো। প্রায়ই বলত, "তুমি যা বোঝ তাই কর।" সুতরাং গত কয়েক বছর ধরে তা-চিয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী যেভাবে সবচেয়ে আনন্দ পেত সেইভাবেই চলত। কিন্তু অল্প কিছুদিন হলো, সব বদলাতে শুরু করেছে।

গত দুতিন বছর ধরে চেঙ-সু সাহিত্য শিক্ষার পাঠশালায় পড়তে ও লিখতে শিখেছে এবং গ্রামের সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। অল্পকিছু দিনের মধ্যে সে শুধু সভায় বক্তৃতা দেওয়াতেই অভ্যস্ত হলো না, সেই সাথে ভালো মতো খবর-কাগজ পড়াও রপ্ত করে ফেলল। এরপরেই, চাও মাসী যেকথা বলছিলেন, সে জেলা-প্রধানের সাথে সমানে সমানে আলোচনায় বসতে শুরু করল। স্বামিগর্বে আনন্দিত হতো তা-চিয়ে। গত শীতের আগে তাদের একটি ছেলে হলো। সুখী জীবনের স্বপ্নে বিভোর হলো তা-চিয়ে। সে চাইল স্বামী আরো বেশী সময় ঘরে থেকে ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করুক, আলো জেলে সারাদিনের সমস্ত ঘটনা নিয়ে তার সাথে গল্প করুক। কিন্তু এ নিয়ে চেঙ-সু মোটেই মাথা ঘামাত না। সে বেশীর ভাগ অবসর সময় পড়াশুনা করে সভাসমিতিতে উপস্থিত

থেকে বাইরে কাটিয়ে দিত। তা-চিয়ে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও এ নিয়ে কখনো অনুযোগ করেনি।

গেল শীতে সমবায় সমিতি স্থাপিত হলে তা-চিয়ে বিনা দ্বিধায় যোগদান করল। উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস ও বোঝাপড়া এতই ভাল ছিল যে এ ব্যাপারে তারা গভীরভাবে আলোচনা করার কোনোই প্রয়োজন বোধ করেনি। আর সেখান থেকেই বর্তমানের যত গোলমালের সূত্রপাত। কারণ উভয়ে আগ্রহ নিয়ে আলাদা আলাদা ধারণার বশবর্তী হয়ে সমবায় সমিতিতে যোগ দিয়েছিল।

ছেলে নিয়ে সংসারের ক্রমশঃ উন্নতি হতে দেখে তা-চিয়ে ভেবেছে এই তো সুখী সংসারের সময়। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত তাদের দিন ছিল খুব কষ্টের। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর তাদের ঘাস কাটতে হতো, শুওরের খোঁয়াড় পরিষ্কার করতে হোত, গরু-ছাগলকে খাওয়াতে হোত। কিন্তু এখন সমবায় সমিতির অধীনে গরুমোষের দেখাশোনা যৌথভাবে চলে। দিনের বেলা সমবায় সমিতির জমি থেকে কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা একসাথে আরামে বসে সেলাই-এর কাজ কিংবা কোন জীবনী পড়ে বা গল্প ক'রে, নয়তো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শহরে সিনেমা দেখে বেশ কেটে যাবে। কি সুন্দর সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক জীবন! পরিকল্পনা মাফিক চলার জন্য সে এতটুকু সময় নষ্ট করেনি। দিনের বেলা গরু-ছাগল জলাশয়ের ধারে পাঠানোর পর সে চেঙ-সুকে গোয়াল থেকে গরুর খাবারের গামলা সরিয়ে বেশ পুরু করে ভালো মাটি দিয়ে সমান করে দিতে এবং দেয়ালগুলো সুন্দর করে লেপে দিতে বলত। ভেতরে সামান্য কিছু কাঠের কাজও হয়েছিল, সুতরাং সবই সুন্দর হতে পারত।

কিন্তু ঘটনা অন্যভাবে ঘটতে শুরু করল। চেঙ-সু সমবায় সমিতির সহ-সভাপতি ও গবাদি পশু বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হলো। নানা কাজে বাঁধা পড়ার প্রায় বাকি কিছুই ছিল না। এর উপর পশুপালনের দায়িত্ব নেওয়াতে যত গোলমালের সূচনা। ঘটনাটা ছিল এই রকম: সমবায়ের সভ্যরা গরুমোষ তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে প্রথম মনোনীত ব্যক্তির কাজ সন্তোষজনক ছিল না। চেঙ-সুকে এ দায়িত্ব নিতে বলা হলে সবাই নিশ্চিন্ত-বোধ করল। যেসব পরিবারের রবারের চাকাওয়ালা গাড়ী এবং শক্ত সমর্থ ঘোড়া ও খচ্চর ছিল তারা অনেকে সমবায়ে যোগ দিল এই ভেবে যে চেঙ-সু ধনী জমিদার বাড়িতে কাজ করেছে, অনেক গরুঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, সে

কঠোর পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত, সুতরাং সে-ই তাদের গরুঘোড়া দেখাশোনার পক্ষে উপযুক্ত লোক। তা-চিয়ে বেশ মনমরা হয়ে গেল। উপরন্তু সে-সময় সমবায়ের কিছু সভ্য গরুঘোড়া দেখাশোনার কাজ ঠিকমতো করছিলো না। চেঙ-সু তাদের দিয়ে ঠিকমতো কাজ করাতে গিয়ে তাদের বিরাজভাজন হোল। জনাকয়েক তার সম্পর্কে কটু মন্তব্য করল, এমন কি তা-চিয়েকেও বাদ দিল না। চেঙ-সু একেবারে কালা সেজে 'নিজের চরকা' নিয়ে ব্যস্ত রইল। কিন্তু তা-চিয়ে এসব কটুকথা মোটেই সহ্য করতে পারলো না। সব দোষ দিল স্বামীকে।

"তুমি শুকনো গাছের গোড়ায় জল ঢালছ। সমবায় সমিতিতে করার মতো অন্য অনেক কাজ আছে। অন্য কিছু করছ না কেন?" সে বলল।

"এসব গরুভেড়া কে তাহলে দেখাশোনা করবে?"

"তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পেয়েছে! তুমি ভাবছ তোমাকে ছাড়া সমবায় সমিতি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে? কেউ এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেয় না। তুমি কি শুনতে পাও না ওরা তোমাকে সব জায়গায় বিদ্রূপ করে?"

চেঙ-সু ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে বলল, "করতে দাও···কিন্তু আমি কিছুতেই এই গরুভেড়াগুলোর অযত্ন করতে দেব না কাউকে— সে যেই হোক না!"

"এই সব বাজে কথায় তোমার মুখ পুড়ে যায় না?"

চেঙ-সু শান্তভাবে বলল, "না।"

দাঁতে দাঁত চেপে তা-চিয়ে বলল, "আচ্ছা, কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিলাম, এ সব আমার সহ্য হয় না।"

শান্তভাবে সে বলল, "কান দিও না!"

"কিন্তু এসবের পেছনে তোমার যুক্তিটা কি? এর থেকে তুমি কি পাবে? প্রায় বেশীর ভাগ লোক অনভিজ্ঞ—তুমি কোন নিশ্চয়তা দিতে পার, সমবায় সমিতি উঠে যাবে না? গরুভেড়ার ওজন কমে যাবে না?"

"সমবায় সমিতি যাতে ভালোভাবে চলে এবং একটাও গরুঘোড়া নষ্ট না হয় তা আমাদেরই দেখতে হবে।" চেঙ-সু তর্ক করল, "বেশীর ভাগ লোক এ কথাই বলে। সবাই মনে করে আমিই এ কাজের উপযুক্ত লোক। আমি তো পিছিয়ে আসতে পারি না। আমার সঙ্গে সবাই সব সময় ভাল ব্যবহার করে। এখন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, লোকের ধারণা আমি কিছু ভাল কাজ করতে

পারি। সেজন্য গরু ঘোড়া তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছে। আর এটাই একমাত্র কাজ যা আমি জানি। সমাজতান্ত্রিক নানচাও গড়ে তুলতে আমার কি যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত নয়?"

তর্কাতর্কির পর তা-চিয়ে বুঝতে পারল কোথায় একটা গোলমাল হয়েছে। যতই সে চিন্তা করল ততই বুঝতে পারল, চেঙ-সু পাল্টে গেছে। এক সময় সে অল্প কথার লোক ছিল, আর এখন সে অন্য লোকদের বোঝাতে সদাব্যস্ত। এমন সময় ছিল যখন তাকে যা বলেছে সে তাই করেছে, কিন্তু এখন আর সে বলে না, "তোমার যা ভাল মনে হয় তাই কর।" চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডিটা এখন আর উভয়ের কাছে খুব প্রশস্ত মনে হয় না। যেন মনে হয় দুজনের মাঝখানে এক দুস্তর ব্যবধানের প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে কি অসম্ভব কিছু দাবী করেছিল? না! সে কেবল সাদামাঠা একটা দাম্পত্য-জীবন চেয়েছিল। এই রকম একটা সামান্য জিনিষ কি সে চাইতে পারে না? অবশ্যই পারে এবং চাওয়া উচিত। যতই হোক, সে গৃহকর্ত্রী তো বটে।

বসন্ত উৎসবের আগের দিন বিকেল বেলায় চেঙ-সুর বাড়ী ফিরতে দেরী হোল, কারণ ধূসর রঙের খচ্চরটাকে নিয়ম মতো ওষুধ খাওয়াতে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। উৎসব পালনের সমস্ত আয়োজন বাড়ীতে প্রস্তুত হয়েই ছিল, কিন্তু তা-চিয়ে গোমড়া মুখ করে নিঃসাড় নিঃস্পন্দ, প্রায় মূর্তির মতো খাটের এক কোণে বসে সুতো পাকাচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই চেঙ-সু বুঝতে পারল কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে।

হাসিমুখে সে বলল, "খাবার ঠিক করে রেখেছ?"

কোন উত্তর পেল না।

"একটু আটকে পড়ে গেলাম; জানি, আমার সামান্য দেরী হয়ে গেছে।" সে আর একবার হেসে বলল, "এস খেয়ে নিই। আমরা কি এখনই খাব?"

"সব শুওরের ছানাগুলোকে কি গেলানো হয়ে গেছে?" তা-চিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল।

একইভাবে হেসে সে বলল, "কার উপর তুমি রাগ করছ?"

"নিজের উপর!" বলে সে এমনভাবে জোরে সুতোয় পাক দিল যে সুতো ছিঁড়ে গেল।

এরপর আর কোন কথা বলতে সাহস না করে রান্নার হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলতে

গেল চেঙ-সু। পরিষ্কার থালা ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিল। হাঁড়িতে খোঁজাখুজি করে কিছুই পেল না। তার জন্য কিছুই খাবার রাখেনি তা-চিয়ে। তা-চিয়ের দিকে চেয়ে দেখল। সে তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে অচেনা লোকের মতো সুতো পাকিয়ে চলেছে। একটা জারের মধ্যে সাদা ধবধবে কিছু লোভনীয় খাবার চোখে পড়লো তার। কিন্তু এগুলো উৎসবের জন্য, সে ধরতে সাহস করল না। অবশেষে একটা ছোট মাটির ভাঁড়ে দানাশস্যের ময়দার তৈরী কিছু ঠাণ্ডা শক্ত লাড্ডু পেল। রান্নাঘর থেকে সামান্য চাটনি এনে সে খেয়ে ফেলল। স্ত্রীকে কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনতে সে গালে খাবার পুরে কিছু রসাল মন্তব্য তার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল।

সে বলল, "তে খুড়োর গাইটা প্রায় বিয়োবার মুখে।"

হুর, হুর হুর···চরকা কাটার শব্দ।

সে মজা করল, "তুমি নতুন ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষা নাওনি?"

হুর, হুর, হুর·····চরকা চলছে।

এর বেশী আর কিছু বলতে সাহস না করে সে নিঃশব্দে ঠাণ্ডা খাবারটা খেয়ে নিল। বালতিতে জল তুলে আনল, তারপর পশুপালকের চালাঘরে চলে গেল।

সেই রাতে তা-চিয়ে খাট গরম না হওয়া পর্যন্ত উত্তাপ দিল। বিছানা লেপ পাল্টে নতুন কাপড় চোপড় এনে লেপের নিচে রাখল যাতে পরদিন কাপড়গুলো পরার সময় গরম থাকে। ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আলোর পাশে বসে উৎসবের পিঠে বানাতে বসল। পিঠে বানাতে বানাতে বিকেলবেলা তার স্বামীর নানারকম উক্তির কথা, একটু আগে স্বামীর রসিকতার কথা ভাবছিল। সে দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে ভেবেছিল তার কথায় স্বামীর ঠিক চৈতন্য হয়েছে, এবার সে নির্ঘাৎ সকাল সকাল বাড়ী ফিরে তার সাথে আদর করে কথা বলবে এবং তারপর·····। যত বেশী সে এসব ভেবেছে ততই সুখ পেয়েছে। "আজ বিকেলে ওকে এমন চাঙা করে দিয়েছি, রাত্রে বাড়ী ফিরে নিজেই পিঠে খাওয়া শুরু করে দেবে।" পিঠে তৈরী হয়ে যাওয়ার পরেও সে এল না। জল গরম হোল, তবু সে এল না। লণ্ঠনে কেরোসিন না ফুরানো পর্যন্ত সে খাটে বসে আঙ্গুলের নখ দাঁতে কাটতে লাগলো। গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে এল, তবু তার ফেরার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তা-চিয়ে হুড়কো খুলতে গেল, গোয়ালে যাওয়া স্থির করলো। গোয়ালটা কাছেই, ঠিক উঠানের দেয়ালের ওপাশে। কিন্তু উত্তরের দেওয়ালে

কোন দরজা না থাকায় তাকে পাশের গলি দিয়ে ঘুরে যেতে হোল। একটা ছোট লণ্ঠন জেলে নিয়ে চলে গেল ও। গভীর অন্ধকার, নিঃঝুম নিশুত রাত, আকাশে মাথার উপর মিটিমিটি তারা।

পাশের গলিতে পৌঁছে দেখল তিনজন লোক আলো নিয়ে পশুপালকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন চাও ফেঙ-অ্যা—পশুপালিকা। তা-চিয়ের মুখের কাছে আলো তুলে ধরে সে অহেতুক বলল, "আমি দুঃখিত, চেঙ-সু ও আমি একমত হওয়ার পরেই আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

উত্তর না দিয়ে তা-চিয়ে গোয়াল ঘরে চলে গেল। দরজায় ঝোলানো খড়ের চাটাই আস্তে তুলে ভেতরে ঢুকল। সবগুলো জানালা বেশ ভালোভাবে বন্ধ করা ছিল, গনগনে আগুনে কাঠ জ্বলছিল। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। চেঙ-সু দরজার দিকে পেছন করে কি একটা কোলে আগলিয়ে বসে আছে।

"পৃথিবীতে কি এমন ঘটল যার জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হোল?" তা-চিয়ে ফেটে পড়ল।

গলা শুনে সে পেছন ফিরল, বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওঃ, তুমি! এ সময় এখানে এসেছ!" তারপরে বেশ উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে বলল, "শিগগির এস, দেখ!"

"কি এমন জিনিষ যে দেখতে হবে?"

"আমাদের সমবায়ের সৌভাগ্যলাভ।" চেঙ-সু বলল, "আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি আগামী বছর ভাল ফসল হবে। আজ বসন্ত উৎসবের আগের রাতে বুড়ো গাইয়ের একটা বাছুর হয়েছে, দেখ। এটা আবার এঁড়ে বাছুর। শুভ লক্ষণ নয়?"

আর ঠিক তখনই তা-চিয়ে তার কোলে বাছুরটাকে দেখতে পেল। সে আস্তে আস্তে বাছুরটার নরম ভেজা লোম মুছে দিচ্ছিল।

"গায়ের রঙটা কি সুন্দর দেখ! আগুনের মতো লাল!" আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঙ-সু বলল।

তা-চিয়ে সারা ঘরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একটা কাঠের গামলাতে সামান্য পাতলা মাড়ে গাইটা মুখ দিয়ে আছে। দেখল, যে লেপটা তার পিঠে চাপান সে নিজে হাতে সেটা তৈরী করেছিল। চেঙ-সু কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে বলল, "গরু বলে কি মানুষ নয়! শোয়ার সময় আমি তো ঠাণ্ডা লাগতে

দিতে পারি না। সেজন্য ওর গায়ে এটা দিয়েছি। এটা কোন ব্যাপারই না। আমি এখানে আছি, যাতে নোংরা না হয় আমি দেখব।"

তা-চিয়ে একই সঙ্গে সুখ ও দুঃখ পেল। রাগে অভিমানে দোলায়িত তা-চিয়ে প্রত্যুত্তরে বলল, "আচ্ছা, তোমার কি ঘর সংসার নেই? আজকের দিনটা কি, তুমি জান? আজ বসন্ত উৎসবের আগের রাত!"

"কিন্তু এখন কি করে যাব? ফেঙ-অ্যা চলে যেতে চাইল, এসব দেখার জন্য একজনের থাকা দরকার। তুমি আগে আগে যাও, দরজা বন্ধ করো না।"

তা-চিয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। ভুলে লণ্ঠনটা না নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেই ফিরে গেল। বাইরে গাঢ় অন্ধকারে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় সে হোঁচট খেল! অন্ধকার আকাশে হঠাৎ আলোর ঝলকানির সাথে শব্দ হওয়ায় সে এগিয়ে গেল—উৎসবের উদ্দেশ্যে আগেভাগেই বাজী পোড়ানোর শব্দ।

পরের দিন সকালের আগে চেঙ-সু বাড়ী ফেরেনি। তা-চিয়ের বিষাদ কঠিন মুখ দেখে সে বুঝল ঝড় আসন্ন। নিঃশব্দে সে টেবিলটা ঠিক করে আগুন ধরাতে গেল। রান্নার হাঁড়িতে বানানোর জন্য পিঠে ছেড়ে তা-চিয়ে কর্কশস্বরে নির্দেশ দিল, "এখানে আগুন দাও"।

চেঙ্-সু জোরে জোরে হাপর টানতে লাগল।

"এত জোরে না, সেদ্ধ হয়ে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সে হাপর টানা বন্ধ করে দিল।

"চালিয়ে যাও! বন্ধ করলে কেন? তুমি কি আস্তে আস্তে করতে পার না?" নিঃশব্দে, খুব সাবধানে চেঙ-সু হাপর টানতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে পিঠেগুলো হাঁড়ির মধ্যে লাফাতে সুরু করল। সে আগুন নিবিয়ে টেবিলের কাছে গেল। তা-চিয়ে একটা বাটিতে গরম পিঠে এনে সামনে ধরল। বাটিটা যেইমাত্র ধরতে গেল অমনি ওর হাত থেকে পড়ে গিয়ে নিজের হাতে গরম রস মাখামাখি হয়ে গেল, আর বাটিটা টেবিলে গড়াগড়ি যেতে লাগল। চেঙ্-সুর রক্ত গরম হয়ে মাথায় উঠল। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করল। চিৎকার করে বলল, "আচ্ছা, তুমি একটু সাবধান হতে পার না?"

"কি? এখানে তোমার ভালো লাগে না, না?" তা-চিয়ে জ্বলে উঠলো। "যেখানে ভাল লাগে সেখানে যাও না? কেউ তোমাকে ধরে রাখেনি। তুমিই ভখিরী হয়ে এখানে এসেছ। আমি তোমাকে কোন নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইনি।"

তার তিরস্কার শুরু করার প্রথমদিকে চেঙ-সু নিজেকে সংযত করে রাখল। কিন্তু বাস্তবিকই টান দিয়ে দড়ি খোলার মতো তা-চিয়ে চেঙ-সুর যাযাবর জীবনের পুরো বিবরণ দেওয়া শুরু করে দিল। ভিখারীর ভাগ্য নিয়ে সে যে তার বাবার নাম পর্যন্ত জানতো না এমন কথাও অবজ্ঞাভরে শুনিয়ে দিল উনুন নেভাতে নেভাতে। এক মুহূর্তের জন্য সে থামেনি। কী একটা পড়ার শব্দে তার সম্বিৎ ফিরে এল। দেখল, পিঠের রস তার স্বামীর পায়ের তলা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, সারা মেঝে পিঠে আর হাঁড়ির টুকরোতে ছড়ানো ছিটানো।

"বাঃ! চমৎকার বসন্ত উৎসবের প্রতি নিষ্ঠা…।" সে আবার কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাওয়ার আগেই চেঙ-সুর ফ্যাকাসে মুখ, হাতের কাঁপুনি আর শোঁশালো ঠোঁট দেখে দমে গেল। তার চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এল, চোখ জ্বলতে লাগল। এর পরে সে কি করবে বুঝতে না পেরে তা-চিয়ে দমে গেল। চেঙ-সু ঠোঁট কামড়ে একটা হাত তুলল, কিন্তু তাকে ধরল না, চেয়ারটা আস্তে আস্তে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে তা-চিয়ে কি করবে বুঝতে পারল না।

সেই থেকে তিনদিন হোল সে বাড়ী ফেরেনি।

এই তিনদিন ধরে তা-চিয়ে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। নিজের অন্যায়ের কথা ভেবে লজ্জা ও কষ্ট পেয়ে কেঁদেছে। প্রায় সময় বিড় বিড় করে বলেছে, "ও কি চায় আমাকে বলতে পারত, আমাকে মারতেও পারত, এর থেকে অন্য যে কোন কিছুই ভালো হোত।" চেঙ-সু কোথায় কি খেয়েছে, কেমন করে রাত কাটিয়েছে তা কিছুতেই সে বাইরে গিয়ে খোঁজ না নিয়ে পারেনি। এই কয়দিন সে কিছু না কিছু রান্না করে কোন প্রতিবেশীকে গিয়ে বলেছে তার তৈরী রান্না না জানিয়ে তার স্বামীকে দিতে। এসব কথা প্রতিবেশীরা চাও মাসীকে বলায় তিনি অশান্তির হেতু খুঁজে বার করতে এসেছেন।

খাটের উপর বসে তা-চিয়ে আবার পিঠে বানাতে বসেছে। তার কাছে এই পিঠে আগের থেকে আরো অনেক বড় একটা ব্যাপার। বানাবার সময় আঙুল দক্ষভাবে চালনা করতে করতে সে গত কয়েকদিনের ঘটনাবলীর কথা চিন্তা করছে। তার এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের কাছে এই ঘটনা অর্থবহ। নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছে। উত্তরের জানালা দিয়ে যখন তখন তাকিয়ে থেকে

ওপাশ থেকে ভেসে আসা শব্দ গভীরভাবে শোনার চেষ্টা করছে। মাথা নীচু করে পরবর্তী কর্তব্যের কথা ভালোভাবে চিন্তা করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে উঠোনে সে খস খস শব্দ শুনতে পেল। মাথা তুলে দেখল চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত ললাট, বলিষ্ঠ চোয়াল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এক লম্বা লোক। হাতে একটা কাঠের দা নিয়ে মুরগীর ছড়ানো খড় এক জায়গায় জড়ো করতে ব্যস্ত। তা-চিয়ের গতিবিধির দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে সে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। তা-চিয়ে'র হৃদয়ে দ্বিধাজড়িত উল্লাস। সে সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে কড়িকাঠের দিকে ঠোঁট ফুলিয়ে চেয়ে রইল। ক্রমাগত খস খস শব্দ হচ্ছিল। এ এমনই এক আকর্ষণ যে, চেঙ-সু'র গতিবিধির দিকে আবার ঘুরে ফিরে তার চোখ গেল। বাঁশের একটা বড় ঝাঁটা দিয়ে সারা উঠোন পরিষ্কার করতে লেগে গেছে সে। আর মাত্র কয়েক ঝাঁট দিলেই উঠোন পরিষ্কার হয়ে যাবে। মুহূর্ত মধ্যে মনে হলো উঠোনটা বেশ প্রশস্ত, সূর্যালোকে উজ্জ্বল, উত্তপ্ত। চেঙ-সু একবারও তার দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে ঝাঁটাটা রেখে দিয়ে শুওরের খোঁয়াড়ের পড়ে যাওয়া কিছু ইঁট ঠিক করে রাখল।

তা-চিয়ে সশব্দে ঠোঁট বেঁকিয়ে স্থিরভাবে আবার কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ শপাং শব্দ হওয়ায় সে আবার বাইরের দিকে তাকাল। দেখল, চেঙ-সু তার কালো কোমরবন্ধনীটা দিয়ে কাপড়ের ধূলো ঝাড়ছে। এখন সে মেপে মেপে তা-চিয়ের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য সে ঘাবড়ে গিয়ে আবার ঠিক হয়ে বসল। দরজার দিকে পেছন করে সে ঘরের এক কোণের দিকে চিত্রার্পিতের মতো চেয়ে রইল। পদক্ষেপ তার দিকে এগিয়ে এসে থেমে গেল। সে না শোনার ভাণ করল। মাথা নুয়ে প্রাণপণে ময়দা ঠেসতে লেগে গেল। হঠাৎ জল আনার বালতি ও কাঁধে বয়ে আনার বেঁকারির খটখট আওয়াজে নিঃশব্দতা ভেঙে গেল। চারদিক একবার চুপ করে চেয়ে সে দেখল চেঙ-সু বেরিয়ে গেছে। শুধু একটা কাঠের বালতি দরজা দিয়ে অদৃশ্য হতে দেখল।

বালতির পর বালতি টাটকা জলে বড় জালাটা ভর্তি হচ্ছিল, আর এদিকে তা-চিয়ে এক কোণে ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে বসেছিল। পরিপাটি করে কাজটা করার দিকে নজর ঠিকই ছিল। শেষ পিঠেটা বানানোর সময় সে এমন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, যেন সে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে।

এমনি সময়ে চাও মাসী এসে পড়লেন। একসঙ্গে দুজনকে কেমন দেখায়

এক ঝলক দেখে নিয়ে হেসে বললেন, "ইয়ে, তোমরা দুজনেই এখন বড় হয়েছ, ছেলেমানুষের মত কাণ্ড কেন যে কর? তা-চিয়ে, তোমার পেছনটা দেখতে কি খুব মনোহর? এদিকে ঘোর!"

"মাসী! এস, খাটের ওপর বসো।" ব্যস্তভাবে হাসিমুখে সে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। কিন্তু আসলে তার চোখ মাসীর কাঁধের উপর দিয়ে চেঙ-সু'র প্রতি নিবদ্ধ। এই যেন ছিল তার চাউনির ভাষা: "তুমি কি জান না ফিরে আসার মতো তোমার একটা বাড়ী আছে?"

মাসী উৎফুল্ল হয়ে বলল, "আঃ! পিঠে! আমার জন্য?"

তা-চিয়ে বলল, "অবশ্যই! আর কে আছে এ সবের জন্য?"

"এখন কোন বাজে কথা নয়। আমি আসল ঘটনা জানি।" চেঙ-সু'র দিকে ফিরে মাসী বলল, "আমার কি সৌভাগ্য, তোমাকে ধন্যবাদ। অবহেলা না করে এরপর থেকে আমার উপদেশ শুনবে।"

চেঙ-সু সহাস্য বদনে বলল, "আমি তো কখনো তোমার উপদেশ অবহেলা করিনি।"

মাসী বলল, "এই তো চাই। আচ্ছা, এখন আমাকে যেতে হচ্ছে।"

উভয়েই বাধা দিল, "না, এখন তুমি চলে যাবে কেমন করে?" তা-চিয়ে তাকে ধরে খাটের ওপর বসাল। আর চেঙ-সু কাঠের জ্বালানি আনতে গেল।

সে বেরিয়ে যেতে মাসী তা-চিয়ের কানে চুপি চুপি বলল, "ঘাবড়িয়ো না। আচ্ছা করে আমি তাকে বেশ কয়েকটা কথা বলেছি। কোন উত্তর করেনি ও। কিন্তু বসন্ত উৎসবের দিন হাঁড়ি ভেঙে ফেলার ভুলের জন্য আক্ষেপ করেছে। একটু আগে সমবায় সমিতির প্রধানের কাছে গিয়েছিলাম। সে বলল, চেঙ-সু এমন একজন লোক যাকে ছাড়া সমবায় সমিতির এক মুহূর্ত চলে না। কিন্তু তারা তোমার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। তোমাদের স্বাচ্ছন্দের কথাও সমবায় সমিতি ভেবে দেখবে।"

চেঙ-সু কাঠের বোঝা নিয়ে এসে উনুনের আগুন জ্বালতে বসে পড়ায় তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। জল গরম হয়ে যাওয়ায় তা-চিয়ে রান্নার হাঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তার মধ্যে পিঠে ফেলতে লাগলো। এবার সে আগুনের জন্য আর কোন অভিযোগ করল না। চেঙ-সু তিন দিন পরে যেন আগুন জ্বালানোর কাজে রীতিমতো অভিজ্ঞ হয়ে এসেছে।

এক খণ্ড কালো কাপড় খাটের ওপর থালা রাখার জন্য পাতা হোল। খাটের ওপর মাসী দেওয়ালে হেলান দিয়ে বলল, "চেঙ-সু তুমিও চলে এস।" সে জুতো খুলে মাসীর পাশে এসে বসল।

তা-চিয়ে একটা বাটিতে পিঠে এনে মাসীর সামনে রাখল। তারপর তার স্বামী সব সময় যে বাটিতে খায় সেটা নিয়ে এল। চেঙ-সু আস্তে আস্তে সুন্দর করে বেশ গম্ভীর অথচ দৃঢ়ভাবে কথা বলা শুরু করল, যেন কোন অনুষ্ঠানের জন্য বক্তৃতা তৈরী করেছে।

সে শান্তভাবে বলল, "আমাকে কিছু খেতে দিও না। এখন থেকে সরাসরি নিজে নিয়ে খেতে হবে, তাহলে তুমি আর বাটি টেনে নিতে পারবে না।"

ওর বলার সময় পরিবেশ উত্তপ্ত ছিল। "সমবায় সমিতির জন্য আমি কাজ করি, এবং করব; তা সে যে কাজই হোক না কেন। সবাই চায় আমি গরু ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করি, আমি ওদের বিরুদ্ধে যাব না। এ ব্যাপারে কোন কিছুই আমার মন টলাতে পারবে না!"

ঘরে একটা অস্বস্তিকর চাপা নিঃশব্দতা। এতক্ষণ মুখে কুলুপ এঁটে থেকে মাসী বিস্ফারিত চোখে একবার এরদিকে আর একবার ওর দিকে চাইল। হঠাৎ তিনি বাটি ও চামচ নামিয়ে রেখে চিৎকার করে বললেন, "তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি আমার নামে কালি মাখাতে চাও? আমাকে বোকা বানাতে চাও, অ্যাঁ? তোমাকে কি বলেছিলাম? একটুও কি তোমার কানে ঢোকেনি?"

তা-চিয়ে অবশ্যি তার উপস্থিত বুদ্ধির দৌলতে চটপট শান্তভাবে বলল, "মাসী, উত্তেজিত হয়ো না। ওকে বলতে দাও, শেষ করতে দাও।"

মাসী চেঙ-সুকে তিরস্কার করল, "প্রত্যেক ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর একসাথে বসে আলোচনা করে ঠিক করা উচিত। তোমার মতো এতো একগুঁয়ে আর জেদী লোক আর দুটি নেই।"

তা সত্ত্বেও চেঙ-সু কিছুমাত্র বিচলিত হোল না। ঠিক সেই মুহূর্তে বাচ্ছাটা জেগে উঠে ডাকল, "বা···বা!" চেঙ-সু তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল, কপালে চুমু দিয়ে তা-চিয়ে'র দিকে তাকিয়ে রইল তার কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায়।

সে বলল, "তুমি কি আগাগোড়া একাই সব বলবে? চালিয়ে যাও। যতক্ষণ মাসী এখানে আছে মনের মধ্যে যা আছে সব বল।"

"ঠিক আছে, আমি সব বলতে চাই।"

"সব?" পিছন ফিরল তা-চিয়ে। কিছু বলার আগে কয়েকটা পিঠে হাতা দিয়ে তুলল, "যে পবিত্র কর্তব্য তুমি পালন করতে চলেছ, আমার মনে হয় এ এক স্মরণীয় ব্যাপার হবে।"

"পাছে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয় সেজন্য আমি এখনই সব খোলসা করে নিতে চাই।"

তা-চিয়ে তার সামনে পিঠের বড় গামলাটা রেখে হাত দুটো নিজের জামাতে মুছে উত্তেজিত ভাবে বলল, "আমাকে এভাবে ছোট করো না! আমার জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে; আমি দুর্বল নই। তুমি সমাজতন্ত্র চাও, আমিও চাই। সমবায় সমিতিকে তুমি যতটা ভালবাস আমিও ততটাই ভালবাসি। যদি তুমি সমুদ্রে পাড়ি দাও, আমি ঐ একই নৌকার দাঁড় ধরব। যদি তুমি পাহাড়ে ওঠ, আমিও তোমার পাশে থাকব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তুমি যেখানেই যাও আমি তোমাকে অনুসরণ করব।"

এসব কি নতুন কোন ঝগড়া, না কি তারা বোঝাপড়ায় আসছে, প্রথমে বুঝতে না পেরে মাসী মহাফাঁপরে পড়ল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হতভম্বের মতো বসে চেঙ-সু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তা-চিয়ের কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল।

তা-চিয়ে বলল, "কি দেখছ? আগে কি আমাকে দেখনি কখনো? না আমাকে পাওনি? একথা কি আমাকে দ্বিতীয়বার বলতে হবে?"

"না!" চেঙ-সু সঙ্গে সঙ্গে বলল, তারপর বাটিটা তুলে নিয়ে বলল, "মাসী, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে কিছু গরম দেখে দিই।"

বাটিটা তুলে নিয়ে মাসী পরিহাসচ্ছলে বলল, "না, না, খাবার ঠাণ্ডা হয়নি। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমরা দুজন এখনো গরম না ঠাণ্ডা!"

তিনদিন পর উত্তরের দেওয়ালে দেখা গেল একটা ছোট দরজা। দরজাটা তা-চিয়ে'র ছোট্ট গণ্ডির সাথে বহির্জগতের এক যোগসূত্র। উত্তরের দেওয়ালের কাছেই 'লাল নিশান' সমবায় সমিতির পশুপালকের চালাঘর। আর একটু উত্তরে দু'সারি চালা, একটা বাঁদিকে গরু-বলদের জন্য, ডান দিকের অন্যটা ঘোড়া ও খচ্চরের জন্য। চালা দুটোর মাঝখানে বিরাট একটা দরজা, সেখান থেকে গেছে একটা গলি, তার ভেতর দিয়ে দূরপ্রসারিত দৃষ্টি চলে যায় একটা ফাঁকা মাঠ

ছাড়িয়ে নদীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল গমের ক্ষেত অব্দি। তুষারের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেছে। ক্ষেত সবুজ তাজা ফসলে পরিপূর্ণ। সমবায়ের পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা তিন ও পাঁচজন করে বসন্তকালীন ফসল তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে। বিশুদ্ধ নির্মল মৃদুমন্দ বাতাস মাঠ গলি দিয়ে বয়ে চলেছে। পশুপালকের কুঁড়ের সামনে উঠানটা সূর্যের প্রচুর সোনালী আলোকে স্নাত। চেঙ-সু তার তুলোর কোট খুলে ফেলে হাওয়া খেতে লাগল। তা-চিয়ে একটা বড় গামলার পাশে দাঁড়িয়ে সেই দেওয়ালের ওপর দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া লাঠিটা দিয়ে গরুছাগলের খাবার গুলে নিতে ব্যস্ত। তাদের ছোট্ট ছেলেটা রোদে খড়ের গাদার ওপর আপনমনে খেলছে।

শক্ত মাটি কাটার কাজ শেষ করে ছেলেকে কোলে নিয়ে চেঙ-সু স্ত্রীর কাছে গেল। গরুর খাদ্যের দিকে তাকিয়ে সে সমালোচনার ভঙ্গিতে বলল, "দেখো, তুষগুলো তাড়াহুড়ো করে গুলো না। ভাল করে মেশাও। পুরোনো প্রবাদটা মনে অছে তো? "সব জায়গায় তুষ থাক আর না থাক হাতা ভালোভাবে ঘুরবে।"

তা-চিয়ে ঠোঁট নেড়ে জানার ভঙ্গি ক'রে চেঙ-সুর দিকে তাকিয়ে বলতে চাইল, "হুঁঃ! তোমার ধারণা তুমিই একমাত্র লোক যে সব কাজ ঠিক মতো করতে পারে!"

খেলতে ব্যস্ত থাকায় বাবা-মায়ের দিকে কোন নজর ছিল না ছেলের। কিন্তু যখন চেঙ-সু একটা খড় দিয়ে একটা বাছুরের নাকে সুড়সুড়ি দেওয়ায় বাছুরটা কান ঝাড়া দিয়ে লাফ দিল, তখন আহ্লাদে আটখানা ছোট্ট শিশু বাছুরটার পেছন দৌড়ানোর জন্য বাবাকে ধরে বসল।

পারজম রায়

বঙ্গরঙ্গে অসামাজিক বুদ্ধিজীবী

এ প্রবন্ধে বাংলা নাট্যচর্চার কয়েকটি প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। আলোচনা অবশ্যই সুসম্পূর্ণ নয়, এবং বহুক্ষেত্রে লেখকের মতামত ও প্রতিপাদ্য সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করা সম্ভব। আমরা প্রবন্ধটি সম্পর্কে মতামত আহ্বান করছি। —সম্পাদকমণ্ডলী

'৪৭-পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কয়েকটি বিচিত্র ধারার সঙ্গমে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সঠিক চরিত্র নিরূপণে বার বার ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট ও জাতীয় সোস্যালিস্টদের নির্বাচনী খোঁয়াড়ে আটকে ফেলেছে। অন্যদিকে 'মার্কসবাদী' অতিসরল ব্যাখ্যাগুলো অতিবাম রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। যার ফলে অসংস্কৃত সামরিকবাদী চিন্তার প্রভাবে, শত্রুর দেওয়ালে ফাটল ধরানো আজও সম্ভব হয়নি। এদেশে সামন্ততন্ত্র পিছিয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু পুঁজিপতিরাও আসন্ন বিপদ বুঝে অনায়াসে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষ ক'রে এক নয়া-সামন্ত*-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এদেশের বুর্জোয়ারা যেমন দুই মহাশক্তির আশীর্বাদ ও প্রশ্রয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলোয় শোষণের ছাড়পত্র পেয়েছে, তেমনি বিদেশীদের জন্য এদেশে খুলে দিয়েছে কাঁচা মালের ভাণ্ডার। কাজেই বেসরকারী অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখি টাটা-বিড়লা-সারাভাইয়ের একচেটিয়া কারবার, এবং বহুজাতিক কোম্পানী-গুলির অবাধ লুণ্ঠন। একচক্ষু জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের এই দিকটাকে দেখতে নারাজ। এদেশে বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাই তাদের কাছে 'জাতীয়' আখ্যা পায়।

সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের এই যৌথ শোষণের পটভূমিতে বাংলা 'প্রগতি' নাট্যচর্চাকে বিচার করতে গেলে লু শুনের কথা মনে পড়ে যায়: "আমার মতে

---

* নয়া বলতে নতুন নয়। যাকে আমরা আধা-সামন্ততন্ত্র বলি, এটা তার চেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী। চরণ সিং বা ইরাণের খোমেইনির মতো লোক এর প্রতিভূ।—লে.

আজকের বামপন্থী লেখকবৃন্দ খুব সহজেই দক্ষিণপন্থী হয়ে পড়তে পারেন। প্রথমতঃ আপনি যদি সামাজিক সংঘর্ষগুলির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে কেবল শেখবার জন্য বা অধ্যয়ন করার জন্য স্রেফ কাঁচের জানলার আড়ালে আটকে থাকেন, তাহলে আপনি খুব দ্রুত 'চরম্ প্রগতিবাদী' বা 'বামপন্থী' হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি বাস্তবের সামনে দাঁড়াবেন, আপনার সব ধারণা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।"

ব্যাপারটাকে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখা যেতে পারে।

কোন্ পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া শিল্পী সাহিত্যিকদের সমাজবোধের মূলে নিয়ে যেতে সক্ষম তা বোধহয় গণনাট্য প্রবক্তারা যথেষ্ট ভালোই জানতেন : "'নবান্ন' পড়ে মনেই হয় না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সংঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনও ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।"—প্রয়াত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের উক্তি। তারপর এলাহাবাদ সম্মেলনে গণনাট্যের প্রথম প্রস্তাব : "… কৃষক মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে পা মিলিয়ে, সরকারের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে গণনাট্য সংঘ শপথ গ্রহণ করছে।" অথচ এই 'শপথ' কয়েক বছরের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল! সাংস্কৃতিক হাতিয়ারে কিসের মরচে ধরে গেল? এর উত্তরের ইঙ্গিতটাও গণনাট্য জোয়ারের কালেই সম্ভবত শ্রীপ্রকাশ রায় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন : "এলাহাবাদ সম্মেলনে গণনাট্য আন্দোলন সংস্কারবাদের যে ভূতটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখেছে, তা যে এখনও তাঁদের সঙ্গ ছাড়েনি, পুনরায় কাঁধে চড়ার সুযোগ সন্ধানে আছে, তারই প্রমাণ ফাল্গুন চৈত্রের 'লোক-নাট্যে' প্রকাশিত সুরপতি নন্দীর আলোচনা, গণনাট্য সংগঠন। …'নবান্ন' নাটকে যে কৃষককে আমরা দেখি, দুর্ভিক্ষপীড়িত সে কৃষক মরে কিন্তু লড়ে না। লড়াইয়ের চিন্তাও করে না। …আর বাঁচবার পথ? সব জমি এক করে চাষ করো তাহলেই সব দুঃখকষ্ট মিটে যাবে। …সুরপতিবাবু যে তিনদফা কর্মসূচী উপস্থিত করেছেন, তার মোদ্দা কথা এই যে, ভবিষ্যতে সুপরিকল্পিতভাবে (?) অধিকাংশ অনুষ্ঠানই শ্রমিকদের মধ্যে করতে হবে। যেখানে গণনাট্য সংঘ অনুষ্ঠান করবে, সেখানে শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে—সেখানকার কোন

'একক প্রতিভাকে' সংঘের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। ...অর্থাৎ, তিনি অনুষ্ঠান করবেন শ্রমিকদের মধ্যে—শ্রমিকদের নিয়ে নয়। শিল্প রচনার ব্যাপারে তিনি গণপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করবেন না—গণপ্রতিষ্ঠানগুলি শুধু তাঁদের লোক ধরে দেবে। ...'নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার' সম্ভাবনা খুঁজবেন আন্দোলন থেকে নয়। নিরক্ষর শ্রমিক কৃষকের মধ্যে নয়। জনসাধারণের জীবন থেকে তিনি নিরলসভাবে শিক্ষা নেবেন (অবশ্য দূর থেকে ষ্টুডিওতে বসে)...''।

নীলদর্পণ হতে নবান্নর মধ্যবর্তী পর্বটা মূলতঃ সহাবস্থানের পর্ব। তবু যাঁরা এঁদের জাতীয়তাবাদী আখ্যায় ভূষিত করে ঐ সময়ের বুদ্ধিজীবীদের মুৎসুদ্দিপনা এবং বিলিতি ধাঁচের নাটককে যুদ্ধাস্ত্র বলে বর্ণনা করেন তাঁদের মধ্যে অধুনা সুরপতি নন্দীদেরও অনেকে আছেন। যথা উৎপল দত্ত। ১৯৫২-য় 'গণনাট্য' পত্রিকায় গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা নিয়ে উৎপল দত্ত প্রবন্ধ লেখেন (তার আগেই 'বিসর্জন' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তিনি অনুশীলন শাখার ব্যানারে)। ''...আমাদের ক্লাসিক নাটকগুলিকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করা যদি আমাদের কর্তব্য বলে মেনে নিতে পারি তবে 'নাটকের অভাব' এই যুক্তি সম্পূর্ণ অচল।'' এই প্রবন্ধের কোথাও নীলদর্পণ, জমিদার দর্পণ, চা-কর দর্পণ ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে তিনি গিরিশ ঘোষ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের বিরাট রচনাসম্ভারকে গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ওকালতি করে লিখেছেন, ''সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে গিরিশ ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা'র মত শক্তিশালী আর কোন নাটক আছে ভাবা যায় না।'' এই একই প্রবন্ধে ''বাস্তবের প্রতি বিরূপ হয়ে **Fourth Dimensional** মঞ্চ প্রয়োগের আত্ম-কেন্দ্রিক চিন্তাকে'' কটাক্ষ করে তিনিও যে নাটককে 'বাক্স মঞ্চ'-শিল্প করার জন্যই কলম ধরেছেন সেটা বোধহয় ''বিসর্জন'' জাতীয় নাট্য সাফল্যে মুগ্ধ হয়েই! এর ফলে পরবর্তী সময়ে 'নবনাট্য প্রবাহ'র গণবিচ্ছিন্ন স্রোত অপরিহার্যরূপে বাস্তবতা-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে বললে কি অত্যুক্তি হবে? এতকাল এই শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিরা 'সামাজিক দর্পণের নামই নাটক', 'মানুষ তার মাল মশলা' ইত্যাদি কথা শুনে এসেছেন। তাই সমাজ বদলের পালায় যদি শীর্ষস্থানীয় প্রবক্তারা পরস্পরবিরোধী উক্তিতে নিজেদের প্রকাশ করেন তবে কেন ''রক্তকরবীর'' নকলে শয়ে শয়ে রূপক সংকেত প্রবণতা, ''এবং ইন্দ্রজিৎ''-এর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে উঠে আসার ঢেউ, ''তিন পয়সার

পালা''র পরে নাচগানের হুল্লোড়, "মারীচ সংবাদ''-এর সঙ্গে সঙ্গে 'মিথ'কে গামছা দিয়ে টেনে এনে একালের খুঁটিতে বাঁধার জোয়ার আসবে না? আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই মননশীলতার ফলে দর্শক যদি এজাতীয় থিয়েটারকে বুদ্ধিমানের আর্ট বলে সস্তা প্রমোদে মাতে তবে শাস্তি পাওয়া উচিত কাদের?

নীলদর্পণের মতই সমাজ-বাস্তবতার নিবিড় ছবি ছিল 'নবান্ন'য়। গান্ধীবাদের স্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দুনিয়া-জোড়া সংগ্রাম, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিজয় ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী স্তালিনের সময়কার রাশিয়ান জনগণসহ সমস্ত বিশ্বের মানবতাবাদীদের সমর্থন এবং চীন বিপ্লবের আসন্ন বিজয় ও এদেশে সন্ত্রাসবাদীদের একটি ক্ষুদ্র অংশের সংগ্রাম তাবৎ বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলিত করেছিল নিশ্চয়। মুখে ছিল কম্যুনিস্ট মতাদর্শ। তাই নবান্নর ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। দুর্ভিক্ষ তার প্রসবে সাহায্য করল। এখনও শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগে যখন দেখা যায় এর পরের কয়েকবছর বাংলার নাট্য আন্দোলন সারাদেশব্যাপী যেভাবে গণজোয়ার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, তা তার আগে ও পরে এতবেশী কখনও হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই ছিল ব্যর্থতার বীজ ও সংস্কারপ্রবণতার চিহ্ন এবং আবেগের দ্বারা মানুষকে বশীভূত করার অবাঞ্ছিত প্রবণতা। যেটা ঐ স্বতঃস্ফূর্ততার জোয়ারে ভেসে যাওয়া শিল্পী সাহিত্যিকরা টের পাননি, এমনকি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয়রাও না।

নবনাট্য স্বরূপ

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ও যুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় নাট্যরীতিতে যে বিবর্তন ঘটেছিল তার প্রাণস্বরূপ চিত্রকলাকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। চিত্র নাট্যকলার এক অপরিহার্য অঙ্গ: কোথাও frame-এ তা নিশ্চল, কোথাও সতত চলমান। পশ্চিমে যখন অস্তিত্ববাদ নিয়ে চিন্তা ঘনীভূত তখন এদেশের নাটকে বাস্তবতার নামে formalismই ঘাড়ে চেপে আছে। আর চিত্রকলায়? সনাতন রক্ষণশীল প্রবাহের ধাক্কাই কাটিয়ে উঠতে পারা যায়নি। অবশ্য যুদ্ধের অনুপস্থিত ভূমিকা এর জন্যে সামান্য দায়ী। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় যখন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র বিপ্লবী রীতি দুনিয়া জোড়া প্রতিবাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে কি মঞ্চে, কি চলচ্চিত্রে, তখন গণনাট্য হতে নবনাট্য বোদ্ধারা সোভিয়েত রাশিয়ার পথ অনুসরণ না করে একটি

আপাত নব্য ও ক্রমশ পেটিবুর্জোয়াসুলভ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়ক নাট্য আন্দোলনের জন্ম দিলেন।

যার পথিকৃৎ বহুরূপী এবং নাটক 'রক্তকরবী'। বহুরূপীর বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা এবং রবীন্দ্র প্রতিভাদ্যুতিতে মুগ্ধপ্রায় কত সমালোচক যে এই নাটককে "গণনাটক", প্রত্যক্ষ আন্দোলন-সহচররূপে ব্যাখ্যা করে আত্মমুগ্ধতাকে জনগণের সঙ্গে তুলনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মধ্যবিত্তের আন্দোলন যদি 'গণ আন্দোলন' আখ্যা পায় তবে অবশ্য বলার কিছুই নেই। কিন্তু বৃহত্তম জনগণের চেতনা প্রসারে এই নাটকের যে কণামাত্র ভূমিকা নেই একথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায়। উদার-সামন্ততান্ত্রিক ধারণা এবং 'রাবণ বিভীষণ'রূপী পুঁজিবাদী সত্তার পরিচয় দ্বান্দ্বিক তো নয়ই বরং পুঁজিবাদকে এর ফলে শ্রদ্ধা করাই বোঝায়। এইজন্যেই বোধকরি রক্তকরবীর রাজা তার হাতে হাত রেখেই সর্দারদের (আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথই এদের বলেছেন রাজার অন্তরঙ্গ পার্ষদ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানায়। পুঁজিবাদী দুনিয়ার রাষ্ট্রকর্ণধারদের চেয়ে "সর্দাররা বড়" এমন অবাস্তব নজীর আছে কি? অথবা এই আন্দোলনের পরের ধাপ সকলের হাতে হাত রেখে "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" সঙ্গীতের মূর্ছনায় কর্ষণজীবী সমাজকে আহ্বান জানানো? রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক: "এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।" তাই বহুরূপীর শত চেষ্টাও একে গণনাটকে রূপান্তরিত করতে পারে না। অধ্যাপকসহ সকল চরিত্রের চলন বলন সত্ত্বেও রাজার সঠিক interpretation-এর অভাবই এর প্রমাণ। আর এখানেই লুকিয়ে আছে মূল গলদ। প্রশ্ন হল যাঁরা একদা গণনাট্যে সৃষ্টিধর্মী নবান্ন, পথিক, ছেঁড়াতার-এর বাস্তব, সরল, আবেগপূর্ণ নাটক মঞ্চস্থ করলেন তাঁরা এই বাস্তবতা বিরোধী কাব্যধর্মী সাংকেতিকতার দিকে ঝুঁকলেন কেন? বহুরূপীর সহজ উত্তর: রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করার জন্য। ঐ আপ্তবাক্যে যাঁরা তৃপ্ত থাকতে চান থাকুন কিন্তু প্রগতি শিল্প সমালোচকদের অবশ্য কর্তব্য নতুন পর্যায়ের আন্দোলন নবনাট্যের স্বরূপকে তুলে ধরা এই আলোকেই।

সংখ্যাগত পরিমাণ দিয়ে যাঁরা গ্রুপ থিয়েটারের জগতে এদেশটাকে বিশ্ব-বিস্ময়ের চোখে দেখে আত্মমুগ্ধ, তাঁরা গুণগত দিকটার প্রতি ফিরে তাকাবার অবকাশ পান না। আজ পর্যন্ত এদেশে কোন একটা নিজস্ব নাট্যরীতির জন্ম হয়নি, বরং লোকনাট্যরীতিকে উপহাস করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ মনের দিক থেকে পশ্চাৎপদ দর্শক যে এই রীতিকে কত ভালবাসেন, তার প্রমাণ যাত্রা।

তাই বৃহৎ দর্শকসাধারণের কাছে বিরাট পরিপ্রেক্ষিতসহ কুৎসিত বিষয়বস্তুর সিনেমা ও যাত্রা যদি আজ অপসংস্কৃতির সিংহদরজা খুলে দিয়েই থাকে তার জন্য দোষী কারা? নবনাট্যধারা নয় কি? বিষয়বস্তু ও রীতির সমস্যাটা নতুন নয়, একই বিষয়বস্তু একই রীতির দাসত্বে থাকতে পারে না অবশ্যই; কিন্তু নতুন নতুন আঙ্গিকের দাবি জানাবে কারা, মুষ্টিমেয় পেটিবুর্জোয়ারা না বৃহৎ দর্শকসাধারণ? নবনাট্য আন্দোলনের উৎপত্তির পেছনে সেদিন গণনাট্যের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কারণ ছিল ঠিকই কিন্তু বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সাধারণীকরণের ইচ্ছাও একমাত্র গণনাট্যেরই ছিল।

অপরদিকে এলিয়টী প্রভাবসহ বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেনের জোরালো যুক্তি, কাব্যিক দুর্বোধ্যতার ঢেউ নবনাট্য-দিশারীদের আকৃষ্ট করেছিল বললে কি ভুল হবে? ছোটগল্প এবং উপন্যাসে এই যুগে প্রবল বাস্তববাদী প্রকাশ ঘটছিল, তাই নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথকেই বেছে নেওয়া নয় কি? ১৯৬১-৬২ সালের শারদ সংখ্যা 'গন্ধর্ব' পত্রিকার সামান্য অংশ তুলে ধরলে দুটি ধারা বুঝতে সুবিধা হবে। "বাংলা নাট্যাভিনয়ের মরা গাঙে ভরা জোয়ার এনেছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। তারপর সে জোয়ার ভাঁটার মুখে পড়ে জল যথারীতি ঘোলা হয়ে ওঠার আগেই পুনরায় বান ডাকলো: তার নাম নবনাট্য আন্দোলন। যে সংগঠন শক্তি, বিশিষ্ট ভাবাদর্শের নৈতিক বন্ধনে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে সর্বভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের সজাগ প্রহরী করে তুলেছিল, সময়, স্থান কর্ম-পদ্ধতির আভ্যন্তরিক গোলযোগে তা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত হলো। ... ভারতের রাজনীতির ভূমিতে শিল্পের ফসল ফলাতে গিয়ে তারুণ্য শক্তির কাছে রাজনীতির উন্মাদনার তাৎপর্য যে অর্থে লঘু প্রতীয়মান হলো সেই অর্থেই তাঁরা সমবেত শিল্পীর শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আর শুষ্ক রাজনীতির চর্চার চাইতে শিল্পসৃষ্টির উন্মাদনা যেখানে অনেক বেশী জাগতিক লাভের কারণ।" সুতরাং শিল্পসৃষ্টির উন্মাদনার জন্য নাটকে যা প্রয়োজন তা হল "কবিতার ইমেজ। অতি প্রত্যক্ষতায় ঘটবে কল্পনার তীব্র সংগ্রাম। বাস্তবের সঙ্গে ফ্যাণ্টাসির মিলন। আপাত উদ্ভটত্বের সঙ্গে অভিন্ন হবে বস্তুগত মাধ্যম। কাহিনী বা প্লট নতুন অভিধায় চিহ্নিত হবে।" বাংলা কাব্যে কিন্তু এসব অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রোমাণ্টিসিজম, ন্যাচরালিজম ও সুররিয়েলিজমের চর্চার মধ্য দিয়ে। একমাত্র সমর সেন ছাড়া ঐ দাবির সমর্থনকারী কবিদের আজকের পরিণতি কোথায়

গেছে সেটা এই আলোচনায় পড়ে না। কিন্তু নবনাট্য প্রবণতায় মুগ্ধ কয়েকজন নাট্যকারের পরিচয় এ প্রসঙ্গে বিচার্য।

এবসার্ড নাটকের সপক্ষে মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "কবিত্বের বিশেষ অবকাশ এ শ্রেণীর রচনায় থাকে। ঘটনাকে কমিয়ে আইডিয়াকে সূক্ষ্ম উপস্থাপন বৈশিষ্টে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।...এই নাটকে কোন নারী অনায়াসে তার স্তনদ্বয় খেলার সামগ্রী বেলুনের মত স্বর্গে ভাসিয়ে দেয়। কোন মৃতদেহ স্ফীত হয়ে এঘর থেকে ওঘর পর্যন্ত এগিয়ে চলে, কারুর হয়ত একাধিক নাক, মানুষ অনায়াসে গণ্ডার ইত্যাদি।...অর্থাৎ আমার মনে হয় আমাদের দেশে উদ্ভটকে বিশ্বাস্য করে তোলার চিত্তভূমি বহুকাল ধরে প্রস্তুত।" ব্লু-ফিল্ম, পর্ণোগ্রাফী, বাইজীর নাচ, ব্যোমচারী কাব্য ইত্যাদি পড়া বা দেখা ও শোনা, সমচিন্তার এক বা কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু নাট্যক্রিয়া সম্পাদিত হয় একদল বিভিন্ন মতাদর্শী দর্শকের উপস্থিতিতে। সুতরাং, তার নান্দনিক মূল্য যতটা নৈতিক মূল্যও কম নয় অবশ্যই। পুঁজিবাদী দুনিয়ার ব্যক্তিমননের চিন্তার নান্দনিক অবক্ষয় যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্য হারিয়েছে তারই আত্মসমীক্ষা চলছে এখন সে দেশগুলোয়।

"থিয়েটার জিনিষটা ছিল জনগণের জন্য, সর্বদাই জনগণের জন্যে। কবিরা পল্লবগ্রাহী সংস্কৃতিবানদের জন্যই থিয়েটার চাইলেন। কঠিন মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনাকে কঠিন কঠিন শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাঁরা দর্শকের সামনে রাখতে চাইলেন।...অথচ থিয়েটারে যেটা দেখানো উচিত তা হচ্ছে দৃশ্য। তা হচ্ছে জীবন, তা হচ্ছে সৌন্দর্য—কঠিন বাক্যনিবদ্ধ বাণী নয়।" গর্ডন ক্রেগের এই উক্তির সঙ্গে এঁর "ক্যাপ্টেন হুররা" প্রসঙ্গ এলে দেখা যাবে "বহু মানুষের শত্রুরূপে কিছু মানুষের" সংবাদ জানাতে এমন এক কাল্পনিক কাঠামোর সংকেতধর্মী অভিযান কবিকুশলতায় তুলে ধরেন তিনি যার মর্মানুধাবনে বহু মানুষের চিন্তার ও অনুভূতির সংযোগ নেই। আধুনিক কাব্যমনস্কতায় এঁরা কি মনে করেন দর্শকও ঐ স্তরেই আছে?

"রাজরক্ত"র রূপকের ঝামায় রাষ্ট্রনায়ককে ও প্রশাসনের কৌশল ও নৃশংস-তাকে ঘষে মেজে তুলে ধ'রে এবং অতি ছেলেমানুষী হঠকারিতায় সমালোচনা করাটাকে গ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে এমন এক কাল্পনিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যাদের হাতে নাটককে শেষ করার ভার দেওয়া হয় তা একটি অসম্ভব ও

অবাস্তব প্রক্রিয়ারই রূপান্তর। আশা আকাঙ্ক্ষা-ধর্ষিত হতাশ মধ্যবিত্ত অথচ কল্পনায় উচ্চাভিলাষী নরনারীর জয়লাভ নাটকে রাজার ক্ষেত্রে সম্ভব কিন্তু শ্রমিক কৃষকের দৃঢ়ভিত্তি ছাড়া এটা যে "নারদনিক" সংকীর্ণতার পরিচয় তা এঁর ধারণায় আসে না।

সমকালীন নবনাট্য প্রবাহে নতুন ঢেউ এনেছে "মহাকালীর বাচ্চা।" কী নাটকে, কী প্রয়োগে এর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বহুজনে মুগ্ধ। কিন্তু সম্ভাবনার ইংগিত-বাহী এই নাটক শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে পৌঁছায়, তা শত্রুমিত্র পার্থক্যকরণের সঠিক পথটাই হারায়, এবং সেইসঙ্গে বাস্তবের কেন্দ্রভূমিও। প্রথমতঃ, মহাকালী নিজে পাগলী, আমাদের সমাজটা কি তাই ধরা হবে? আর পাগলী জন্ম দেবে লক্ষ লক্ষ দাঁতওয়ালা বাচ্ছার—যারা শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরোয়? এরা সর্বহারার মতবাদের সুশৃংখল পথে এগুলে তবেই যে সার্থকতা অর্জন করবে, নাট্যকার তা দেখান নি, বরং এদের উগ্রপন্থী প্রতীক দিয়ে দর্শকদের মনে বীভৎস চিন্তার বিষও ঢুকিয়েছেন বলে মনে হয়েছে।

রীতিসর্বস্ব এই নাটক দেখে মনে হয়, "সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজে, যেখানে কবি জনগণের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে কাব্যময় ভাষা এবং জনগণের মুখের ভাষার মধ্যেকার অন্তর্লীন ঐক্যটা বহুলাংশে মুছে গেছে; আর এ ঐক্য যেখানে এখনো টিঁকে আছে, সেখানে এটাকে রক্ষা করেছে জনগণই—কবিরা নয়।" এই কারণেই কি বাস্তব ঘটনা শেষ পর্যন্ত কাল্পনিক ও রূপক সংকেত হয়ে ওঠে?

"মাছি" নাটকেও বানভাসি মানুষের করুণ আর্তি, একথাল ভাতের জন্য পাখীর দেহদান, চরম মুহূর্তেও এদের ব্যর্থতা, আর একটা মাছির সংক্রমণে "বৈকুণ্ঠে"র মৃত্যুমুখে পতন—এই সবকিছু এই অগঠিত সমাজকে ব্যঙ্গ করলেও, যে সিদ্ধান্ত বহন করে এ নাটক তা ঐ মাছির মতোই সর্বত্র বিচরণশীল, আপেক্ষিক ও অরাজনৈতিক (মাছি সংকেতটা কোন মানুষের?)। লুনাচারস্কির মতে—"আমাদের এই নিউরোটিক যুগে" এইসব বাস্তবতাবিরোধী রীতিগুলো হচ্ছে "খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে এ কথা বোঝায় না যে এটাই হচ্ছে প্রগতি।"

এবং বাদল সরকার

বাদল সরকারের "এবং ইন্দ্রজিৎ" একদা নবনাট্য-র অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই নাটকের ধুলো ধন্যতায় কত যে স্টাইলসর্বস্ব অসার্থক

নাটক সৃষ্টি হয়েছে তা সংখ্যাতীত। নাটকটা হতাশাক্লিষ্ট যুবমনকে শূন্যগর্ভে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর। জীবনযাত্রার জটিলতা নিয়ে কলকাতা ও মফঃস্বলের মানুষদের ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু দেশটার সমগ্র প্রেক্ষাপট ঘুরে এলে এর অসারতাই প্রমাণ হবে। শহরমুখী মানুষের সমস্যার সত্যিকারের রহস্য ও উদ্দেশ্য এবং তার প্রতিকারের মূলে না গিয়ে যাঁরা শহর-জীবনের আন্তর বাস্তবতাকে তুলে ধরেন কাব্য ও নাটকে, সেটা যে মূলত উপরিগত, এটা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা বোঝেন। নাটকটি ভাববাদী চিন্তায় পৌনঃপুনিক বিবর্তনকে যুবকদের মধ্যে সংক্রামিত করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। ইন্দ্রজিৎ অসাধারণ হতে পারত, কিন্তু হয়নি; মধ্যবিত্ত চিন্তাবিলাস এ সমাজে তো শেষ হতে বাধ্য। কিন্তু এরপর সে মুক্তি পাবে কোথায়? সংলাপের প্রতি ছত্রে এদেশের শিক্ষা, রাষ্ট্রকাঠামোর কথা আছে যা এক একটা আলাদা নাটক তৈরী করতে পারে। নেই শুধু রাজনীতির সেই আশ্রয় যেখানে আজকের পেটিবুর্জোয়াদের পরম মুক্তি। "আমরা চাই রাজনীতি ও শিল্পের একত্ব, বিষয়বস্তু ও রূপের একত্ব।" বিষয়বস্তু ও রূপের ঐক্যে সৃষ্ট শিল্প যতই সুন্দর হোক তার একধাপ আগে থাকবে রাজনীতি। তা সে বিপ্লবী রাজনীতি হোক কিম্বা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি। রাজনৈতিক উন্মাদনা-সন্ত্রস্ত এই জাতের নাট্যকারদের কল্পনা যে কী বীভৎস শিল্প সৃষ্টি করে তার প্রমাণ "বাকী ইতিহাস"। একটা গল্প লেখার উৎস ক্রমশ "লোলিটা"র পর্যায় ছাড়িয়ে, দ্বাদশী পার্বতীকে অতিক্রম করে, গৌরীর মত আট বছরের একটি শিশুকেও আক্রমণ করে। ফ্রয়েডিয় চিন্তার এই ব্যাভিচারীবোধ যখন নবনাট্য-র আপাতদরদী লেখক ও প্রযোজকদের মধ্যে দেখা দেয় তখন 'বারবধূ', 'ব্যভিচার' কোন্ দৃষ্টিতে অপসংস্কৃতি এবং এগুলো শিল্পসম্মত হয়? এই যৌন বিকৃতি আবার এমন একজন চরিত্রের মধ্যে যিনি হেডমাস্টার। নাট্যকার হেডমাস্টারকে এই বিকৃতির হাত থেকে রেহাই দিলেও (আখ্যান বিষয়বস্তু দর্শককে ইতিমধ্যে দেখান হয়ে গেছে) free sex-এর স্বাধীনতা দিয়ে দেন ছাত্রদের। কিন্তু এদেশের রক্ষণশীলতা, কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে যে কুৎসিৎ চিত্র তুলে ধরা হয়, আর তাকে যে শিল্প প্রশ্রয় দেয় তা কি কোনদিন মহৎ আখ্যায়িত হবে? অথচ মধ্যপ্রদেশের চম্বলগড় না গিয়ে এই শহরের জনজঙ্গলেই কত পার্বতীর দেখা পাওয়া যেত যারা আদিম হিংস্রতার শিকার। কল্যাণমতি সাহস থাকলে বা উপযুক্ত দৃষ্টি থাকলে তাদের মুখোশ খুলে দেবার কথাই এঁদের

শিল্পের কাজ হত। তা হয়নি বলেই মনোবিকলনের পথে 'যদি আর একবার' নামক আপাত রহস্য হাস্যময় নাটক লিখতে হয়েছে। আর আশ্চর্য, এর প্রযোজনাও করেছে সেই "রক্তকরবী" প্রযোজক সংস্থা 'বহুরূপী'। মনোবিকলনের কুৎসিৎ তত্ত্ব যে কোন্ শ্রেণীর মহত্ত্বকে উদ্ঘাটিত করে তা কি আর জানবার প্রয়োজন হয়? ফলে গণ-বিচ্ছিন্ন এবং এক ক্ষুদ্র আত্মপরতামুগ্ধ যৌন স্বাধীনতালুব্ধ গোষ্ঠীর বিনোদনেই এগুলি কাজে লাগে। এবং এই জাতের দর্শকও তৃপ্ত হয়।*

থিয়েটার ওয়ার্কশপেরই একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি একদা বলেছিলেন "চাক-ভাঙা মধু" নাটকটা মনোজ মিত্রের হাত থেকে হঠাৎ বেরিয়েছে। কথাটা ঠিক। তাঁর "বাজার" মাৎ করা অন্য নাটক নিয়ে বিচার করলে তাই মনে হবে।

রাশিয়ান ফেরিওয়ালাদের কথা বাদ দিলে বলতেই হবে শ্রেণীসমাজে সমস্ত শিল্পকলাই শ্রেণীভিত্তিক। এই দৃষ্টিতেই মনোজ মিত্রের নাটক বিচার করতে হবে। নকশালবাড়ির ঘটনায় রাজনৈতিকক্ষেত্রে যেমন বিরাট পরিবর্তনের চিত্র প্রকাশ পায় তেমন সমসময়ে বাংলা নাটকেও আঙ্গিকের মাতলামো ছেড়ে গভীর বিষয়বস্তুর অনুশীলন দৃষ্ট হতে থাকে। জনসংযোগহীন, শহরবাসী, অবক্ষয়ী সংস্কৃতির দৈন্যও দিনদিন প্রকট হয়ে ওঠে। নাটক যে পশ্চিমী চিন্তাধারার by product নয়, eliteদের খেলনা নয়, নকশালবাড়ির সংগ্রামী বীক্ষায় দীক্ষিত সাংস্কৃতিক কর্মীরা তা উপলব্ধি করতে থাকেন। নির্বাচনে লুব্ধ, আত্মপ্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প রাজনৈতিক দলের অবস্থা খোলা ডাস্টবিনের মত খুলে গেলেও তাদের লেজুড় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টবাহিনী সরাসরি কিন্তু ময়দানে তৎক্ষণাৎ পা দেয়নি। কারণ, যে গণনাট্য, নবনাট্য শোষণমুক্তির কথাই বলেছে এতকাল তারা হঠাৎ করে কি এতটা নির্লজ্জ হয়ে যাবে? তাই চৌর্যবৃত্তির পথ ধরা শ্রেয় মনে করে এরা নতুন নতুন পথ খোঁজায় ব্যস্ত হয়। বিপ্লবটা যদি হয়েই যায় তাহলে তো একটা সার্টিফিকেট দরকার, যাতে শ্রমিকরা বলে "এটা খাও, কারণ তোমরা আমাদের কবি।" 'চাকভাঙা মধু' (যদিও এতে ব্যক্তি হিংসাই আছে, সচেতন সমষ্টিগত ক্রোধ নেই।) হল তেমনিই এক অভিজ্ঞানপত্র।

---

* বাদল সরকারের সাম্প্রতিক প্রযোজনাগুলি অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে তাঁর আগেকার সৃষ্টিগুলির চেয়ে ভিন্ন জাতের। এই পরিবর্তন কি নিছক আঙ্গিকের তাড়নায়, নাকি সমাজ-বাস্তবতাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে?—স. প্র.

এরপর, যখন সম্মিলিত রাজনৈতিক আক্রমণে (সি পি এম ও সমাজতন্ত্রীরাও বাদ ছিল না) প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় ঠাণ্ডা মাথায় যুবক খুন হয়েছে, জেলে জেলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, হাজারে হাজারে বিপ্লবী যুবকেরা কারাবরণ করেছে, তখন তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে ধ্রুপদী নাটক 'অশ্বত্থামা'। জরুরী অবস্থার শ্মশানপর্বে রচিত ও প্রযোজিত হয়েছে স্থূল হাস্যরসাত্মক ও শ্রেণীগত বাছবিচারহীন নাটক "নরক গুলজার"। সত্যিই যে এটা নরক গুলজারই, INT-র সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা তার প্রমাণ। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা অনুযায়ী কমেডি "নিহিত থাকে এমন কতকগুলি ত্রুটি বা কুৎসিতত্বের মধ্যে যা বেদনাদায়ক বা ধ্বংসকারী নয়।" অর্থাৎ ট্র্যাজেডি সংবিদ যেখানে ভয় ও করুণা জাগায়, সেখানে হাস্যরস উপশম আনে। এই উপশম শত্রু বা মিত্র ভেদে সমান। যেখানে গুরুগম্ভীরভাবের নাটকে বর্তমানের সামাজিকতায় শত্রুমিত্রের স্পষ্ট পার্থক্য টানতে নাট্যকার বাধ্য, সেখানে স্থূল হাস্যরসে সহজেই শত্রুর কৌশল ছোট করে দেখাবার সুযোগ সর্বদাই রয়েছে। তাই বলে এটা ভাবা ভুল যে হাসি বন্ধ করে রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকতে হবে। একজন আমেরিকান রিপোর্টার রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে দেশের সময়টা কাটছিল তখন খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ এবং শত্রুর নানান প্ররোচনা ও ঘেরাওয়ের মধ্যে। কিন্তু ঐ সাংবাদিক অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখেন, তাঁর কথার উত্তরে লেনিন হাসছেন; সে আবার বিভিন্ন ভাবের হাসি। আশ্চর্য হবারই কথা। কিন্তু তিনি পরে বুঝতে পারেন এ হাসি সাধারণ হাসি নয়, "…this was Marxist laughter." হাসিরও আবার মার্কসীয় রীতি আছে নাকি? নিশ্চয় আছে। "সে হাসি শুনতে পাবে তখন, যখন শোষিত ব্যক্তি বহু আগেই তার শোষকদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত দিক থেকে পরাজিত করেছে, যখন সে শোষকদের নির্বোধ বলে ভাবে, যখন সে ধিক্কার জানায় তাদের নীতিকে…।" লুনাচারস্কির এই মন্তব্যের নিরিখে মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' সম্পর্কে ভাবা যেতে পারে।

একটি নাটকে (যে কোন রসের নাটক, যদি বাস্তবতাধর্মী হয়) বাস্তবতা ও ফ্যান্টাসীর সচেতন না অচেতন প্রয়োগ ঘটেছে এটা অবশ্যই মার্কসবাদী সমালোচকের বিচার্য। শোষিত মানুষ অদৃষ্টবাদী অচেতন প্রক্রিয়ার দ্বারা কি নীতিগতভাবে ভগ্ন, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় এখনও আসীন শোষককে পর্যুদস্ত করতে পারে? এইদিক থেকে বিচার করলে "সাজানো বাগানে"র প্রস্তাবনাতেই "ছকড়ি"

ভূত হয়ে এসে "নকড়ি"কে উপদেশ দিত তার নব ও যুব ছেলে দিয়ে বাঙ্গাকে উৎখাত করার জন্য। কিন্তু তা হয়নি, অচেতন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সচেতন ক্রিয়া নানান কৌশল করেও ধ্বস্ত হয়ে একটি অবাস্তব ও মিথ্যা বিজয়কে সূচিত করেছে।

উৎপল সাম্প্রতিক

বাংলা নাট্যজগতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বিতর্কিত প্রতিভা উৎপল দত্ত। ব্যক্তিজীবনের স্ববিরোধিতায় এবং তার প্রতিফলনে নাট্যকর্মে, এমন সুবিধাবাদী ভূমিকা সত্ত্বেও তাঁকে অস্বীকার করা যায় নি। 'অনুষ্টুপ' পত্রিকাতে দীপেন্দু চক্রবর্তী উৎপল দত্তের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু মার্কসবাদী লেখকের সমালোচনা একমাত্র সফল মার্কসবাদীদের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। এদেশের কোটি কোটি সর্বহারার সপক্ষে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন মার্কসবাদী সাহিত্যিকের যে ভূমিকা অবশ্য থাকা উচিত তা কি ঐ মার্কসবাদী তালুকদার উৎপল দত্তের আছে? রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও অবস্থান বদলানোর সুবিধাবাদকে মার্কসবাদ কখনও ক্ষমা করে না। কারণ, কম্যুনিস্টরা নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে, কপটাচরণ করে না। ১৯৫৫-৫৬র একটি উৎপল-সংবাদ ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু আরেকটি প্রসঙ্গ আরো ভালভাবে দীপেন্দুবাবুই আনতে পারতেন। ১৯৫৮য় বিশ্বরূপায় LTG.-র নাট্য উৎসবে সম্পাদিকা শোভা সেনের রিপোর্ট: "নাটুকে দল আমরা। স্টেজের বাইরে আমাদের কিছু বলার থাকে কিনা জানি না। যা বলার, বলতে হবে স্টেজে দাঁড়িয়ে নাটকের মাধ্যমে। এই হচ্ছে প্রচলিত নিয়ম!" প্রচলিত নিয়মে যাঁরা চলতে চান তাঁরা কি করে বুঝবেন শিল্পী সাহিত্যিকরা সমাজবিচ্ছিন্ন আকাশকারী নন? সমাজের ভালমন্দ, গুণা-গুণের সংগ্রাম এবং তার যথার্থ সৎ উপলব্ধিই তো নবজন্ম দেয় শিল্পী সাহিত্যিকের। স্বভাবত এই বোধ না থাকলে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হ'তে আঙ্গিকের গুরুত্বে যাবার লক্ষণ প্রকাশ পেতেই থাকে। তাঁর লেখাতেই তার প্রকাশ: "...আধুনিক নাটক সার্থক নয়, কারণ আধুনিক জীবন তাতে সম্যকরূপে প্রতিফলিত নয়।...তার কারণ মনে হয় আমরা এক জায়গায় পিছিয়ে আছি। আধুনিক জীবনকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক আঙ্গিকের—এটা বোধহয় আমরা এখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি।" এই খেদ তাঁর পূরণ হল 'অঙ্গারে'। অঙ্গারের

আলোর ভেল্‌কি পরবর্তীকালে তাপস সেনকে এতই জনপ্রিয় করে যে তাঁকে ব্যবসায়ী মঞ্চের ক্যাবারে নাচিয়ে অভিনেত্রীর নগ্ন দেহকেও আলোকিত করার অর্থকরী সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল। যদিও, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বাংলা মঞ্চের সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে 'অঙ্গার' থেকে 'কল্লোল,' 'ফেরারী ফৌজ' হয়ে 'তীর' 'মানুষের অধিকারে'-পর্ব ছিল বহুলাংশে ইতিবাচক। কিন্তু অনপনেয় সুবিধাবাদ অনিবার্যভাবে তাঁকে ঠেলে দিল সংশোধনবাদের গহ্বরে। 'তীর', 'মানুষের অধিকারে পর্ব তিনি তাঁর আত্মার দোসর সংশোধনবাদীদের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই বিচ্ছিন্নতা দ্রুত কাটাবার প্রয়াসে LTG ভেঙে গড়লেন PLT। 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'র প্রাক্তন সদস্যের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "কমিউনিস্ট বলে নিজেকে দাবি করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু আত্মসমালোচনা করতে কী ভীষণ তাঁর অনীহা।...আজ উৎপল দত্ত আবার ভোটের মঞ্চে গেছেন।...এখন তিনি সিপিএম্ পার্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সিপিএম্‌ও তাঁকে টেনে নিয়েছেন সস্নেহে।" "মার্কসবাদী" উৎপল দত্তের গণতন্ত্র-চেতনা যে কী ভয়ংকর রকমের বিপ্লবী তার একটি নজিরই আপাততঃ যথেষ্ট হবে। শ্রীদত্ত সম্পাদিত 'পাদপ্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে: "...গণতন্ত্রের মূল কথাই তো প্রতিটি পরিণতবয়স্ক মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ। তবু অধিকার পাওয়া বড়ো কথা নয়, এ দলকে দেবো না ও দলকে দেবো, সেটাও তত বড়ো প্রশ্ন নয়, যত বড়ো হচ্ছে নির্ভীকভাবে উৎসাহ সহকারে ভোট দেওয়া। এদেশের মানুষ নাট্যপ্রিয়। নাটকের মাধ্যমে তাঁদের এ পবিত্র অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা সম্ভব।...যাকে খুশি ভোট দিন, কিন্তু ভোট দিতেই হবে। নইলে আমাদের মুমূর্ষু গণতন্ত্র অতি শীঘ্রই শ্মশান যাত্রা করবে।" এর পরেও যে উৎপল দত্ত জিমি কার্টারের কাছ থেকে কোনো অভিনন্দনবার্তা পাননি, সেটা নেহাৎ কার্টার বাংলা জানেন না বলে।

নাটকের দুই লাইন

নাটকে নকশালবাড়ির আবির্ভাব সম্ভবত "তীর" নাটকে। অনেকের মতই উৎপল দত্ত হয়তো ভেবেছিলেন বিপ্লবটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, বোধহয় সে কড়া নাড়ছে; তাই ঝোপ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা হ'ল না। তাই সাহিত্য ও শিল্পের পাল্লায় সংখ্যাগত দিক থেকে যে দলটা ভারী

তাদের দিকেই পুনরায় তিনি ফিরে গেলেন। তবু, অনস্বীকার্য যে "তীর" এবং "মানুষের অধিকারে" ইতিবাচক লাইনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। কিন্তু একদিকে অতিবাম সামরিক লাইনের হঠকারিতা এবং অন্যান্য 'বামপন্থী' দলগুলোর বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে সরকারী দমননীতি এমনভাবে নেমে এল যাতে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক গণলাইনের সুস্থ আবহাওয়া তৈরী হ'ল না। ফলে শাসক শ্রেণীর দালালদেরই যথেষ্ট সুবিধা হল। উপন্যাসে সমরেশ, বুদ্ধদেব জাতীয় লেখক সহ মতিবিধি, বারবধূ যেমন একদিকে সংস্কৃতির চরিত্র হনন করল, তেমনি অন্যভাবে মূলত একই উদ্দেশ্যে ঘরে বাইরে, গণ্ডার, আলো দেখাও-এর মত নাটক নিয়ে অন্ধজনকে আলো দেখাতে চতুর নাট্য দলগুলো শাসক শ্রেণীকেই সাহায্য করল। "রাজরক্ত" জাতীয় কিছু নাটক আপাত আভাষে মধ্যবিত্তদের বিপ্লবী বিলাসে কাজে লাগলেও প্রকৃত অর্থে সংশোধনবাদীদেরই কাজে লাগল। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আজও নাটকের ক্ষেত্রে আশ্চর্য নীরবতা প্রমাণ করে "প্রগতিশীল" নাটক কাদের সেবা করেছে। বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বিচ্যুতির অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের এতটুকু মুরোদ হয়নি সেদিন নকশালবাড়ির ঘটনাকে জনযুদ্ধের অঙ্গ মনে করে তার ভুল ত্রুটি শুধরে এই যুদ্ধের পথে এদেশের মুক্তির সপক্ষে কাজ করার। পেটিবুর্জোয়া আত্মমগ্নতা, বিপ্লবভীরুতা আর বাইরে থেকে সমালোচনার জন্য সংস্কৃতির এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বহুকাল। অপরদিকে নির্বাচনী পার্টির সাংস্কৃতিক শাখাগুলো এদেশের পচা গলা গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে "হঠকারী"দের প্রতিক্রিয়াশিবিরের লোক বলে চিহ্নিত করেছে এবং এদের নাটকেও শ্রমিক কৃষক মৈত্রীকে পবিত্রভাবে দেখিয়েছে। অন্যদিকে কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরাও সামরিক নীতি দিয়ে বিজয় অর্জনের 'টেকনিক্যাল' ভ্রান্ত নীতি গ্রহণের ফলে শত্রুর রণকৌশলের কাছে বিপর্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, বিপ্লবী শক্তির আশু সম্ভাবনা নিষ্প্রদীপ নাট্যক্ষেত্রে অন্তত একটা ক্ষীণ আলো জ্বালিয়েছে। কিছু শিল্পী ও স্রষ্টা এসে দাঁড়িয়েছেন এই ক্ষেত্রে। যেমন মনোরঞ্জন বিশ্বাস, শুকদেব চট্টোপাধ্যায়, অমল রায় সহ আরও কিছু নাট্যকার দমনপীড়নের মধ্যেও সর্বহারার ঐতিহাসিক দায়িত্বকে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু এই প্রবাহের মধ্যে সঠিক শিল্পনীতি সম্পৃক্ত না হওয়ায় অতিবাম সরল স্টাইলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে অতীতের গণনাট্য ফর্মালিজম-এর মতই। "যদিও মানুষের সমাজজীবনই সাহিত্য ও শিল্পের একমাত্র উৎস এবং

বিষয় বৈচিত্রে অনেক বেশী জীবন্ত ও অনেক বেশী সমৃদ্ধ···তবু সাহিত্য ও শিল্পে যে জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তা উচ্চতর পর্যায়ে অধিকতর আবেগসম্পন্ন, ঘনীভূত, বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ, আদর্শের নিকটতর বলে তা প্রাত্যহিক জীবনের তুলনায় অনেক বেশী সর্বজনীন হয়ে ওঠে বা হয়ে ওঠা উচিত।" বৈশিষ্ট্য-হীনতার ফলে নাটকগুলোর চরিত্র এবং গতিও যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। স্রষ্টারা মানবাত্মার কারুকর্মী হয়ে উঠতে পারছেননা। গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখা মানেই রাজনীতির কচকচি, এটা এখনও দর্শকদের বলতে শুনি। সংশোধনবাদী রাজনীতি যে আর্টের ওপরেই বেশী ঝোঁক দেবে এটা বলাই বাহুল্য। "একমাত্র বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীরাই কাকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে, না তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে এই সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারেন।" কাজেই এ দায়িত্ব অবধারিতভাবেই বর্তাচ্ছে প্রকৃত বিপ্লবচেতন নাট্যকার, নাট্যদলের ওপর।

সমালোচনার পদ্ধতি

বুর্জোয়া সমালোচকরা সর্বহারার শিল্প সাহিত্য মতাদর্শকে হেয় করবেই। তাছাড়া বুর্জোয়া শিল্পের বৈভব এবং আকর্ষণী শক্তি আজও নিশ্চিহ্ন হয় নি। কিন্তু একই মুখে বাজারী পত্রিকার সমালোচনা করে গ্রুপ থিয়েটারগুলো যখন তাদেরই সারসংক্ষেপ বিজ্ঞাপনে তুলে ধরে তখন মনে হয় 'সত্য সেলুকস', ইত্যাদি! এইসব পত্রিকার সমালোচকরা কতজনকে যে মোহ, লোভ আর স্বার্থের বৈতরণী পার করে অর্থের ও প্রতিপত্তির বৈকুণ্ঠে স্থান করে দিয়েছে তার ফিরিস্তি দেওয়াটাও নীচতার পরিচয়।

'থিয়েটার বুলেটিন' পত্রিকায় দীপেন্দু চক্রবর্তী "মঞ্চে বা দেখি না"* প্রসঙ্গে যে লিস্ট তুলে ধরেছেন সেটাও কি পেটিবুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে নয়? শ্রমিকদের মধ্যেও পেটিবুর্জোয়া প্রভাব আছে, এমনকি তারা সংগঠিত নয়, এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবে তেনার দিক থেকে যথেষ্ট অনুন্নতও বটে। শিল্পে এইসব বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরাও নিশ্চয়ই আবশ্যক। অপরদিকে মিত্রপক্ষ মধ্যবিত্তদের মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও চিহ্নিত করতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু শিল্পের মুক্তি ঘটবে কোথায়?

*অবশ্য বুলেটিন সম্পাদক তাঁর ব্যক্তিগত ধারণার উত্তর আশা করেছিলেন, আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে এসেছেন কিনা জানা নেই।—লে

সেটাই দীপেন্দুবাবু বলেন নি। দীপেন্দুবাবুর ইচ্ছাপূরণে "অমিতাক্ষর" নিশ্চয় সার্থক, কিন্তু অমিতাক্ষর যেখানে শেষ হয়, সেখানেই সংশোধনবাদীরা সুযোগ পায় স্থিতিশীলতার প্রহেলিকায় এই শ্রেণীকে ঠাণ্ডা রেখে মর্যাদা দিতে। এই কারণেই বুদ্ধিজীবীদের বিশেষিত করতে আবার 'অবিপ্লবী' 'বিপ্লবী' শব্দগুলো আসতে বাধ্য।

তাই বলে দানসাগরের শেষে আরোপিত দৃশ্যটা অবশ্যই শিল্প সম্মত নয়। প্রতিদিনের বাস্তবে যা দেখি না মঞ্চে তা ঘটা উচিত নয়, এমন সংকীর্ণতা দীপেন্দুবাবুর কাছে আশা করা যায় নি। কারণ নকশালবাড়ির পূর্বমুহূর্তে নকশালবাড়ি আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য ছিল। কিন্তু কোন কার্যই কারণ ব্যতীত হয় না এটা নিশ্চয় দীপেন্দুবাবু মানবেন। তাই সঠিক রাজনীতি যেমন কারণের মূলে ঢুকে সামাজিক দ্বান্দ্বিক বিকাশকে তুলে ধরে, তেমনি সমাজের গভীরে ঢুকে কোন্ সামাজিক অনুভূতি, কোন্ মূল্যবোধ বিকাশ লাভের অপেক্ষায় পল গুনছে, সফল শিল্পীরা ও স্রষ্টারা তাকে ধাত্রীর মতই সমাজের গর্ভ থেকে বাইরে আনবেন এই আশাটাই আজ জোরদার হওয়া উচিত নয় কি? "প্রতিশ্রুতিবান লেখক ও শিল্পীরা অবশ্যই জনগণের মধ্যে যাবেন; দীর্ঘকাল ধরে দ্বিধাহীন চিত্তে ও সর্বান্তঃকরণে শ্রমিক কৃষক ও সৈনিক সাধারণের মধ্যে যেতে হবে, যেতে হবে তাদের সংগ্রামের উত্তপ্ত মুহূর্তগুলিতে। যেতে হবে একমাত্র উৎসে। সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ উৎসে…"। মলিনা ধকের মত কত বিপ্লবী মহিলা নির্যাতনের মুখে পা রেখে বিজয়িনী হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, কত সর্বহারা জীবন দিয়েছেন, কত বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে কত ঘর ভেঙেছে, কত মহিলা চাল বেচে তিন চারটি বাচ্চাকে নিয়ে সংসার চালাবার দায়িত্ব নিয়ে স্বামীকে এই পথে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছেন, কত বুদ্ধিজীবী চাকুরীজীবী সহজ প্রতিষ্ঠার জীবন ছেড়ে এই পথে এসেছেন, কৃষকের কাছে শিশুর মত শিক্ষা নিয়েছেন, আদিবাসীদের সঙ্গে মেঠো ইঁদুর খেয়ে না খেয়ে এই পথকে দৃঢ় করতে চেয়েছেন, এগুলো কি প্রতিদিনের বাস্তব? দীপেন্দুবাবু বাস্তব বলতে মূলত চোখে দেখা বাস্তবকে বুঝিয়েছেন বলেই ঝোঁকটা সংকীর্ণ হয়েছে।

চারিদিকে অন্ধকার, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসমর্পণ আর অশিক্ষার মধ্যে চেতনার সূর্যোদয় ঘটাতে পারতো ব্যাপক জনগণেরই সংস্কৃতি। যার অভ্যুদয় ঘটেছে, শৈশব পেরোয়নি তাকে লালন করে ঠিক পথে চালনা করতে আজ দরকার

একজন লুনাচারস্কির মত সমালোচকের। বুর্জোয়ারা তাদের আসন্ন সমাধিক্ষেত্রে তাদের সমালোচক প্রতিনিধিদের মারফৎ শিল্পের জন্য শিল্পের কথা বলবেই। পেটিবুর্জোয়ারা তাদের প্রতিনিধি মারফৎ শিল্পের মান উন্নয়নের কথায় নানান অবাস্তব অসামাজিক অবিপ্লবী মূল্যবোধের প্রচার করবে আর সংকট সময়ে 'গণতন্ত্র'কে রক্ষা করার শ্লোগান তুলবে। বুর্জোয়ারা যেমন তাদের আইন কানুনের মাধ্যমে নিজেদের নায়কত্বের গণতন্ত্র চায়, তেমনি পেটিবুর্জোয়ারাও ঐ গণতন্ত্রের ছেঁড়া চটিগুলো পরে নিজেদের নায়কত্বে রাখার জন্য চেষ্টা করে। আর সর্বহারা চায় তাদের একনায়কত্বের গণতন্ত্র। আজ অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এ দেশের বুদ্ধিজীবীরাও কোন্ গণতন্ত্রকে আশ্রয় করবেন তার সিদ্ধান্ত এখনই নেওয়া উচিত। নইলে ভবিষ্যতে কোন শ্রমিক অথবা কৃষক মঞ্চে উঠে যদি আজকের বুদ্ধির খেলোয়াড়দের ঘাড় ধরে বার করে দিয়ে ঘোষণা করে: 'এরা আমাদের মধ্যে গিয়ে কোন শিক্ষা নেয়নি। এরা ঘরে বসে আমাদের উপদেশ দিয়েছে, এরা আমাদের সংগ্রামে অংশ নেয়নি, তাই মঞ্চেও এদের মাধ্যমে আমাদের প্রতিফলন দেখতে চাই না।'—তখন ঢোঁক গেলারও অবকাশ পাওয়া যাবে না।

সলিল চৌধুরী ঃ একটি সাক্ষাৎকার

প্রসঙ্গ ঃ গণনাট্য

গণনাট্য আন্দোলনের প্রাক্তন পুরোধাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার একটা পরিকল্পনা আছে আমাদের (তাঁদের বর্তমান অবস্থান বা ভূমিকা যাই হোক না কেন)। তদনুযায়ী, অক্টোবর '৭৬ সংখ্যায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা প্রকাশিত হয়। নিবারণ পণ্ডিত মহাশয়ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লিখবেন বলে, কিন্তু তাঁর লেখা আমরা পাইনি। সলিল চৌধুরীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারটিও সেই পরিকল্পনার অঙ্গ। সাক্ষাৎকারটি কালী দাশগুপ্তর সহায়তায় গৃহীত হয়। সাক্ষাৎকারের প্রায় হুবহু অনুলিপি সলিল চৌধুরীকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে প্রকাশিত হলো। —সম্পাদকমণ্ডলী

প্রস্তুতিপর্ব : আপনি কীভাবে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে এলেন ?

সলিল চৌধুরী : প্রথম আসি ছাত্র আন্দোলন থেকে। পার্টিতে আনেন অরুণ দাশগুপ্ত। সময়টা বোধহয় ১৯৪০। পার্টি তখন বেআইনী। তখন থাকি একটা হস্টেলে। পড়তাম বঙ্গবাসী কলেজে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাই তখন ছাত্র রাজনীতির প্রধান বিষয়।

এক বছর হস্টেলে থাকার পর গ্রাম থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে থাকি। থাকতাম সোনারপুর থানার কোদালিয়া গ্রামে। এখন নাম সুভাষগ্রাম।

বাঁশি বাজাতাম ১৪/১৫ বছর বয়স থেকে। তিমিরবরণের গ্রুপে, সাধনা বসুর নাচের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

'৪১-এ কলকাতায় যখন প্রথম বোমা পড়লো, তখন বছর খানেক আমি বাবার কাছে আসামে চলে যাই। বাবা ছিলেন চা বাগানের ডাক্তার। সে সময়টা সংগীত নিয়ে খানিকটা research করার সুযোগ পাই—বিশেষ ক'রে তথাকথিত কুলিসম্প্রদায়ের সংগীত নিয়ে। ওখানকার শ্রমিক আন্দোলনেও কিছুটা যুক্ত হয়ে পড়ি। যার ফলে বাবার চাকরি

যাবার জো হয়েছিল। তখনকার সে অত্যাচার, অকল্পনীয়। আড়কাটিরা গিয়ে লোক ধরে নিয়ে আসতো। একবার যে ঢুকতো, সে আর বেরোতে পারতো না। যে কোন কুলি woman could be enjoyed by the Britishers! গর্ভবতী মেয়ের পেটে লাথি মেরে মেরে-ফেলা, এ সব তো আকচার ঘটতো।

বাবা আগে খুব সাহেব ছিলেন। তারপর কংগ্রেসের বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের সময় দামি দামি স্যুট নিয়ে bon fire করেন। এ ব্যাপারটা পরে আমার গানে এসেছে।—

আমার বাবা বোকা ছিল, আমি তো তার ছেলে
সে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে গিয়েছিল জেলে।
তোমরা কেমন দিশি সুতোয় বানালে গাঁটছড়া
তার এক কোণ বাঁধলে গাউনের সাথে,
এক কোণ গলায় দিয়ে ঝুললুম—
নাকের বদলে নরুণ পেলাম টাকডুমাডুম ডুম।

আমার মনে আছে, ১৯৪৭-এ যখন স্বাধীনতা এলো, তখন আমি আসামে, চা বাগানে। কংগ্রেস থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে লরি করে মিছিল বেরোলো। তাই দেখে সমস্ত কুলিশ্রমিক ছুটতে ছুটতে সোজা পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে shelter নিল! আমাদের বাড়ি ছিল ডিমাপুর-মণিপুরের রাস্তায়—অর্থাৎ একেবারে ফ্রন্ট। সেখানে যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, দল বেঁধে মেয়েদের ধর্ষণ করা, এসব ঘটনা তারা দেখেছে। তারা মনে করেছে, এটাও বুঝি অমনি কিছু। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আজাদ হো গ্যায়ে।' তারা বললে, 'উও ক্যা চীজ হোতা হ্যায়?' সেই মানুষগুলোর স্বাধীনতা আজও কতটা হয়েছে, সেটা ভাববার কথা। তাদের perspective থেকে আমাদের স্বাধীনতাকে কীভাবে দেখবো, সেটাও ভাববার কথা।

প্রস্তুতিপর্ব : আচ্ছা, এই যে বললেন, ১৯৪১-এ আসামে গিয়ে সংগীত নিয়ে খানিকটা গবেষণা করার সুযোগ পেলেন, সেটা সম্পর্কে একটু বলুন।

সলিল চৌধুরী : তখন আমার রাজনীতির দিকে মন গেছে। একটা শিল্পীর সামাজিক involvement হতে পারে, বা content কী ধরণের হওয়া

উচিত, এ ব্যাপারে ভাবতে শুরু করেছি। তার আগে লোকসংগীত শুনেছি, সুরটা ভালো লাগলে গলায় তুলে নিয়েছি, এই পর্যন্ত। এখন ভাবতে চেষ্টা করলাম, কী নিয়ে ওরা গান গাইছে। টুসু বলে ওখানে উৎসব হয়, কুলি মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করে, তাদের গানের মধ্যে সাহেবদের অত্যাচারের কথা আসছে: বাড়ির বউকে তুলে নিয়ে চলে গেল, এই সব কথা। আবার তার পরেই চলে এলো: কাল তুই ডালটা চমৎকার রেঁধেছিলি, আজ সেরকম পারলি না কেন? অর্থাৎ, একটা total জীবনযাত্রার ছবি।

আর আসামের চা বাগান তো একটা mini-India—মুণ্ডা, কোল, ভীল, অন্ধ্রের কয়া বলে একটা জাত, এরকম কত গোষ্ঠীর মানুষ।

আমার একটা চেতনা হলো যে সুর জিনিসটাকে জীবনযাত্রা থেকে আলাদা করে ফেলা যায় না। সুর থেকে বিষয়কে আলাদা করা যায়না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সুর আর কথা হলো গানের দুই ডানা, একটা কেটে দিলে গান আর উড়তে পারেনা।

প্রস্তুতিপর্ব: ক্ল্যাসিকাল গানের ক্ষেত্রে সুরটাকে তো কথা থেকে আলাদা করেই ধরা হয়…

সলিল চৌধুরী: সেখানে কথাটা কেবল শব্দ মাত্র। একটা Symphony বা সেতার বা স্বরোদ যখন বাজানো হচ্ছে, সেখানে তো কথা নেই।

প্রস্তুতিপর্ব: সেখানেই প্রশ্নটা ছিল। কথা থেকে আলাদা করে নিছক সুর জিনিসটাকেই মার্কসবাদী চেতনা থেকে নতুনভাবে বোঝবার বা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন কি?

সলিল চৌধুরী: আমি এখনো মনে করি, সুরের একটা আলাদা স্থান আছে। সব সংগীতকেই গান হতে হবে এমন তো কথা নেই। নিছক সংগীতের মধ্যেও বিকৃতি হতে পারে, প্রগতি হতে পারে।

প্রস্তুতিপর্ব: হ্যাঁ, কিন্তু প্রগতিটা কী ভাবে হতে পারে?

সলিল চৌধুরী: একটা কথা বলি। হিট্‌লার বীথোভেনকে নিষিদ্ধ করেছিল। কেন?

প্রস্তুতিপর্ব: তাঁর একটা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল।

সলিল চৌধুরী: ব্যক্তিগত ঐতিহ্যের কথা নয়। তাঁর composition-এর মধ্যে

একটা আশাবাদ আছে, একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ আছে—against any form of slavery. পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা থাকলেই সেটা বোঝা যায়। The broad philosophy of freedom against any oppression—এ জিনিষটা বীথোভেনের সংগীতে আছে। আছে বলেই ফ্যাশিস্টরা নিষিদ্ধ করেছিল বীথোভেনকে।

প্রস্তুতিপর্ব : কিন্তু আমাদের ক্ল্যাসিকাল সংগীতে তো এই জিনিষটা অত স্পষ্টভাবে নেই ?

সলিল চৌধুরী : না, আমাদের ক্ল্যাসিকাল সংগীতটা প্রধানতঃ অন্তর্মুখী—introvert.

প্রস্তুতিপর্ব : কাজেই, এত বেশী অন্তর্মুখী সংগীতকে আপনি কীভাবে বা কেমন করে interpret করতে পারেন—ধরুন একটা রাগকে—যাতে তা প্রগতির সহায়ক হতে পারে ? এ ব্যাপারে ভেবেছেন কী ?

সলিল চৌধুরী : আমার তো মনে হয়, এ সংগীতের মধ্যে প্রচুর বিশুদ্ধতা রয়েছে—অবশ্য এর সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীচরিত্রের কথাটা বাদ দিলে। কারণ যাঁরা শিল্পী, স্রষ্টা, তাঁরা কিন্তু মূলতঃ শোষিত শ্রেণী থেকেই এসেছেন।

প্রস্তুতিপর্ব : কিন্তু তাঁরা, হয়তো অজান্তেই, শোষকশ্রেণীর দর্শনের কাছে কি আত্মসমর্পণ করেন নি ?

সলিল চৌধুরী : অনেক ক্ষেত্রে করেননি। সংগীত জিনিষটাই basically freedom. একটা মানসিক অবস্থায় কথাটা সু—র হয়ে যায়। সেই মানসিক অবস্থায়, ভারতীয় সংগীতে, একটা ধ্যানের ভাব আছে।

ভারতীয় সংগীতসাধকরা অনেকেই দেখা যায় ছেঁড়া কাপড় পড়ে গাছতলায় বসে সাধনা করেছেন। সাধু হরিদাস—তেঁতুলতলায় বসেন, তেঁতুলপাতা খান, আর ভগবানের কাছে ভজন গেয়ে প্রার্থনা করেন। আকবর বাদশা তিনবার গাড়ি পাঠালেন, তিনবারই তিনি refuse করলেন : 'বাদশা তো কী হয়েছে ? আমার বাদশা অনেক বড়ো !' এই সাহসটা আসে কোথা থেকে ?

আবার উল্টোটাও আছে। ওদের চামচাগিরি করেও গান তৈরি হয়েছে—জয় মহামহিম ইত্যাদি। আর এই করতে করতেই ক্ল্যাসিকাল সংগীতের স্বাভাবিক প্রকাশটা হয়ে গেল আনুষ্ঠানিক—formal. দরবারের

লোকেদের please করতে গিয়ে বকড়ি তান, অমুক তান, তমুক তান এলো। কে কতটা ক্যারদানি মেরে সামনের ঐ বাদশাকে তুষ্ট করতে পারে, সেইটাই হয়ে দাঁড়ালো লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে পড়লো জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তার আগে, সংগীত ছিল ধর্ম আন্দোলনের প্রধান বাহন। সন্তদের ভজন, চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে পদাবলী গান সৃষ্টি হলো, এ সবের কথা ভাবুন। এই সব গান কিন্তু জনজীবন থেকেই বেরিয়েছে—আর বেরিয়েছে ঐ দরবারী সংগীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে।

আর এই জায়গাটাতেই বলা যায় যে গণনাট্য আন্দোলন জনজীবনের সঙ্গে সংগীতের হারিয়ে যাওয়া যোগটা আবার প্রতিষ্ঠা করে।

প্রস্তুতিপর্ব : আমরা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আসাম থেকে কলকাতায় ফিরলেন কবে?

সলিল চৌধুরী : ১৯৪২-এ। যুদ্ধের panicটা তখন কেটেছে। পার্টির উপর থেকে ban তুলে নেওয়া হয়েছে। 'জনযুদ্ধ' লাইন এসে গেছে।

প্রস্তুতিপর্ব : আচ্ছা, এই 'জনযুদ্ধ' লাইন নিয়ে সচেতন বাদপ্রতিবাদের কথা আপনার মনে পড়ে?

সলিল চৌধুরী : আমার গ্রাম ছিল সুভাষ বোসের গ্রাম, আবার এম এন রায়েরও গ্রাম। সেখানে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা আমি বিক্রী করতাম ১৫০ থেকে ২০০ কপি।

প্রস্তুতিপর্ব : কী ধরণের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন?

সলিল চৌধুরী : প্রচণ্ড। ১৫০/২০০ জন কংগ্রেসী একদিন ঘিরে ফেললো আমার বাড়ি—'নেমে আয় শালা, দেখে নেবো!' দলবল আমাদেরও কিছু কম ছিল না, so there was a big হাতাহাতি। রায়পন্থীদের সঙ্গে বড়ো একটা clash বাধতো না, কারণ নৃপেনদা, যিনি ছিলেন ওঁদের গ্রুপের প্রধান কর্মী, তিনি প্রায় সময়েই কলকাতায় কাজ করতেন।

প্রস্তুতিপর্ব : সাধারণ মানুষ বৃটিশের সঙ্গে আঁতাতের এই ব্যাপারটা কি ভাবে নিতেন?

সলিল চৌধুরী : এটা ভুল। আমরা কখনো বলিনি বৃটিশ আমাদের বন্ধু। আমরা যারা কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ছিলাম তারা সব সময়েই মনে করেছি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর জাপানী ফ্যাশিজম্, এই দুটোর

বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। কাজেই আমাদের কেউ বৃটিশের দালাল বলেনি।

কিন্তু সুভাষ বোসকে কুইসলিং বলার পর থেকেই অবস্থাটা বদলে গেল। বিশেষ করে শরৎ বোস জেল থেকে বেরোবার পর শুরু হলো কংগ্রেসের ঠ্যাঙানি। সুযোগ বুঝে নেহ্‌রুও জয় হিন্দ বলে উঠলেন—এতদিন কিন্তু তিনি গাল দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছিলেন।

প্রস্তুতিপর্ব : কিন্তু আপনাদের এই সময়কার গানে কবিতায় তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা প্রকাশ পায়নি? হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রমেশ শীল, সুকান্ত-র রচনায় জাপবিরোধিতা এসেছে, মজুতদার-বিরোধিতা এসেছে, কিন্তু বৃটিশ-বিরোধিতা কোথায়?

সলিল চৌধুরী : আমার একটা গানেও শুধু জাপবিরোধিতা দেখাতে পারবেন না। ধরুন, তেভাগার সময় লেখা 'হেই সামালো'তেও 'সাদা হাতির কালো মাহুতে'র কথা বলেছি।

প্রস্তুতিপর্ব : তাহলে পার্টি লাইনের সঙ্গে কি আপনার বিরোধ ছিল?

সলিল চৌধুরী : না। আমার তো মনে পড়ে না পার্টি নেতৃত্ব কখনো একথা বলেছে যে বৃটিশ আমাদের বন্ধু—অন্ততঃ not in so many words. নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল, আজ পৃথিবী দুটো ক্যাম্পে ভাগ হয়ে গেছে—ফ্যাশিস্ট আর অ্যান্টি-ফ্যাশিস্ট। এর মধ্যে একটা ক্যাম্পে জড়ো হতেই হবে—মাঝামাঝি কিছু চলবে না।

প্রস্তুতিপর্ব : কিন্তু কারখানায় ধর্মঘট না-করা, উৎপাদন বাড়ানো, অর্থাৎ বৃটিশকে বিপদে না ফেলার লাইন তো ছিল?

সলিল চৌধুরী : তা ছিল। তবে আমাদের কৃষক ফ্রন্টে ঐ লাইনের প্রভাব খুব একটা বুঝতে পারিনি।

প্রস্তুতিপর্ব : আর একটা কথা। দ্বিজাতি তত্ত্ব বা কংগ্রেস-লীগ এক হওয়ার স্লোগান আপনার সাংস্কৃতিক কর্মকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

সলিল চৌধুরী : আদৌ না। বহু জায়গাতেই পার্টি-লাইনের সঙ্গে আমার বিরোধিতা ছিল। তবে দাঙ্গা-বিরোধী গান আমি লিখেছি। কিন্তু দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রভাবে কোন গান লিখিনি। যেমন—

ও মোদের দেশবাসীরে

আয়রে পরাণ ভাই আয়রে রহিম ভাই
কালো নদী কে হবে পার।

প্রস্তুতিপর্ব : শুনেছি, যুদ্ধের মধ্যে এক বৃটিশ পাইলটের হাতে ইয়েনান ফোরামের একটি কপি এদেশে আসে, এবং সেটা সাইক্লো করে পার্টির মধ্যে বিলি করা হয়। আপনার ওপর এর প্রভাব কী রকম পড়েছিল ?

সলিল চৌধুরী : প্রচণ্ড। For whom ? এই প্রশ্নটা প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত শিল্প সাহিত্যকে বিচার করার একটা মানদণ্ড পেয়ে গেলাম।

প্রস্তুতিপর্ব : আপনার গানের সুর বা সামগ্রিক আঙ্গিকটা আপনার শ্রোতার কাছে গ্রহণীয় হলো কিনা, সেটা কি আপনি ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করার চেষ্টা করেছিলেন ? এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার একটা বিতর্ক হয়েছিল বলে শুনেছি।

সলিল চৌধুরী : একটা কথা বলি। আমি পার্টিতে এসেছিলাম একজন accomplished musician হিসেবে। একেবারে অল্প বয়েস থেকে আমি পিআনো বাজিয়েছি, ক্ল্যাসিকালের চর্চা করেছি, ওয়েস্টার্ন মিউজিকের চর্চা করেছি। আসামের চা বাগানে থাকতে লোকসংগীত সম্পর্কেও জেনেছি। কাজেই আমার সাংগীতিক মানস অনেক বিস্তৃত ছিল। সুতরাং যখন কোনো content নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, সেই contentকে যখন সুরে ফেলে প্রকাশ করতে লাগলাম, an accomplished musician was doing it. স্বীকৃত যে form তাকে ভাঙা দরকার—কারণ নতুন content আসছে। 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' আমাদের আগের কোনো ভারতীয় গানের ফর্মের মধ্যে পড়ে না। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—এই বাঁধাধরা চারতুকে বিভক্ত আমাদের গানের ফর্মকে আমায় ভাঙতে হয়েছে 'রানারে', 'পাল্কি চলে'তে।

প্রস্তুতিপর্ব : কিন্তু, 'শ্রোতা কে ?'—এই মানদণ্ডে আপনার আঙ্গিককে কি বিচার করেছেন ? 'ঢেউ উঠছে'র সুর আমাদের মতো মধ্যবিত্তের কানে অপূর্ব লাগে, কিন্তু শ্রমিক কৃষক কি এই সুর গ্রহণ করেছেন ?

সলিল চৌধুরী : সেটা যাচাইয়ের ক্ষেত্র ছিল পার্টি মিটিং। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের

কাছে গাইতে হয়েছে এ গান—তিনবার চারবার করে। কৃষকদের মধ্যে অবশ্য বেশি জনপ্রিয় হয় 'ও মোদের দেশবাসীরে,' 'হেই সামালো', 'বিচারপতি' প্রভৃতি।

প্রস্তুতিপর্ব : এগুলো তো মূলতঃ দেশজ সুরেই রচিত ?

সলিল চৌধুরী : হ্যাঁ, মোটামুটি traditional form-এই। কিন্তু, যেখানে musical experiment হচ্ছে···যেমন পাল্কির গানে। ওটা তো কোন রাজনৈতিক গান নয়, গ্রাম বাংলার একটা হারিয়ে যাওয়া ছবিকে সুরের মধ্যে ধরতে চেয়েছি। আমি চেয়েছি ওটাকে actually যারা শ্রম করছে তাদের গান করে তুলতে। যে কারণে 'হেঁইয়া হেঁইয়া' ধ্বনিগুলো জুড়তে হয়েছে। বা শেষের দিকে বাহকরা ঝিমিয়ে পড়ছে, আর টানতে পারছে না, এটা বোঝাবার জন্য সুর ও তাল পাল্টানো হয়েছে। অর্থাৎ content-এর দাবিতে form বদলাচ্ছে।

'পাল্কি চলে' বা 'গাঁয়ের বধূ'কে গণনাট্য সংঘ ban করে দিল। বললো, আজ যেখানে কৃষক বধূরা লঙ্কার গুঁড়ো হাতে নিয়ে লড়ছে, তুমি সেখানে 'ভাঙা কুটিরের সারি'র কথা বলছো। আমার বক্তব্য ছিল, আমি শিল্পী হিসেবে total ছবিটা তুলে ধরেছি—একদিন যাদের সুখের জীবন ছিল, আজ ডাকিনী যোগিনীরা এসে তছনছ করে দিল তাকে। এই অব্দি বলে আমি থেমেছি এই জন্যেই যে তোমরা লড়াই করবে। এরপর যদি আমি বলি জোট বাঁধো তৈরী হও, তাহলে সেটা নেহাৎ স্লোগান হয়ে যাবে, শিল্প থাকবে না।

প্রস্তুতিপর্ব : কিন্তু ধরুন আপনার 'শপথ'। একটা অসামান্য কবিতা। তার শেষে তো আপনি সরাসরি স্লোগান দিয়েছেন—ক্ষেতে কিষাণ, কলে মজুর, নও জোয়ান তৈরি হও; অতে কবিতার শিল্পের তো কোনো ক্ষতি হয়নি ?

সলিল চৌধুরী : না, তা অবশ্য হয়নি। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, সব গান, সব কবিতাই সর্বদা স্লোগান দিয়ে শেষ করতে হবে এটা ঠিক নয়। কোথাও কোথাও স্লোগান নিশ্চয়ই আসবে, বিষয়ের প্রয়োজনেই। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত প্রেম ভালোবাসা ব্যক্তিগত দুঃখবেদনারও তো স্থান থাকা চাই গানে ? আমি তো মনে করি মানুষের এই ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো

আছে বলেই মানুষ সংগ্রাম করে। জীবন একটা total ব্যাপার, তার নানা দিক আছে, তার সবটাকেই ধরতে হবে গানে। কাজেই, পার্টি যখন অতিবাম রণদিভে-লাইন নিল, তার সঙ্গে আমার তীব্র বিরোধ হয়। স্লোগানকে গান করতে হবে? গীতিকার সুরকারকে কারখানার গেটে গিয়ে গান লিখতে হবে? আমি বলেছিলাম, একটা গান দশটা বুলেটের সমান। হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তা। গীতিকার সুরকারকে অবশ্যই ঘনিষ্ট যোগ রাখতে হবে রাজনীতির সঙ্গে, কিন্তু তার অর্থ কি এই যে কারখানার গেটে গিয়ে গান তৈরি করতে হবে? সৃষ্টির উৎসকেই যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে গান তৈরী হবে কী করে?

আসলে পুরো ব্যাপারটা এত যান্ত্রিক! মাওয়ের তত্ত্বটাকে এমন যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করা হলো! মাও কোথায় বলেছেন higher form of artকে অবহেলা করতে? হেমাঙ্গদারা বললেন, যা আছে তাই থাকবে, চাষীরা যা বোঝে শুধু সেই সুরই ব্যবহার করতে হবে, অন্য কিছু চলবে না। আমি বলেছিলাম, হেমাঙ্গদা, কলকাতা থেকে আপনি বম্বে এসেছেন প্লেনে, শরীর খারাপ বলে। তা না করে গরুর গাড়িতে এলেই তো পারতেন? অর্থাৎ জীবন এগিয়ে চলেছে, আর আমরা সেই পুরোনো জিনিষকেই আঁকড়ে ধরে থাকবো? সংস্কৃতি আগে বাড়বে না? বুর্জোয়া সংগীত ফর্মের দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আর আমরা যদি সেই চাষীর গানকেই আঁকড়ে ধরে থাকি, তাহলে কোনোদিনও আমরা তাকে fight করতে পারবো না।

কালী দাশগুপ্ত: এ প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। কিছুকাল আগে রাঁচিতে কিছু ওঁরাও লোকসংগীত সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ইউরোপীয়ান ফাদারের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আবার এক ওঁরাও পাদ্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। সেই ওঁরাও পাদ্রী নিজে ভালো কম্পোজার। তিনি বললেন, 'দেখুন এই ফাদারের christian hymns আমি গাইতে পারি, কিন্তু সাধারণ ওঁরাও জনগণ গাইতে পারে না। তাদের জন্য আমি ওঁরাও সুরে গান রচনা করি'। কাজেই হেমাঙ্গদাদের বক্তব্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে যুক্তি আছে।

সলিল চৌধুরী: হ্যাঁ, আসলে দুটোরই প্রয়োজন আছে।

প্রস্তুতিপর্ব : একটু অন্য কথায় আসি। পার্টির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদের কারণটা কী ?

সলিল চৌধুরী : আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি পলাতক। কিন্তু কোন অবস্থায় আমি পালাতে বাধ্য হয়েছি তা শুনলে যে কেউই পালাবে। বাবা মারা গেছেন, বিধবা মা, ছ'টি ছোটো ছোটো ভাইবোন নিয়ে দিনের পর দিন literally starve করেছি। পার্টি থেকে একদিনের জন্যে কেউ খোঁজ নিতে যায়নি আমি কী করে বেঁচে আছি। তখন 'পাশের বাড়ি', 'পরিবর্তন', 'বরযাত্রী' এসব ছবিতে সুর দেওয়া হয়ে গেছে ; গাঁয়ের বধূ, রাণার, পাল্কি চলে, এসব রেকর্ড হয়ে গেছে। সেই সময় বিমল রায় জানালেন যে আমার 'রিক্সাওয়ালা' গল্পটা নিয়ে উনি হিন্দী ছবি করতে চান—দো বিঘা জমিন। তখন এ তো আমার কাছে হাতে চাঁদ পাওয়া। নিছক বেঁচে থাকার জন্যেই আমাকে বম্বে চলে যেতে হলো।

প্রস্তুতিপর্ব : কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানার মতো নকশালবাড়ি আন্দোলন কি আপনাকে কোনো সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে ?

সলিল চৌধুরী : না, ও ঢেউটা তো বম্বে অব্দি গিয়ে পৌঁছয়নি। তবু, খবর যে একেবারে পাইনি তা নয়। তবে যে চূড়ান্ত অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে আপনারা pass করেছেন সেটা সম্পর্কে আমি খুব বেশি অবহিত নই। খবর কিছু কিছু পেয়েছি দূর থেকে। কসবায় আমার মা থাকতেন। চোদ্দো পনেরো বছরের ছেলেদের রাস্তার ওপর গুলি করে মারা হচ্ছে দেখে মা কেঁদে আমাদের বলতেন, "তোরা করছিস কী ?" আমি আর তখন কী করবো, এত দূরে সরে গেছি ! কোনো আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত নই, আস্তানা বহু দূরে, জীবনযাত্রাটাও একেবারে আলাদা।

প্রস্তুতিপর্ব : অপসংস্কৃতি কথাটা আজকাল বহুশ্রুত। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ?

সলিল চৌধুরী : এ-কে রুখতে গেলে বিরাট সর্বভারতীয় আন্দোলন দরকার। এই যে মুকদ্দর কি সিকন্দরের মতো ছবি সারা ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক দেখছে, এই একচেটিয়া আধিপত্যকে ভাঙতে গেলে একটা parallel ফিল্ম আন্দোলন করতে হবে। 16mm ছবি করে গ্রামে গ্রামে দেখাতে হবে। এর জন্য চাই বিরাট সংগঠন। এরকম একটা কিছু গড়ে তোলার জন্য এখন আমি বিশেষভাবেই চেষ্টা করছি।

একটা broad cultural organization চাই। যারাই সুস্থ সংস্কৃতির জন্য লড়তে প্রস্তুত, তারাই আসবে সে সংগঠনে। রাজনীতিতে কেউ CPI, কেউ CPM, কেউ নকশাল—তা হোক না। আমার তো মনে হয় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে একটা জায়গায় আমরা সবাই মিলে কাজ করতে পারি। আমি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ মানি না বলে আমাকে সংগঠনে নেওয়া হবে না কেন এটা আমি বুঝতে পারি না। চীন বা সোভিয়েত কী বললো তাই দিয়ে কেন আমরা পরিচালিত হব? আমাদের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাটাই তো আমাদের নীতি নির্ধারণ করবে?

প্রস্তুতিপর্ব : কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ না করলে কী করে চলবে?

সলিল চৌধুরী : কোন কাজটায় সোভিয়েত তোমাকে বাধা দিয়েছে যে তাকে আক্রমণ না করলে চলবে না?

প্রস্তুতিপর্ব : বাধা তো সব সময়ে সরাসরি আসে না? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই কি সব সময় সরাসরি বাধা দেয়? কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের যে অসংখ্য বহিঃপ্রকাশ, সেগুলোই বাধা। সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ধরুন জরুরী অবস্থার সময় যে পরিস্থিতিটার সৃষ্টি হয়েছিল, তার পেছনে তো সোভিয়েত মদত ছিল? সোভিয়েতের বা ভিয়েতনামের এই ভূমিকাকে উদ্‌ঘাটন না করলে কি সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ঠিক পথে এগোতে পারে? সেক্ষেত্রে সোভিয়েতপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধ বাধবেই।

সলিল চৌধুরী : সে সমালোচনার অধিকার নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু, বিশ দফার ওপর বহু শিল্পীই গান গেয়েছেন বা লিখেছেন—অনেক সময় বাধ্য হয়ে; শুধু সেই কারণেই তাঁদের boycott করতে হবে কেন, সেটা আমি বুঝতে পারি না।

প্রস্তুতিপর্ব : সহনশীলতা নিঃসন্দেহে থাকা দরকার, কিন্তু যার যা ভূমিকা সেটাকে গোপন ক'রে নয়।

সলিল চৌধুরী : সব মিলিয়ে আমার একটা কথাই মনে হয় বারবার। এই সমস্ত তর্কবিতর্ক আলোচনার চূড়ান্ত ফলটা হচ্ছে negative. আমাদের সময়ে কত শিল্পী, কত গায়ক, কত লেখক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, উদ্বুদ্ধ হয়ে

গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন, নতুন সৃষ্টির একটা জোয়ার এসেছিল। আজকে সৃষ্টির সেই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপারটা তো আর দেখি না। আজকে precondition করে দেওয়া হচ্ছে—চীনপন্থী হতে হবে, সোভিয়েতপন্থী হতে হবে। কেন? আমার কথা হচ্ছে, আমার নিজের দেশের যে শোষণ, অত্যাচার, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড অনাচার, primarily সেটাকে fight করার জন্যই তো আমার গান, আমার নাটক, আমার লেখা। আজকে কিন্তু তার থেকে বড়ো কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাজনৈতিক alignment-টা। আর সেই কারণেই আগেকার সেই বিরাট স্বতঃস্ফূর্ততা আজ আর নেই।

তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আজকে বিভিন্ন media এত শক্তিশালী, এত সুদূরপ্রসারী তার প্রভাব যে তার পাল্টা media গড়ে তুলতে না পারলে, নিছক আগেকার মতো squad তৈরি করে অপসংস্কৃতির এই বন্যা ঠেকানো যাবে না। সে যুগে তো রেডিও, সিনেমার এই অপ্রতিহত প্রতাপ ছিল না, বরং ফিল্মে কিছু কিছু জীবনধর্মী বক্তব্যই আসতো। আজ একটা broad cultural organization তৈরি করে এর পাল্টা media গড়ে তুলতে পারলে অনেক শিল্পীকে তার মধ্যে পাওয়া যাবে। অন্যথায় তাঁরা বাধ্য হবেন ঐ অপসংস্কৃতির সেবা করতে—ইচ্ছের এবং বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

মাউণ্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য

সম্প্রতি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে ভারতের অস্থায়ী শাসনকর্তারা সাতদিনব্যাপী "রাষ্ট্রীয় শোক" পালন করেছেন। বৃটিশ প্রভুরা যে 'সাধের ব্যাটন' ঠিক হাতেই দিয়ে গিয়েছিলেন, তারই স্মারক হিসেবে ১৯৪৯ সালে রচিত এই অবিস্মরণীয় গানটি আমরা পুনর্মুদ্রিত করছি। —সম্পাদকমণ্ডলী

মাউণ্ট ব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গ্যালায় ও।
তুমি সোনার পুরী আন্ধার কৈরা ও প্রভু কই চলিলায় ॥
সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়
(কিরে হায় হায়রে)
আর মাথাই-এ যে মাথা কুটে, বলদায় বুক থাপরায়
তোমার শ্যামা চেট্টি ভক্তবৃন্দে ও, তারা ধূলায় গড়াগড়ি যায় ॥
কান্দে রাজা মহারাজা, তোমার পুষ্যবাছা
(আর) ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্দে ও,
কালো বাজারের প্যাটলা হুতুম পেঁচা।
তোমার নয়াদিল্লী ডুবুডুবু ও, বুঝি ভঙ্গ বঙ্গ ভেসে যায় ॥
যেইন তোমার পরবর্তী, আইলা গোপাল রাজচক্রবর্তী
আইলা গান্ধী ভস্মতিলক মাথায় ধুতি চাদর গায়
(মরি হায় হায়রে)।
ক্লাইভ-কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায়
(মরি হায় হায়রে)।
বামুনের খুসী মন জল ভরা নয়ন, তোমার লেডির গাউন
কাঁদিয়া ভিজায় ॥

রাম গ্যালা বনবাসে, বেউলা হইলা রাঢ়ি,
(আর) ঘুগল-ব্যাটন বিলাত গ্যালা, কান্দে গোপলাচারী
(আহা মরি মরি মরি)
দিল্লী হইতে পুষ্পরথে গ্যালা উড়িয়া
(আর) করজোড়ে ভক্তবৃন্দে আসমানে চাহিয়া
(প্রভু নাই নাইরে) ॥

"কান্দিও না সর্দার পণ্ডিত কাইন্দো না কাইন্দো না,
আমি যাহা দিয়া গ্যালাম নাই যে তার তুলনা ॥"
(আমি যাই যাইরে)
"যাইবায় যদি এ্যাট্‌লী বাপরে তুমি কইয়ো গিয়া।
কমনওয়েল্‌থ্‌ প্রেমের ডোরে রাখে য্যান বান্ধিয়া ॥"
(হায় নাই নাইরে)
"মিছা ক্যানে ভাবনা কর, ভয়ের কিবা আছে,
অশরীরী ছায়া আমার থাকবে কাছে কাছে ॥"
(আমি যাই যাইরে)
"তোমার দখিন-পূব এশিয়ার গতিক ভাল নয়,
জান যে মোদের খাঁচা ছাড়া কখন কি যে হয় ॥"
(হায় নাই নাইরে)
"আমরা আছি, মার্শাল আছে, আছে আমেরিকা,
এই জাহাজের হও গাধা বোট, নইলে ভীষণ ঠ্যাকা ॥"
(আমি যাই যাইরে)

নয়া দিল্লীতে ঘোর কলিতে আইলা কল্কি অবতার,
কি বাহার।
পতিত ভারত করিতে উদ্ধার।
(আর) বড় বড় দেশ নেতা দিলা পায়ে ধর্ণা
তপস্যায় লভিলেন বর স্বরাজ অন্নপূর্ণা
হবে ধন ধান্যে পূর্ণা ॥

শুন, শুন, শুন সবে, শুন দিয়া মন (ভালো বেশ বেশ)
স্বরাজের মাহাত্ম আমি করিব বর্ণন (ভালো বেশ বেশ)

পনের অগাস্ট দিনে সাতচল্লিশ সন (ভালো বেশ বেশ)
দশভুজা স্বরাজদেবী কইলা আগমন। (ভালো বেশ বেশ)
সাগর পারে বুড়া সিংহী রইলা বাহন (ভালো বেশ ভালো)
দশ হাতে দেখি নূতন দশ প্রহরণ। (ভালো বেশ বেশ)
প্রথম হাতেতে ধরেন খড়্গ প্রহরণ (ভালো বেশ বেশ)
অখণ্ড দেশের মুণ্ড করিলেন ছেদন। (ভালো বেশ বেশ)
দ্বিতীয় হাতে বরাভয় অহিংস ব্যাটন (ভালো বেশ বেশ)
সাধুরে দমন করেন চোরেরে পালন। (ভালো বেশ বেশ)
তৃতীয় হাতে করেন দেবী কনট্রোল নিধন (ভালো বেশ বেশ)
এক দৌড়ে চল্লিশ টাকা ওঠে চাউলের মন। (ভালো বেশ বেশ)
চতুর্থ হাতেতে করেন বসন-হরণ (ভালো বেশ বেশ)
ল্যাংটা শিবের ধর্ম দেশে করেন প্রচলন। (ভালো বেশ বেশ)
পঞ্চম হাতে বশীকরণ মারণ উচাটন (ভালো বেশ বেশ)
ক্ষুধার ভূত কাঁদুনে-গ্যাসে করেন বিতরণ। (ভালো বেশ বেশ)
ষষ্ঠ হাতে বন্ধ করেন জাতীয়করণ (ভালো বেশ বেশ)
জাতিভেদ দূর, আসে বিজাতী মূলধন। (ভালো বেশ বেশ)
সপ্তম হাতেতে গড়েন দেবী দালাল ইউনিয়ন (ভালো বেশ বেশ)
কৃষক সভা, মজদুর সংঘে পাঠান বিভীষণ। (ভালো বেশ বেশ)
অষ্টম হাতে ভক্তজনে বর বিতরণ (ভালো বেশ বেশ)
মন্ত্রীগিরি, কনট্রাকটরী করিলেন বণ্টন। (ভালো বেশ বেশ)
নবম হাতে গান্ধী-ভস্ম ঔষধ ধারণ (ভালো বেশ বেশ)
রাষ্ট্রদ্রোহী সর্বরোগে বিশল্যকরণ। (ভালো বেশ বেশ)
দশম হাতে নিরাপত্তার নাগপাশ বন্ধন (ভালো বেশ বেশ)
লালজুজু নিশভুরে করিতে নিধন। (ভালো বেশ বেশ)
কণ্ঠে তার "গড সেভ দি কিং"—জন গণ মন (ভালো বেশ বেশ)
দেশবাসী কর দেবীর গুণ-সংকীর্তন। (ভালো বেশ বেশ)

এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন,
রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন।
জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন।
টাটা বিড়লা তেরে নাম, জয় বল্লভ গোপাল রাজারাম।
মজুর কিষাণ হায় নিমকহারাম, মুঝকো মুনাফা দে ভগবান॥
যে বাঁশেতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাঁশরী,
সেই বাঁশ যে ডাণ্ডা হইয়া মাথায় মারলো বাড়ি॥
(আহা মরি মরি মরি)
মাটি চাইয়া লাঠি পাইলাম, দিয়া বুকের খুন,
হাসির বদলে ফাঁসী পাইলাম, দই-এর বদলে চুন।
(আহা মরি মরি মরি)
চাকরী চাইয়া ছাঁটাই পাইলাম, কাপড় চাইয়া দড়ি,
এখন কলস যে ভাই কিনি, হাতে নাইতো এমন কড়ি।
(আহা মরি মরি মরি)
হিন্দুস্থানে শ্বশুর বাড়ী, পাকিস্তানে ঘর
মধ্যিখানে ভূতের ময়দান, বউ যে হইল পর।
(আহা মরি মরি মরি)
রাম রাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ,
ল্যাজের আগুন দিয়া সোনার লংকা করে ধ্বংস।
(আহা মরি মরি মরি)
ঠগের বাড়ী নিমন্ত্রণ বুঝিলায় অবেলায়,
রাজভোগ খাওয়াইবো কইয়া খাওয়াইল কাঁচকলা।
(আহা মরি মরি মরি)
মাথায় ভাঙ্গলো কাঁঠাল ভাইরে, মুখে লাগলো আঠা,
স্বরাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বলির পাঁঠা
(আহা মরি মরি মরি)

মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গলকাব্য হেথায় সাঙ্গ হইলো
প্রেমানন্দে বাহু তুলে রাম রাম বলো
গাও দেশবাসীগণ
স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন।

দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

বৃটিশ শাসনে বিজ্ঞান ও কারিগরী নীতিঃ ১৭৯২-১৯১৩

ভারতে বৃটিশ শাসনকালে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষানীতির বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে সব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান-সমূহের অন্তঃক্রিয়া চলেছে, সেগুলি বুঝতে গেলে সাধারণভাবে শিক্ষানীতির বিবর্তনের প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তাই সাধারণ শিক্ষানীতির বিবর্তন আমাদের আলোচনায় মৌলিক গুরুত্ব পেয়েছে ও এই বিবর্তনের পশ্চাৎপটেই বিজ্ঞানশিক্ষার বিবর্তনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবতঃই আলোচনায় বাংলাদেশের উপর জোর বেশি পড়েছে।

আদিপর্ব

বৃটিশ বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হচ্ছে, ভারতবর্ষে তখন সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিজ্ঞানচর্চাকে প্রায় লুপ্ত করে দিয়েছিলো বললেও চলে। কিন্তু বিজ্ঞান ও কারিগরিতে যে মান অর্জিত হয়েছিলো তা যেকোনো য়ুরোপীয় দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রাক্কালের মানের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। ভারতীয় ত্রিকোণমিতি নিজস্ব কিছু সূত্রের উপর দাঁড়িয়েছিলো। আধুনিক সূত্রের সঙ্গে এই সূত্রগুলির ফারাক এতই কম ছিলো যে, ভারতীয় জ্যোতিষগণনা নির্ভুলই হতো। কিন্তু পঞ্জিকা তৈরী হতো কিছু যান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে, নিয়মের বুনিয়াদ জ্যোতিষচর্চার মহলে আলোচিত হতো না। সূর্য-কেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা অজানা ছিলো, কিন্তু গ্রহগুলির কক্ষপথ সম্পর্কে সম্পর্কে ভারতীয় চিন্তা টলেমির তুলনায় এগিয়েই ছিলো। কিন্তু এসব চর্চা দীর্ঘদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, জ্ঞানও হয়েছিলো লুপ্তপ্রায়। ভারতীয় বীজগণিত ও পাটীগণিত বহু জটিল অঙ্ক সমাধান করার পক্ষে যথেষ্ট উন্নত ছিলো। আবিষ্কৃত ছিলো দ্বিমাত্রিক সমীকরণের সাধারণ সমাধান। কিন্তু দেশীয় গণিতচর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, সংস্কৃত ও আরবী বিজ্ঞানের যে মেলবন্ধন ভারতকে বিজ্ঞানচর্চার

এক পীঠস্থানে পরিণত করতে পারতো তা কোনোদিনই বাস্তব রূপ নিতে পারলো না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গতিরোধের কারণেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয় নি।

আকরিক অবস্থা থেকে ধাতু নিষ্কাশন ও ধাতুর কাজ ছিল উচ্চমানের। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছোটো হারে তৈরী ইস্পাতের উৎকর্ষ বৃটেনের কয়েক ধরণের ইস্পাতের চেয়ে নিম্নমানের ছিলো না। আয়ুর্বেদ ও য়ুনানী চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিলো কার্যকর ও সজীব, যদিও ভেষজ ও শল্য প্রয়োগের ফলাফলের কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানে অনাগ্রহ শারীরবৃত্তে (physiology) অগ্রগতির পথ আটকে রেখেছিলো। বসন্তের বীজকেই ব্যবহার করে বসন্তের টিকার বহুল প্রচলন বৃটিশ পর্যবেক্ষকদের আশ্চর্য করেছিলো।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৃটিশ শাসকেরা শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো দু'টি : (১) ভারত-বাসীর কাছে প্রমাণ করা যে, দেশীয় রাজন্যদের চেয়ে বৃটিশরা ভারত ও ভারতীয় চিন্তার প্রাচীন ধারাগুলির প্রতি বেশী করে নজর দেয় ; (২) দেশের চালু রীতি-নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করার ব্যাপারে য়ুরোপীয় বিচারকদের সাহায্য করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান আইনব্যবস্থার জ্ঞান কেন্দ্রীভূত করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম প্রদক্ষেপ নেন ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রভাবশালী নাগরিকদের এক আবেদন মঞ্জুর করে ১৭৮১ সালে তিনি কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২ সালে বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু সংস্কৃত কলেজ।

মেকলে-পর্ব

শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পর্কে চিন্তার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রথম আঁচ পাওয়া যায় চার্লস গ্রাণ্টের ইস্তাহারে। গ্রাণ্ট 'ক্ল্যাপহাম গোষ্ঠী' নামক এক ধর্মপ্রচারক খৃষ্টান চক্রের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ক্ল্যাপহাম চক্রের সবচেয়ে নামজাদা লোক ছিলেন উইলবারফোর্স। ভারতে কাজ করতে এসে গ্রাণ্ট ঐ বিলাতী চক্রের চিন্তাগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা গড়তে থাকেন। গ্রাণ্টের ইস্তাহারের তারিখ ১৬ই অগাস্ট, ১৭৯৭, যদিও এটি লেখা হয় মূলতঃ ১৭৯২ সালে। ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানীর সনদ নিয়ে বৃটিশ কমন্স সভায় আলোচনা চলে, তখন গ্রাণ্টের ইস্তাহারটি পাঠ করা হয় মিশনারী-বিরোধী

মহলের যুক্তি খণ্ডনের প্রয়োজনে। এই ইস্তাহারেই প্রথম বিজ্ঞানশিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রাণ্ট চাইলেন যে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের বহুল প্রচার হবে শিক্ষার মূল ভিত্তি। কারণ, তবেই "হিন্দুরা দেখতে পাবে সমস্ত কাজে ও সকল বিষয়ে যুক্তিকে আমরা কী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করি, তারাও শিখবে যুক্তিনির্ভর হতে, ওয়াকিবহাল হবে নিজেদের প্রজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে, পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে; এমন সব গ্রন্থে তারা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হবে যেগুলি রচিত সদ্‌গুণের উৎসাহপ্রদান ও পাপাচারের নিবৃত্তিকল্পে; তাদের মতামতের সাধারণ ভাণ্ডার কলুষমুক্ত হবে, এবং সর্বোপরি তারা নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্রের উন্নততর এক পন্থা দেখতে পাবে..."[১]। সর্বশেষ বক্তব্যটির স্বাভাবিক পরিণতি টেনে গ্রাণ্ট খৃষ্টধর্মের জ্ঞান বিতরণের জোর দিতে চাইলেন।

ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে গ্রাণ্ট দেখলেন কেবল অজ্ঞানতা আর অন্ধকার। প্রকৃতিবিজ্ঞানের কিছু কিছু সরল ব্যাখ্যা তিনি হাজির করতে চাইলেন, যাতে প্রকৃতির চালচলন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলির ত্রুটির উপলব্ধি ঘটতে পারে। গ্রাণ্টের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিলো বহুদূর পর্যন্ত। তিনি জোর দিতে চাইলেন গতিবিদ্যার সূত্রসমূহ এবং কৃষি ও অন্যান্য কার্যকরী বিদ্যায় সেগুলির প্রয়োগের উপর। বিজ্ঞানচর্চার ফলে রেশম, নীল, চিনি প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতি সাধনের সম্ভাবনার উল্লেখ তিনি করে গেছেন। গ্রাণ্ট লক্ষ্য করেন যে, পরম্পরাবাহিত বিধিই ভারতবাসীর কাছে সর্বোচ্চ আইন। বিজ্ঞান পাঠ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাণ্টের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিলো ভারতবাসীর জড়িমা কাটিয়ে তাদের মনকে সচল করে তোলা। কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তনে গ্রাণ্টের আসল উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের প্রধান ধর্মগুলির অসারত্ব প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি লিখলেন যে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের প্রাকৃতিক নিয়ম পরিষ্কার করে জানার পরে রাহু-কেতুর গল্প ও প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় ধারণা আঘাত পাবে, এবং "পরিষ্কার একটি ভ্রান্তি আবিষ্কার করার পর মন আরও অনেক কিছু মেনে নেওয়ার জন্য তৈরী হবে।" অর্থাৎ কী না খৃষ্টধর্ম প্রসারের পথ পরিষ্কার হবে।

যাই হোক, ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার ঝুঁকি কমন্স সভা নিলেন না, এবং কোম্পানীর যে সনদ অনুমোদিত হল, শিক্ষাপ্রসঙ্গে তাতে লেখা থাকলো যে, "বছরে ন্যূনপক্ষে এক লক্ষ টাকার এক তহবিল আদায় করে রাখা হবে। এই

অর্থব্যয়ের লক্ষ্য হবে ভারতে বৃটিশ অধিকৃত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিসাধন, বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষণ এবং বিজ্ঞানশিক্ষার সূত্রপাত ও বিস্তার"।[১] কিন্তু এই সনদের ৪৩ নং ধারার মানে নিয়ে 'প্রাচ্যপন্থী' ও 'ইংরাজীপন্থী'দের মধ্যে বিখ্যাত লড়াই শুরু হল। এই লড়াইতে গ্রান্টের উত্তর-সূরী রূপে আবির্ভূত হলেন প্রভাবশালী সাহিত্যিক মেকলে, 'প্রাচ্যপন্থী'দের বিপক্ষে। ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ তারিখে গবর্ণর জেনারেলের পরিষদে মেকলে তাঁর বিখ্যাত লিপি পেশ করলেন। যদিও তিনি সংস্কৃত বা আরবী কোনোটিই জানতেন না, তবু তিনি লিখলেন, "[প্রাচ্যপন্থীদের] মধ্যে এমন একজনকেও আমি পাইনি যিনি অস্বীকার করতে পেরেছেন যে, ভালো একটি য়ুরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি তাকই ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সমগ্র সাহিত্যের সমান মূল্যবান"।[১] ইংরাজী ভাষা ও তার মাধ্যমেই অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের পক্ষে মেকলে ওজস্বী বক্তব্য রাখলেন। ঐ ব্যাপারে জোরালো সমর্থন ছিলো রামমোহন রায়ের। শিক্ষাখাতে অর্থব্যয় প্রসঙ্গে রামমোহন ১৮২৩ সালে গবর্ণর জেনারেলের কাছে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার বেশ কিছু যুক্তির অনুরণন শোনা যায় মেকলের লিপিতে।

সংস্কৃত বিদ্যার বিরুদ্ধে রামমোহন তীব্র শ্লেষ ও ধিক্কার প্রকাশ করেন। সংস্কৃত ভাষাকে যিনি অভিহিত করেন "জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে উপস্থিত এক দুর্ভাগ্যজনক বাধা" বলে। সংস্কৃতের উপর অধিকার জন্মাতে প্রায় এক জীবনকাল কেটে যায়। কিন্তু "এই প্রায়-অভেদ্য আবরণের তলায় লুকায়িত বিদ্যা" সারাজীবনের পরিশ্রমের কোনো উপযুক্ত পুরস্কারই নয়। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বারো বছর হয়তো যায় ব্যাকরণ শিখতে। ফলে কেবল জন্মায় শব্দ নিয়ে অযথা চুলচেরা বিচারের ক্ষমতা। মীমাংসাশাস্ত্রের ছাত্র যা শেখে তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ, বেদের কোন্ কোন্ অংশ আওড়ালে ছাগল হত্যার দোষ হতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রই বা কী ধরনের পাঠ নেয়? বিশ্বচরাচরের সকল বস্তু ক'টি আদর্শ শ্রেণীতে বিভক্ত, অথবা শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক কী। আর বেদান্ত? কীভাবে আত্মা ঈশ্বরে শোষিত হয় শিখে কী লাভ হয় ছাত্রের? আর বস্তুর আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই, বাবা, ভাইয়ের প্রতি মমতা নিরর্থক, কেন না "তাঁদেরও তো সৎস্বরূপ নেই এবং যত শীঘ্র তাঁদের কাছ থেকে পালিয়ে সংসার ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল, এমন শিক্ষা কী সামাজিক হিত আনতে সক্ষম?"

রামমোহনের পুরো চিঠিটিই এই ধরণের যুক্তিতে ভরা। অবশেষে তিনি বলেন, "সরকারের উদ্দেশ্য দেশবাসী জনসাধারণের উন্নতি। তাই সরকার নিশ্চয় য়ুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত উজ্জ্বল, বিদ্বান অল্প কয়েক সজ্জনকে অধ্যাপনায় নিযুক্ত করে অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (natural philosophy), রসায়নশাস্ত্র, শারীরস্থান (anatomy) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বলিত [আগে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে] অধিক উদার ও আলোকপ্রদানকারী এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবেন। সরকার নিশ্চয় ['হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে ভারতে প্রচলিত জ্ঞান বিতরণের জন্য এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের' পরিবর্তে] প্রয়োজনীয় পুস্তক, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ একটি কলেজের ব্যবস্থা করবেন।"[১]

'প্রাচ্যপন্থী'দের মত কী ছিলো? সরকারের জেনারেল কমিটি অফ পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাকশনের মধ্যে এঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন প্রিন্সেপ-এর নেতৃত্বে এক দলে। ১৮ই অগাস্ট, ১৮২৪ তারিখে জেনারেল কমিটি গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে যে চিঠি দেন তাতে 'প্রাচ্যপন্থী'দের মত অনেকটা ফুটে উঠেছে। ঐ চিঠির বক্তব্য অনুসারে যে শিক্ষা "জনগণের আত্মার প্রিয়" তার সঙ্গে যুক্ত করে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের সতর্ক ও ধীর স্থির প্রবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা নন। কিন্তু তাঁদের মতে য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা, জনগণের বোধগম্য প্রয়োজনের ("among the sensible wants of the people") মধ্যেও পড়ে না, আর এই শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতাও সরকারের নেই। অন্যত্র 'প্রাচ্যপন্থী'রা বললেন, প্রথমতঃ সরকারের হাতে অর্থ অল্প, এই অর্থে যেহেতু সরকারের পক্ষে কোনো ধরণের সাধারণ ও সামগ্রিক শিক্ষাদান অসম্ভব, তাই সরকারের উচিৎ উচ্চমানের দেশী বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাঘটিত সমস্ত কাজে দেশের শিক্ষিত ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়গুলির আস্থা অর্জন প্রয়োজন, আরও প্রয়োজন শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার সময়ে এই শ্রেণীগুলির সহায়তা লাভে সদা সচেষ্ট থাকা। তাই ১৮ই অগাস্টের চিঠিতে তাঁরা মত প্রকাশ করলেন যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানে এখন হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, কেননা হিন্দু-মুসলমান দু'জনকার মনেই এখনো যথেষ্ট বিরাগ রয়েছে [বৃটিশদের বিরুদ্ধে]। অবশ্য 'প্রাচ্যপন্থী'রা আশা করতেন যে ক্রমে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন আন যাবে। তাঁরা চেয়েছিলেন দেশীয় জ্ঞানকে খরিজ না করে বরং তার পিঠে সইয়ে সইয়ে য়ুরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধ্যানধারণা জুড়ে দিতে।

তাছাড়া ভারতীয় জ্ঞান সম্বন্ধে 'প্রাচ্যপন্থী'দের মত ছিল মেকলের বিপরীত। বিলাত থেকে কোম্পানীর ডাইরেক্টররা জানিয়েছিলেন যে, তাদের মতে[১] প্রাচ্যের বিজ্ঞান পড়া ও লোক নিয়োগ করে তা পড়ানো "সময় নষ্ট করার চেয়েও খারাপ।' ১৮ই অগাস্টের চিঠিতে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করা হ'ল। বলা হ'ল: "সংস্কৃত ও আরবীতে অধিবিদ্যাগত বিজ্ঞানগুলির (metaphysical sciences) মান যা, তাতে এই বিষয়গুলি এর একটি ভাষায় পড়াও যা, অন্য যে কোনো ভাষায় পড়াও তাই। হিন্দুদের পাটীগণিত ও বীজগণিত থেকে য়ুরোপীয় সূত্রগুলিই পাওয়া যায়। আর মাদ্রাসায় অঙ্কশাস্ত্রের যে উপাদানগুলি পড়ানো হয় সেগুলি ইউক্লিডের উপাদান ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

এই প্রসঙ্গে ১৮৩৯-৪০ সালের জন্য জেনারেল কমিটির রিপোর্ট-সংলগ্ন কল্‌ভিন সাহেবের টীকায়[২] একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভূপাল রাজ্যে বৃটিশ প্রতিভূ উইল্‌কিন্সন সেহোরে দেশী ভাষার মাধ্যমে পড়ানোর এক পরীক্ষা চালান। উচ্চতর সংস্কৃত ক্লাসে তিনি হিন্দু অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষ বিষয়গুলিকে বেছে নেন পাঠক্রমের ভিত্তি হিসাবে। সংস্কৃত 'সিদ্ধান্ত'-শাস্ত্রগুলি জ্যোতিষের ছাত্রকে নিয়ে আসে একেবারে কোপার্নিকাস, নিউটন ও গ্যালিলিওর দুয়ারে। উইল্‌কিন্সন এই চৌকাঠে না থেমে গিয়ে ছাত্রদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ধ্যানধারণার কক্ষে পৌঁছিয়ে দিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা খুবই সফল হ'ল। বাসুদেব শাস্ত্রী নামে এক ছাত্র প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষের সঙ্গে পরবর্তী আবিষ্কার গুলিকে মিলিয়ে 'শিরোমণি প্রকাশ' বলে একটি বই লিখলেন। এই বইতে পুরাণ-গুলির আজগুবী গল্পের উপর আঘাত করা হ'ল। উজ্জয়িনী, পুণা, বারাণসী, মথুরা, নাগপুর ও সাতারার পণ্ডিতেরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। উজ্জয়িনীর পণ্ডিতেরা দাবি করলেন যে, পুরাণগুলি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। পৃথিবী যে গোল তা তাঁরা অস্বীকার করলেন। মথুরার পণ্ডিতেরা বললেন যে, 'সিদ্ধান্ত' গুলিই তো বটেই, সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রই আসলে ম্লেচ্ছ! নাগপুরের পণ্ডিতেরা 'সিদ্ধান্ত' সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না বোঝা গেলো। পুণা ও বারাণসী থেকে মত এলো যে, 'সিদ্ধান্ত'গুলিও সত্য, আবার পুরাণগুলিও সত্য, দু'য়ের মধ্যে বিরোধ নিতান্তই বাহ্য। কেবল সাতারার এক পণ্ডিত মশায় পুরাণগুলিকে খারিজ করে 'সিদ্ধান্ত'গুলির যাথার্থ্য তুলে ধরলেন, কিন্তু বিরোধিতা করলেন সূর্যকেন্দ্রিকতার। সঙ্কীর্ণ অর্থেও উইল্‌কিন্সনের পরীক্ষা সফল হ'ল। স্কচ এক

মিশনারী স্কুলের এক শিক্ষক ঐ ছাত্রদের অঙ্ক, জ্যামিতি, ইতিহাস ও বিশেষ করে জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞানের তারিফ করলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিৎ হ'ল 'ইংরাজীপন্থী'দেরই। গবর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক পুরোপুরি সমর্থন করলেন মেকলেকে। ৭ই মার্চ, ১৮৩৫ তারিখের প্রস্তাবে তিনি ঘোষণা করলেন, "ভারতের বাসিন্দাদের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধিই হওয়া উচিৎ বৃটিশ সরকারের মহান উদ্দেশ্য, এবং শিক্ষাখাতে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ইংরাজী শিক্ষায় ব্যয় হলে পরেই সবচেয়ে ভালো হবে"।[১] জেনারেল কমিটিকে বেণ্টিঙ্ক ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের এক পরিকল্পনা দাখিল করতে বললেন।

শিক্ষার মাধ্যমে দেশের উচ্চ শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃটিশ রাজনৈতিক প্রভাব সংহত করার মৌলিক লক্ষ্যে স্বাভাবিক ভাবেই দুইপক্ষ একমত ছিলেন। তাঁদের তাঁদের তফাৎ ছিলো কেবল লক্ষ্য সাধনের প্রণালী নিয়ে। মেকলেই এই লক্ষ্যকে তাঁর লিপিতে সবচেয়ে নিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন: "যে ভদ্রমহোদয়ের সাধারণ মতামতের আমি বিপক্ষে, একটি ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাঁদের মতো আমরাও মনে করি যে, আমাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে জনসাধারণের বৃহৎ অংশকে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চালানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে ভালো করে চেষ্টা চালাতে হবে যাতে এমন একটি শ্রেণী তৈরী করা যায় যারা আমাদের এবং আমাদের শাসনাধীন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে—এমন এক শ্রেণীর লোক যারা বর্ণে ও রক্তে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা এবং মননে ইংরাজ। দেশী ভাষাগুলির পরিশুদ্ধি, নামকরণের পশ্চিমী ভাণ্ডার থেকে ধার নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এগুলিকে সমৃদ্ধ করা, এবং ধাপে ধাপে এই ভাষাগুলিকে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার যোগ্য বাহন করে গড়ে তোলার কাজগুলিকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি এই শ্রেণীর হাতে।"[১] এইভাবে একটি বশংবদ মুৎসুদ্দী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তৈরী করার পরিকল্পনার ফল ফললো হাতে হাতে। কলকাতায় ১৮২৩ সালে স্থাপিত হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে কমিটি ১৮৩৯-৪০ সালের রিপোর্টেই লিখলেন: "ফলাফল প্রত্যাশার অতীত। ইংরাজী ভাষার উপর দখল এবং তার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি যতদূর এগিয়েছে, য়ুরোপের কোনো স্কুলেও তা দেখতে পাওয়া ভার। আরো এক পুরুষের মধ্যেই সম্ভবতঃ কলকাতার

হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তির যথেষ্ট বস্তুগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।"

মৌলিক লক্ষ্যে 'প্রাচ্যপন্থী'দের ঐক্যমতের এক নিদর্শন ৬ই অক্টোবর, ১৮২৩ তারিখে গবর্ণর-জেনারেলকে লেখা জেনারেল কমিটির চিঠি। চিঠিতে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental philosophy) বিষয়ে নিযুক্ত অধ্যাপকের লেকচারে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের কিছু ছাত্রকে বিনা মূল্যে উপস্থিত থাকতে দেওয়ার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে। কমিটি লিখেছেন "যে সব সমর্থ ও সজ্জন ব্যক্তি জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের পাশাপাশি অর্জিত বিদ্যারও বলে সমাজের সকল ধরণের মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী, তাঁদের মধ্যে সুস্থ প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞানের প্রসার ঘটার ফল ভালোই হবে। লেকচারগুলির বিষয়বস্তুর নিজস্ব আকর্ষণ-ক্ষমতা এবং যান্ত্রিক পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের প্রমাণ অবশ্যই এইসব ব্যক্তির মনে আগ্রহের সঞ্চার ঘটাবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজের অজান্তে যোগসূত্র স্থাপন হওয়ার দরুণ ব্রাহ্মণ ছাত্রের মনেও ধর্মসংক্রান্ত কোনো আশঙ্কা জাগবে না। একটি ক্ষেত্রে যদি এইভাবে য়ুরোপীয় ও হিন্দু বিদ্যার মেলবন্ধন ঘটে তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সংযুক্তির বিস্তার ঘটবে।" এম·ই ছিল কমিটির প্রত্যাশা। অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিলো সমাজের 'উচ্চ' শ্রেণীর মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি।

কলকাতায় নিয়মিত বিজ্ঞানের লেকচার শুরু হল। কমিটি সুপারিশ করলেন যে, অধ্যাপক যেন গতিবিদ্যা, উদস্থিতিবিদ্যা, বায়বীয় পদার্থবিদ্যা, আলোকতত্ত্ব, তড়িৎতত্ত্ব, জ্যোতিষ ও রসায়ন শাস্ত্রে লেকচার দেন। আলাদা করে রসায়নের জন্য ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থার কথাও কমিটি তুললেন। সপ্তাহে দু'দিন রসায়নের লেকচার, দুদিন অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে লেকচার ছাড়াও সাধারণের জন্য কিছু লেকচারের উপযোগিতাও আলোচিত হ'ল।

যদিও 'প্রাচ্যপন্থী' ও 'ইংরাজীপন্থী' দুই দলই 'বর্ণে ভারতীয়, মননে ইংরাজ' কালা সাহেব তৈরীর ব্যাপারে একমত ছিলেন, ইংরাজ ও বাঙ্গালী সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সামিল হয়েছিলেন দুই পক্ষের নিশানের তলায়। মেকলে দাবি করেছিলেন যে, দেশের বাসিন্দারা ইংরাজী শিক্ষায় আগ্রহী, কেননা ইংরাজী শেখে তারা পয়সা ফেলে; অপর পক্ষে সংস্কৃত ও আরবীর ছাত্রদের দিতে হচ্ছে সরকারী বৃত্তি। উত্তর দিতে গিয়ে প্রিন্সেপ 'ইংরাজীপন্থী'দের সমর্থকদের

সামাজিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে বললেন, "কোন্ শ্রেণীর লোকের কাছে ইংরাজীর জ্ঞান এক অবশ্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা? কলকাতার হিন্দুদের কাছে; সরকারদের, তাদের আত্মীয়দের, ও পুরানো দিনের সরকারদের বংশধরদের কাছে; ইংরাজদের ও সরকারী চাকুরীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার ফলেই যারা উন্নতি করেছে তাদের কাছে; ইংরাজীর জ্ঞান দরকার এমন চাকুরীতে যারা নিযুক্ত বা এমন চাকুরীর যারা উমেদার তাদের কাছে।"[১] মুৎসুদ্দী বুদ্ধিজীবীদের এমন যথার্থ সংজ্ঞা বিরল। নিজের ডায়েরীতে প্রিন্সেপ লিখলেন যে, 'ইংরাজীপন্থী'দের সঙ্গে যোগ দিলো ভারতে উপস্থিত ইংরাজদের এক অংশ এবং কমবয়েসী সরকারী চাকুরেরা; এদের সকলকে মদৎ যোগাতে থাকলো মিশনারিরা।

তবে রামমোহনের মতো ব্যক্তিদের 'ইংরাজীপন্থা'র কারণ খুঁজতে গিয়ে যদি আমরা সরকারী চাকুরী বা ইংরাজ বণিকের মুৎসুদ্দী বা বেনিয়ানগিরির কথাই শুধু ভাবি, তবে অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট হবো। মনে মনে রামমোহন হয়তো চেয়েছিলেন যে, দেশবাসী রক্ষণশীলতার কারাগার থেকে মুক্ত হোক। তাদের সামনে পাশ্চাত্য সভ্যতার উদার পটভূমি আর আধুনিক বিজ্ঞানের সড়ক বিস্তৃত হোক। কিন্তু আলোকপ্রদানের জন্য তিনি নির্ভর করলেন মহামান্য সরকার বাহাদুরের উপর। আলোকপ্রদানের জন্য সরকারের কাছে তিনি আর্জি পেশ করলেন। ভুলে গেলেন বা উপলব্ধি অথবা গ্রাহ্য করলেন না কী উদ্দেশ্যে, কী প্রণালীতে, কাদের অথবা কী আলোকদান করতে বৃটিশ শাসক উৎসাহী। ফলে বৃটিশ শাসকের শিক্ষাব্যবস্থা যে অনিষ্ট করলো, তার দায়ভাগও রামমোহন এড়াতে পারেন না। ইতিহাস তাঁকে মুৎসুদ্দী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। এই প্রবন্ধে তাঁকে বিচারের ইচ্ছা আমাদের নেই। তাই তাঁর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো পর্যন্ত দেখেই এই প্রসঙ্গে যবনিকাপাত করা যেতে পারে।

'প্রাচ্যপন্থী' ও 'ইংরাজীপন্থী'দের বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটালেন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড। ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৯ তারিখের এক লিপিতে তিনি সোজাসুজি বললেন[২] (১) সরকারী অনুদান ব্যবহার করতে হবে ইংরাজী ভাষায় য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের এক সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম চালু করার জন্য; (২) "আমাদের সাধ্যে যতটা কুলায় ততটা সম্পূর্ণ এক শিক্ষাক্রম ধরে, উচ্চতর অধ্যয়ন চালাবার অবসর যাদের আছে, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোই শিক্ষাদানের মহান প্রাথমিক উদ্দেশ্য"—গরীব কৃষকদের বিপুল গরিষ্ঠাংশের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা

সম্ভব নয়। ইংরাজী প্রসারের একটি ব্যতিক্রম কেবল দেখা গেল। সরকারী পয়সায় সংস্কৃত ও অন্য প্রাচীন ভাষা এবং দেশী ভাষায় অঙ্ক ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করার এক কার্যক্রম প্রিন্সেপ নিয়েছিলেন। এই কার্যক্রমকে সীমিত করে এসিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থ (যেমন 'সিদ্ধান্ত'গুলি বা ইউক্লিডিয় জ্যামিতির সংস্কৃত বয়ান) প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হ'ল। তবে অকল্যাণ্ডের কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারী মহলেও ভিন্ন চিন্তার অস্তিত্ব থেকে গেলো। হজসন নামে এক সাহেব ধারাবাহিকভাবে দেশী ভাষায় ভালো বই ও দেশী ভাষায় পড়াতে সমর্থ শিক্ষক সৃষ্টির উপর জোর দিতে বললেন। "একদল অল্পশিক্ষিত, ইংরাজী বুলি কপচানেওয়ালা, যাদের শিক্ষার গড় সময়কাল এতই কম যে, নিজের দেশকে সঞ্জীবিত করার কোনও সম্ভাবনাই তাদের থাকতে পারে না, অথচ যাদের আরো বেশী দূর পর্যন্ত ভালোভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার না আছে টান আর না আছে ব্যবস্থা"—এদের ভিড় বাড়ানোর বদলে তিনি ঐ বিকল্প কার্যক্রমের প্রস্তাব আনলেন।[১] হজসন বললেন, "এই পড়াশুনা এমনিতেই দৈনন্দিন প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক জটিল ও এই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন।" হজসনের সমালোচনা গৃহীত হ'ল না।

বোম্বাইতেও একই ধরণের সাধারণ শিক্ষা চালু হয়েছিল। চিন্তাভাবনাও ছিলো একই প্রকারের। বোম্বাই'র শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করেন এল্‌ফিন্‌স্টোন। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক, বিনাদ্বিধায় তিনি তা ঘোষণা করলেন: "আমাদের ও আমাদের প্রজাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য ব্যবধানের অস্তিত্বের ফলে আমাদের শাসনের বনিয়াদ পিছল ও এ দেশের অধিবাসীদের ধর্মের চরিত্রও আবার স্পর্শকাতর। এই যে বিপদের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তাকে প্রতিরোধ করতে আমাদেরও কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়। যুক্তিনির্ভর শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে এদেশের অধিবাসীদের স্পর্শকাতরতা দূর করা ও তাদের কাছে আমাদের নিজস্ব নীতি ও মতামতগুলি পৌঁছে দেওয়াটাই হল একমাত্র সম্ভাব্য রাস্তা।"[১]

এই শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে গিয়েই বোম্বাইতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হয়। অঙ্ক, জ্যোতিষ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮২৭ সালে এল্‌ফিন্‌স্টোনের নামে একটি অধ্যাপকের আসনের সৃষ্টি হয়। সরকারী মানমন্দিরটিকেও এই অধ্যাপকের দায়িত্বে রাখার প্রস্তাব হয়। এ ছাড়া স্থাপত্য, ঔদকবিদ্যা (hydraulics), গতিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য

বিভাগে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর একজন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাও হ'ল। বোম্বাইতে দেশী ভাষার ওপর প্রথম দিকেই যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। ১৮২৮ সালে বোম্বাই'র গভর্ণর ম্যাল্‌কম্ সাহেব বললেন : "ভারতের বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটালে যে প্রধান উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হবে তার মধ্যে একটি হ'ল শাসনকার্যের প্রতিটি অঙ্গে তাদের যুক্ত করার বর্ধিত ক্ষমতা। মিতব্যয়, কাজের উন্নতি, নিরাপত্তা—এই কারণগুলির জন্য উপরোক্ত কাজটি অত্যাবশ্যক।··· মাঝারি আদালতগুলিতে যারা কাজ করে, আরো এগিয়ে তাদের যদি এই ধরণের দায়িত্ব অর্পণ করতে হয়, তার জন্য ইংরাজী ভাষা জানার প্রয়োজন আমি দেখি না—কিন্তু এ দেশের যে বাসিন্দারা উন্নতি করতে চায় তাদের জন্য আমাদের ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ পাঠের সুযোগ সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন।" ম্যাল্‌কম্ চাইলেন নেটিভদের মানসিক উন্নতি ও সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি, উপরন্তু নেটিভদের জানাতে চাইলেন "ইংলণ্ডের নীতি ও আইনকানুনের মধ্যকার অধিকতর উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সুষ্ঠু সূত্রগুলি ভারতে কেমনভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে।"[১] ম্যাল্‌কম্ খোলাখুলি বললেন যে, এল্‌ফিন্‌স্টোন-অধ্যাপকদের ভূমিকা হচ্ছে, "এই ধরণের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার দেশীয় হাতিয়ার তৈরী করা"! এই রকম বশংবদ বুদ্ধিজীবী তৈরী ছাড়াও ম্যাল্‌কম্ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত দেশীয় লোক দিয়ে রাজকার্য পরিচালনার প্রয়োজন ও সম্ভাবনার প্রসঙ্গ তুললেন। শিক্ষার সাধারণ নীতির দিশা নির্ধারণে এই চিন্তার গুরুত্ব স্বীকৃত হল বৃটিশ শিক্ষানীতির পরের পর্বে, যার শুরু ১৮৫৪ সালে উডের ডেস্‌প্যাচ থেকে।[৪]

এই পর্যায়ে, শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চশ্রেণীগুলির মধ্যে বৃটিশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ছিলো সাধারণ উদ্দেশ্য। এই কাজ করতে গিয়ে দেশীয় মানসিকতা যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, যাতে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া না হয়, 'প্রাচ্যবাদী' চিন্তার মধ্যে এই বণিকসুলভ আত্মরক্ষাবৃত্তি ছিলো প্রধান। শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে গিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি ও আশু বাণিজ্যিক স্বার্থহানির ভয় তাঁরা করতেন। অপরদিকে মেকলেরা সাম্রাজ্য স্থাপন ও পরিচালনার দূরবর্তী লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো আক্রমণমুখী। দেশীয় উচ্চ শ্রেণীগুলির মধ্য থেকে বশংবদ বুদ্ধিজীবী তৈরীর কাজটিতে তাঁদের তাই আগ্রহ ছিলো এতো নির্দিষ্ট। কেউ কেউ তাঁদের লক্ষ্যটি বুঝলেও, ইংরাজী ভাষার উপর জোর দেওয়ার মর্ম উপলব্ধি করেন নি। এর মর্মবস্তু ছিলো বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের

মধ্যে বিদেশী মানসিকতার সঞ্চার, দেশের জনসাধারণের থেকে তাদের বিযুক্ত করে বিদেশী শাসকের স্বার্থ ও মনোবৃত্তির সুরে সুর বেঁধে দেওয়া। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সৃষ্টি করেছিলো এবং এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ১৮৫৭ সালের জাতীয় যুদ্ধ-মুখী ধারাগুলিকে পুষ্ট করেছিলো। এদিক থেকে 'প্রাচ্যবাদী'-দের বিপদাশংকা একেবারে ভিত্তিহীন ছিলো না। কিন্তু ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকে পোক্ত করার ব্যাপারে, শেষ বিচারে মেকলেদের নীতিই ছিলো সবচেয়ে ফলপ্রসূ। 'প্রাচ্যবাদী'দের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো প্রাক্-১৮১৩ পর্বের সঙ্গে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ—যখন সাম্রাজ্যবিস্তার চলছিলো কোম্পানীর মাধ্যমে অসম বাণিজ্যের, প্রধানতঃ ভারতীয় পণ্য ও স্বর্ণ লুঠের প্রয়োজনে। ১৮১৩ সালে কোম্পানী তার একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হারালো—যে শিল্পপুঁজি বৃটেনে রাষ্ট্রশক্তিতে নিজ অংশ সংহত করছিলো, ভারতবর্ষকে এবার তারা তাদের শিল্পদ্রব্যের এক বিরাট বাজার হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল। "বাণিজ্যের পুরো চরিত্র পাল্টে গেলো। ১৮১৩ পর্যন্ত ভারত প্রধানতঃ রপ্তানীকারী দেশ ছিলো, আর এবার হয়ে উঠলো আমদানীকারী দেশ…।"[২] স্থায়ী, স্থিতিশীল সাম্রাজ্যের প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে যে নূতন দাবীগুলি নিয়ে এল, মেকলে-বেন্টিঙ্ক-অকল্যাণ্ড তাকেই রূপ দিলেন। তাঁদের জয় ছিল অনিবার্য।

উড-পর্ব

১৯ জুলাই, ১৮৫৪ তারিখে কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদের তরফে সার চার্লস উড ভারতের গবর্ণর জেনারেলকে এই ডেসপ্যাচ পাঠালেন। ৭ এপ্রিল, ১৮৫৯ তারিখে ভারত সেক্রেটারী স্ট্যানলী আর একটি ডেসপ্যাচে[৫] '৫৪ সালের বক্তব্যকেই মূলতঃ ব্যক্ত করলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এই দুটি ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকলো। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালের জাতীয় যুদ্ধের পর বৃটিশ সরকার সরাসরিভাবে ভারত শাসনের ভার হাতে নিলো। বিশাল ঔপনিবেশিক মৃগয়াক্ষেত্র শাসন অন্য কোনোভাবে সম্ভব হচ্ছিল না।

এই সময় ভারতে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য ও ধরণ আবার বাঁক নিচ্ছিলো। মার্কস লিখলেন[৩]: "এখন পর্যন্ত ভারতের অগ্রগতিতে গ্রেট বৃটেনের শাসক শ্রেণীগুলির আগ্রহ ছিল আকস্মিক, সাময়িক ও নেহাতই ব্যতিক্রমজনিত। অভিজাততন্ত্র ভারতকে অধিকার করতে চেয়েছিলো, অর্থপিশাচতন্ত্র চেয়েছিলো

লুঠতে, এবং মিল-মালিকতন্ত্র কম দামে পণ্য বিক্রি করে তার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। কিন্তু পাশার দান ঘুরেছে। মিল মালিকতন্ত্র এবার আবিষ্কার করেছে যে, ভারত একটি পুনরুৎপাদক (reproductive) দেশ। তাদের নিজেদের জীবনের জন্যই রূপান্তর হয়ে উঠেছে দরকারী। তাদের লক্ষ্য সাধনে সবকিছুর উপরে দরকার ভারতকে সেচ ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা দান। ভারত জুড়ে এখন তারা রেলপথের এক জাল বিছাতে চাচ্ছে। এবং এটা তারা করবেই।" বৃটিশ পণ্যের বাজার ছাড়াও ভারতকে বৃটিশ পুঁজিপতিরা এবার কাঁচামাল আহরণের ক্ষেত্র হিসাবেও গড়ে তুলতে চাইলো। বিশাল সাম্রাজ্যরক্ষা ও প্রতি কোণ থেকে সস্তায় কাঁচা মাল আহরণের জন্য রেলপথ বিস্তার জরুরী হয়ে পড়লো। সেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো কৃষিজাত কাঁচামালের সুষ্ঠু উৎপাদনের তাগিদে।

এই বিরাট কর্মকাণ্ড কুশলী ও বিশ্বস্ত দেশীয় লোক ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো না। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার জন্য শিক্ষানীতির যে পরিবর্তন প্রয়োজন হল উডের ডেসপ্যাচ তারই রূপরেখা যোগালো। অবশ্য, ১৮৫৪ সালের আগেই সাম্রাজ্য চালনার ব্যবহারিক প্রয়োজনে মেডিকাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাদান শুরু হয়। যে কার্যক্রম ১৮৫৪ সালে সচেতনভাবে সূত্রীভূত হয়, ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের অচেতন চাপ তার সূত্রপাত ঘটায় বহু আগেই।

বর্ণসংকরদের মধ্য থেকে অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিকিৎসকদের সাহায্যের জন্য ড্রেসার তৈরীর এক পরিকল্পনা আসে মাদ্রাজ থেকে। অপর দিকে কলকাতার সাহেবরা দেশী চিকিৎসক তৈরীর জন্য এক মেডিকাল স্কুল খোলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রথমে ডাইরেক্টররা মাদ্রাজী পরিকল্পনার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু কলকাতা থেকে জেনারেল কমিটি বারবার চাপ দিতে থাকে। ১৮২৫ সালের কলেরা মহামারীতে কলকাতার মেডিকাল ছাত্ররা যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অবশেষে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস কলকাতার পরিকল্পনার পক্ষেই মত দেন। ১৮২২ সালে মেডিকাল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতায়, ১৮২৭ সালে হয় বোম্বাইতে। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকাল কলেজ স্থাপনা হয়, ১৮৪৫ সালে বোম্বাইতে স্থাপিত হয় গ্রাণ্ট মেডিকাল কলেজ। মাদ্রাজে প্রাথমিক মেডিকাল স্কুল ছাড়াও ১৮৩৬ সালে মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্কুল ও কলেজগুলির উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। কলকাতার মেডিকাল কলেজে যেমন

তিনটি ভাষায় ক্লাস হ'ত : প্রাথমিক বা ইংরাজী ক্লাসের স্নাতকদের সাব-অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন হিসাবে সরকারী চাকুরীতে নেওয়া হ'ত ; ছাত্র-শিক্ষানবীশ বা বাংলা ক্লাসের ছাত্রদের তৈরী করা হ'ত সরকারের নিম্নতর চিকিৎসা বিভাগের জন্য ; আর, সামরিক বা হিন্দুস্তানী ক্লাসের ছাত্রদের দিয়ে সেনাবাহিনীর বা সরকারী বেসামরিক হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের দেশী ডাক্তারের পদ পূরণ করা হ'ত। মাদ্রাজের কলেজেও তিনটি বিভাগ ছিল : উচ্চতর বিভাগ থেকে বার হয়ে আসতো সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন, মধ্যম বিভাগ থেকে সহকারী ঔষধ নির্মাতা (apothecary), আর নিম্নতর বিভাগ থেকে হাসপাতাল সহকারী। কেবল সরকারী প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে এই ব্যবস্থাগুলি চালু করা হয়। তাই সরকারের এক স্থায়ী মাথাব্যাথা ছিল স্নাতকদের নিয়ে। এদের অনেকেই লাভজনক ব্যক্তিগত ব্যবসা ফেঁদে বসতো, সাব-অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জনের যে পদের জন্য তাদের ঘষে মেজে, অর্থ নিয়োগ করে তৈরী করা হয়েছে তার দিকে তার যেতো না। সরকারী প্রয়োজন এতই ছিলো যে, ১৮৫৩ সালে প্রতিটি স্নাতককে চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সরকার দেয়।

১৮২৪ সালেই বোম্বাইতে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল রুরকীতে সিভিল (পূর্ত) ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য টমাসন কলেজ। এই কলেজটি "বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়েছে পূর্তবিভাগে, জরীপ বিভাগে ও রেলপথে এক শ্রেণীর দক্ষ অধস্তন অফিসার সরবরাহের জন্য", বলা হ'ল।

উডের ডেসপ্যাচে স্পষ্ট বলা হল : "যদিও শিক্ষার উন্নতিবিধানে আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে ইংলণ্ডের [জাতীয়] চরিত্র, তাহলেও ভারতে য়ুরোপীয় জ্ঞানের অগ্রগতি যে ইংলণ্ডের বস্তুগত স্বার্থে একেবারে কোনো প্রভাব ফেলে না, তা নয় ; এই জ্ঞান ভারতের অধিবাসীদের শ্রম ও পুঁজি নিয়োগের অত্যাশ্চর্য ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষা দেবে, অনুপ্রাণিত করবে আমাদের অনুকরণে তাদের দেশের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারের বিকাশ সাধনে··· এবং একই সঙ্গে নিরাপদ করবে আমাদের কারখানাগুলির জন্য দরকারী বহু দ্রব্যের অধিকতর ও সুনিশ্চিত সরবরাহ। তাছাড়া সুনিশ্চিত হবে বৃটিশ পরিশ্রমের ফলগুলির জন্য প্রায় অন্তহীন এক চাহিদা।" ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নব নব লক্ষ্যের সঙ্গে সচেতনভাবে খাপ খাইয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহ্বান জানালো উডের ডেসপ্যাচ।

ডেস্‌প্যাচে দুটি বৈশিষ্ট্য প্রথমেই লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ শ্রেণীর অল্প লোককে অত্যন্ত উঁচুমানের শিক্ষাদানের উপর জোর দেওয়া বন্ধ হ'ল। জনসাধারণের বিপুল অংশের মধ্যে তাদের নিজস্ব কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরী করতে বলা হ'ল।

দ্বিতীয় নীতিটির উদ্দেশ্য ছিলো পরিষ্কার। দেশব্যাপী সুষ্ঠু পদ্ধতিতে কাঁচা মাল তৈরী এবং সেচ ও যোগাযোগব্যবস্থা নির্মাণের কাজে ন্যূনতম শিক্ষাপ্রাপ্ত মজুর ও কারিগর সরবরাহের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং পেশাগত কাজের সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত কারিগরী ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নয়ন। প্রথমটির উদ্দেশ্য কী ছিলো? বশংবদ বুদ্ধিজীবীবর্গ, সংখ্যা ও ভাবধারা দুই দিক থেকেই সংহত হয়ে উঠেছিলো। সরকার আর এদের শিক্ষার জন্য বেশী খরচ করার প্রয়োজন বোধ করছিলেন না। এদের নিজব্যয়ে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হ'ল। এদের শিক্ষাদান একটা ছাঁচে ঢেলে সংহত করার চূড়ান্ত কাজ হিসাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কয়েকটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল এই কাজটি উচ্চবর্গের শিক্ষার প্রতি সরকারের শেষ দান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য রইলো পরীক্ষা নিয়ে ও ডিগ্রী দিয়ে কলা ও বিজ্ঞানে বিধিবদ্ধ এক উদারনৈতিক শিক্ষাক্রম পরিচালনা। এ ছাড়া আইন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলার প্রস্তাবও দেওয়া হ'ল। জোর পড়লো আইনের উপর, কেননা ডাইরেক্টররা মত জানালেন যে, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ব্যাপারে রুরকী কলেজের প্রয়োগভিত্তিক ধরণটি অনেক বেশী কার্যকর।

বংশবদ বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগানোর যে চিন্তা ম্যাল্‌কম্ করেছিলেন, এতদিনে তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সময় এলো। সেপ্টেম্বর ৭, ১৮২৭, তারিখের 'বাংলার প্রতি খোলা চিঠি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উড বললেন, যদিও য়ুরোপীয় জ্ঞানের সাধারণ বিক্ষেপই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে, তা হলেও শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার কাজে এতটা গুরুত্ব নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিলো না "কেবল মানসিক সবলতার মান বাড়ানো, বরং শিক্ষার সুযোগ যারা গ্রহণ করছে তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটানো এবং বেশী বেশী আস্থার সঙ্গে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের উপযুক্ত সততাসম্পন্ন ভৃত্য (servant) সরবরাহ করাও" ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। আশা প্রকাশ করা হ'ল: "ভারতে শিক্ষার প্রসারের ফলে সরকারী প্রতি বিভাগেই

কার্যকারিতা বাড়বে, কেন না প্রতি বিভাগেই বুদ্ধিমান ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা যাবে; সাথে সাথে আমরা মনে করি, যে বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য পদে সর্বদা লোক নিযুক্ত হচ্ছে সেগুলি উৎসাহ যোগাবে শিক্ষার বিস্তারে।"

এতদিনে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যন্ত অধস্তন আমলা তৈয়ীর এক বিশাল কারখানা গড়ে তোলার এক নির্দেশ এলো। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ঠিক কী ধরণের ফল বৃটিশ শাসকেরা চাচ্ছিলো তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে যখন উড খুশী হয়ে ঢাকা কলেজের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দেন: "সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য অনুসারে জানা গেছে যে, ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ দারোগার শ্রমসাপেক্ষ কাজে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন"!

এছাড়া পেশাদারী কাজের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিক্ষালয়গুলিতেও উচ্চ শিক্ষাকে আরও প্রয়োগ ও জীবনমুখী করার চিন্তা আসছিলো। কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্‌দের ১৩, ১৮৫৪ তারিখের ডেসপ্যাচে এ ধরণের শিক্ষার অভাবকে একটি গুরুতর ত্রুটি বলে বর্ণনা করা হয়। এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ঐ কলেজে প্রাকৃতিক ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক দর্শন ও জ্যোতিষের দুজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভূতত্ত্বের অধ্যাপক যুক্ত ছিলেন ইতিমধ্যেই স্থাপিত সরকারী ভূতত্ত্ব সমীক্ষার দপ্তরের সঙ্গে। মেডিকাল কলেজগুলিতেও কেজো শিক্ষাকেই কিছুটা বৈজ্ঞানিক ধাঁচ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে পশু-শারীরবৃত্তের লেকচার চালু ছিলো। জুন ২২, ১৮৫৮ তারিখের ডেসপ্যাচে শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সাধারণভাবে জোর দেওয়া হ'ল সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের উপর। উড লিখলেন: "রুরকিতে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টমাসন কলেজের সাফল্য থেকে দেখা যায় যে, সারা ভারতে যে বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে তার প্রয়োজনে লোকদের অনুশীলিত করা এবং এখন যখন রেলপথ ও পূর্ত ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটছে তখন যে পেশাটিতে বহু লোক নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে, সেটিতে যোগ্যতা অর্জন করানোর প্রয়োজনে সিভিল ইঞ্জি-নীয়ারিঙে প্রয়োগনির্ভর শিক্ষাদানের ঐ ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভারতের অন্যত্র

প্রতিষ্ঠা করা দরকার, বিশেষত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে, যেখানে সেচের কাজ এতো জরুরী।" ১৪ই এপ্রিল, ১৮৫৮ তারিখের এক ডেসপ্যাচে[৪] উল্লেখ করা হয় যে, সদ্য অধিকৃত পশ্চিমী প্রদেশগুলিতে ও পাঞ্জাবে বিভিন্ন পূর্ত কাজের পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই রুরকি স্থানটিতে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনা করা হয়, বিশেষ করে সরকারের মনে ছিলো গঙ্গার খালের কথা। রুরকিতে দেশীয় ভাষা মারফৎ অল্পবয়স্ক এদেশীয় যুবকদের পূর্ত বিভাগে অধস্তন চাকুরীর জন্য তালিম দেওয়ার ক্লাসটিই জনপ্রিয় হয়েছিলো। সরকারী প্রচেষ্টা চলতে থাকে যাতে খালের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের সিপাই (sappers and miners); সাধারণ ইংরাজ সিপাই, এন. সি. ও. এবং পূর্ণ অফিসাররাও রুরকি কলেজের শিক্ষার সুযোগ নেয়। মাদ্রাজে ক্যাপ্টেন মেয়ট্‌-ল্যাণ্ডের স্কুলটিকেও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালয় হিসাবে গড়ে তোলা হয়। বোম্বাইতেও এই ধরণের শিক্ষালয় স্থাপনার পরিকল্পনা করা হয়। কলকাতায় প্রথম পরিকল্পনা হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ খোলার। প্রয়োগ-শিক্ষা চলবে আলাদাভাবে কলকাতার বিভিন্ন কারখানায়। জুন ২, ১৮৫৫ তারিখের ডেসপ্যাচে[৪] শেষ পর্যন্ত কলকাতায় একটি সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এই কলেজটি স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে। পরে এটিকে আবার প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হিসাবে এটি স্থায়ী অস্তিত্ব পায়।

স্বাভাবিকভাবে, উডের ডেস্‌প্যাচে কারিগরী শিক্ষার দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইতিমধ্যেই এ ধরণের একটি শিক্ষালয় মাদ্রাজে কোনো এক ডাঃ হাণ্টার স্থাপন করেছিলেন। বোম্বাইতে আর একটি স্থাপন করেন সার জামসেটজী জীজীভাই। জনসাধারণের মধ্যে কেজো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে টমাসন সাহেব উদ্যোগ নিয়েছিলেন উত্তর পশ্চিমে নতুন নতুন অধিকৃত এলাকা-গুলিতে। দেশী স্কুলে পড়া, লেখা আর পাটীগণিতের সরল নিয়মগুলি শেখানো হতে থাকে যাতে জমির মাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়ে প্রজারা নিজেদের অধিকার সামলাতে পারে। টমাসনের আশা ছিল যে, এই অঞ্চলে জমিতে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রচেষ্টা শিক্ষায় আগ্রহ সঞ্চারে সফল হবে। উডের ডেসপ্যাচে টমাসনের উদাহরণ উল্লেখ করে

আশা করা হয় যে, মাদ্রাজে রায়তওয়ারী ও বোম্বাই'র মিরাজদারী রাজস্ব ব্যবস্থাও শিক্ষার এই ধরণের কার্যক্রমের অনুকূলে কাজ করবে।

য়ুরোপীয় শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম সম্পর্কেও পুরানো নীতি পাল্টানো হ'ল : উচ্চতর বিভাগের জন্য মাধ্যম রইলো ইংরাজী, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য দেশীয় ভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হ ল। এই দুই স্তরে, বিশেষতঃ দ্বিতীয়টিতে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষণ অনুশীলন ক্রম চালু করতে বললেন উড। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ স্কুল স্থাপনার সিদ্ধান্ত হ'ল, এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রে রইলো তথাকথিত নর্মাল স্কুলগুলি। যে মুহূর্তে ব্যাপক জনতার মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হল তখনই দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করতে বৃটিশ শাসকেরা আগ্রহী হয়ে উঠলো।

নতুন নতুন নীতিগুলি চলতে লাগলো কেমন চালে? ১৮৬৫-৬৬ সালে শিক্ষাপ্রসঙ্গে মন্টিথের রিপোর্ট[৬] থেকে দেখা যায় যে, কেজো শিক্ষার জন্য এই সময় কলকাতায় রয়েছে মেডিকাল কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজের সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ ও দু'টি (একটি তার মধ্যে বেসরকারী) কারিগরী শিক্ষালয় ; বোম্বাইতে রয়েছে গ্রাণ্ট মেডিকাল কলেজ, পুণা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও কারিগরী শিক্ষা-প্রদানের তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ; মাদ্রাজে আছে মেডিকাল কলেজ, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, এই দুই কলেজের সঙ্গে যুক্ত কলেজিয়েট স্কুল, কারিগরী শিক্ষার স্কুল ও সামরিক যন্ত্রশিল্পীদের জন্য অর্ডনান্স স্কুল। পশ্চিমে রুরকির সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছাড়াও লাহোরে মেডিকাল কলেজ ও আগ্রায় মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হয়। পুণা, মহিশুর ও করাচীতে একটি করে ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল হয়, নেগাপত্তনে হয় একটি কারিগরী স্কুল। আহমেদাবাদ কলেজে একটি সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ খোলার প্রস্তাবের উল্লেখ পাওয়া যায় ঐ রিপোর্টে।

জানুয়ারী ২৪, ১৮৫৭ তারিখে গবর্ণর জেনারেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদন করলেন। শীঘ্রই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পুরোটাই ঘুরতে থাকলো চাকার মতো, কেন্দ্রে রইলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থাগুলি।

স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচের উল্লেখ করা হয়েছে। স্ট্যানলী লক্ষ্য করলেন যে, ভারতবাসীকে তাদের দুঃস্থতর দেশবাসীদের শিক্ষাদানের ব্যয়ভার কিছুটা গ্রহণ করানোও বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পরবর্তী কালের ডেসপ্যাচেও এই সমস্যার

উল্লেখ দেখা যায়। উচ্চতর শ্রেণীগুলি শিক্ষার সমস্ত সুবিধা হস্তগত করতে চাইছিলো। লক্ষ্ণৌর ক্যানিং কলেজ স্থাপিত হ'ল সর্দার ও জমিদারদের ছেলেদের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের থেকে আলাদা করে শিক্ষাদানের জন্য। লাহোর স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়েও এই ঝোঁক সফল হ'ল। বোম্বাইতে দাদাভাই নৌরজী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা উচ্চ শিক্ষার জন্য মোটা টাকা দানে রাজী ছিলেন, যদি সরকার সমান অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এবার কিন্তু বৃটিশ সরকার রাজী হলেন না। হাওয়েল ১৮৬৬-৬৭ সালে তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত নোটে বললেন: "এতদিন পর্যন্ত সরকারের প্রচেষ্টা খুব বেশী করে কেন্দ্রীভূত ছিলো উচ্চতর শ্রেণীগুলির শিক্ষার ব্যাপারে। এই দিক থেকে চেষ্টা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জনসাধারণের সমস্ত শ্রেণী-গুলির শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার ঘটানো, বিশেষ করে জনসাধারণের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পৌছানোর কাজটি এবার প্রধান উদ্দেশ্য।" নীতির এই পরিবর্তনের কারণ আমরা আগেই দেখেছি।

টমাসন পশ্চিম সীমান্তে এই ধরণের শিক্ষানীতি ১৮৫০ থেকেই চালু করে-করেছিলেন। সাধারণভাবে কিন্তু বৃটিশ সরকার হাওয়েল-বর্ণিত কাজে তেমন সফল হলেন না। মন্টিথের ১৮৬৫-৬৬ সালের শিক্ষানোটে[৬] দেখা যায় যে, ১৮৬৩-৬৪ সালে বাংলার D.P.I. লিখছেন: "জনসাধারণের নিম্নতর অংশের কাছে স্কুল শিক্ষা নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে ও কার্যকর করা হয়েছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে যে, এদের ভালোর জন্য যে স্কুলগুলি সংগঠিত বা উন্নত করা হয়েছে, তার সুযোগ সাথে সাথে একচেটিয়াভাবে দখল করেছে সামাজিক পাল্লায় উচ্চতর অবস্থানের শ্রেণীগুলি।" সরকারের সাধারণ নীতির পরিবর্তন ঘটলেও উপর থেকে নীচে শিক্ষা চুঁইয়ে যাওয়ার যে তত্ত্ব এতদিন ধরে চালু ছিলো, তার কোন কার্যকর পরিবর্তন অনেক বৃটিশ আমলার নিজেদের মনেও ঘটেনি, অন্ততঃ বাংলায় নয়। মন্টিথের ঐ নোটে দেখা যায় যে, ১৮৬৫ সালেও D.P.I. গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রথমে উচ্চতর শ্রেণীগুলির শিক্ষার উপর। হাওয়েল তাঁর ১৮৬৭ সালের নোটে[৭] স্বীকার করেন যে উড স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ অনুযায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার পর উচ্চ শ্রেণীগুলির শিক্ষায় সরকারের আর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা বিস্তার করার কথা নয়। কিন্তু তখনও শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছিলো এদেরই স্বার্থে, ক্রমে সরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বেসরকারী অর্থে শিক্ষা পরিচালনার লক্ষ্য অনুসৃত হয়নি, প্রাথমিক শিক্ষার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা

চালু হয়নি। বৃটিশ শাসকেরা অধৈর্য হয়ে উঠছিলো। দেশের যে শ্রেণীগুলি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো তাদের ভিতর থেকে মুৎসুদ্দী বুদ্ধিজীবী তৈরীর প্রক্রিয়া ভালো ভাবেই চালু হয়েছিলো। কিন্তু কতদিন আর ভরতুকি দিতে হবে? কবে আত্মবিক্রয়ী শ্রেণীগুলি নিজেরা এই কাজ হাতে নেবে? সাম্রাজ্যেরই প্রয়োজনে অন্য ধরণের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী কাজ ও বিনিয়োগের প্রয়োজন যে অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু মুৎসুদ্দী বুদ্ধিজীবী-প্রসবিনী শ্রেণীগুলিই বা সরকারকে মুক্তিনামা লিখে দেবে কেন?

বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা কেমন চলছিলো? বিজ্ঞানশিক্ষার অবস্থা দেখা যাক। মূল ডিগ্রি ছিলো বি. এ.। বোম্বাই বা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক ও পদার্থের বিজ্ঞান (physical science) না পড়লেও বি. এ. ডিগ্রী পাওয়া যেতো। কিন্তু কলকাতায় পদার্থের বিজ্ঞান অপরিহার্য ছিলো। অন্য বিষয়গুলি ছিলো অঙ্ক, ভাষা, ইতিহাস এবং মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান। ১৮৬৩-৬৪ তে একটি সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের বদলে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া আবশ্যক করা হ'ল। এই বিষয়গুলি ছিলো: জ্যামিতি ও আলোকতত্ত্ব, অজৈব রসায়নের উৎপাদন ও বিদ্যুৎতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা ও তুলনামূলক শারীরবৃত্তের উপাদান, ভূতত্ত্ব ও ভৌতিক ভূগোল। ১৮৮৬ সালে চালু হয় প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি। যে দশটি বিষয়ের পাঁচটি আলোচনা করতে হ'ত তার মধ্যে ছিলো বিশুদ্ধ অঙ্ক, মিশ্র অঙ্ক এবং পদার্থের বিজ্ঞান। বি. এ. ছাড়াও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বিভিন্ন স্তরের ডিগ্রী দিতো।

১৮৭০-৭১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে হাওয়েল[৬] লক্ষ্য করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রস্তাব: "(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর কাছে প্রাকৃতিক ও পদার্থের বিজ্ঞানের প্রাথমিক কিছু সূত্রে কিছু জ্ঞান আশা করা হোক; (২) এফ. এ. [আর্টস্-এ প্রথম পরীক্ষা] পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রাকৃতিক ও পদার্থের বিজ্ঞানের মান উন্নত করা হোক।" হাওয়েল লিখলেন যে, সম্ভবতঃ বর্তমানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পদার্থের বিজ্ঞান রাখা হবে না, কিন্তু এফ. এ. পরীক্ষায় মানসিক বিজ্ঞানের বদলে অজৈব রসায়নের কিছু অংশ থাকবে ও পরীক্ষামূলক গতিবিদ্যার এক পাঠক্রম চালু করা হবে। এফ. এ. পরীক্ষার পরে চারটি বিষয়-সমষ্টির একটি নিতে হবে: (১) আলোকতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, তাপবিদ্যা, চুম্বকতত্ত্ব, বিদ্যুৎতত্ত্ব, (২) সাধারণ শারীরবৃত্ত, পশু শারীরবৃত্ত, প্রাণী-

বিজ্ঞান; (৩) সাধারণ শারীরবৃত্ত, শল্য বৃত্তান্ত, উদ্ভিদ বিজ্ঞান; (৪) ভূতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, ভৌতিক ভূগোল। গবেষণার প্রয়োজন না থাকায় বৈজ্ঞানিক তৈরীর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, কিন্তু শিক্ষা আর কেবল উচ্চশ্রেণীর মগজ ধোলাইয়ের জন্য চলছিলো না। আরো কার্যকর ঔপনিবেশিক শোষণের নিম্ন কাঠামে তৈরীর জন্য একদিকে যেমন প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষার উপর জোর পড়লো, অন্যদিকে তেমন বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্ব বাড়ানো ও তাকে আরো নিয়মমাফিক ও বিধিবদ্ধ করার উপরে দৃষ্টি পড়লো। হাওয়েল সরাসরি আশা প্রকাশ করলেন[৬] যে পদার্থের বিজ্ঞানশিক্ষা শিল্পের জন্য দরকারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রয়োজনে সক্ষম হবে।

কিন্তু উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধগুলি এবার প্রকাশ পেতে শুরু করলো। বৃটিশেরা প্রাক্তন শাসক ও ফড়ে, উঠতি পুঁজিপতিদের সন্তানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা চালু করেছিলো বশংবদ বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এই নীতির পরিণতি হিসেবেই চালু হ'ল এদের মধ্যে থেকে নির্ভরযোগ্য আমলা তৈরীর প্রক্রিয়া। উচ্চশিক্ষার কাঠামো নির্মিত হ'ল বৃটিশদের নিজেদের দেশের উদার-নৈতিক উচ্চশিক্ষার নকলে। কিন্তু অন্যদিকে বৃটিশ উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো শাসকশ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে থেকেই সুশাসক তৈরীর এক অব্যাহত স্রোতের খাত কাটা, আর ভারতে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য দাঁড়ালো কিছু অধস্তন কর্মচারী তৈরী। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের খুব অল্প কয়েকজনের মধ্যেই উদার শিক্ষার প্রত্যাশিত ফল, জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তি, মনের ঔদার্য ও অনুসন্ধিৎসা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করা গেলো। মোটা ফল হ'ল দেশের সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের অবস্থা, ধ্যান-ধারণা ও আশা আকাংখা থেকে একেবারে বিযুক্ত কর্তাভজা এক অদ্ভুত কালা সাহেব গোষ্ঠির জন্ম। হাওয়েল লক্ষ্য করলেন: "বর্তমানে মনে হয় না বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের বস্তুগত স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার কোনো চেষ্টা করছে, আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি ঐ স্বার্থগুলি থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে, স্কুলগুলির দশাও তাই হবে।"[৬] অবশ্যই "দেশের বস্তুগত স্বার্থ" বলতে হাওয়েল বৃটিশ শাসকদের স্বার্থকেই বুঝেছেন, কিন্তু এটিও যেমন পরিপাটীভাবে রক্ষিত হচ্ছিলো না, সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বিযুক্তিও ছিল পরিপূর্ণ।

১৮৮৬ সালের সমাবর্তনে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মেইন সাহেব নামে একজন উপাচার্য বললেন যে, লর্ড ক্যানিং ইংরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এক অভিজাত প্রতিষ্ঠান বানাতে চেয়েছিলেন, যার শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে সন্তান না

গেলে ভারতের অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর কোনো সদস্যই মনে করবে না যে সে মর্যাদা অনুযায়ী শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সীমিত লক্ষ্য চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। মেইন বিলাপ করলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণের প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে। মেইন বললেন,[৬] "আমার তো সন্দেহ হয় ভারতে বৃটিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত বা বৃটিশ সরকারের সঙ্গে যুক্ত আর এমন কিছু আছে কিনা যা কলকাতার কিছুটা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ সংসারে (কলকাতা) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো আগ্রহের উদ্রেক করে।" ক্যানিং এমন বংশবদ বুদ্ধিজীবী চেয়েছিলেন যাদের শ্রেণী উৎস হবে অভিজাত এবং যারা অভিজাতসুলভ শিক্ষা পেয়ে মেকলের স্বপ্ন সার্থক করে ভারতীয় রক্ত ও বর্ণ নিয়ে ইংরাজ মানসিকতার নকল করে ভারতসম্রাজ্ঞীর সেবা করে যাবে। সিপাহীবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে সে যাবে না! কিন্তু অধস্তন চাকুরীর জন্য ডিগ্রীর ছাপ দেওয়ার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্যানিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎকে কল্পনা করেন নি। কিন্তু আমলা তৈরীর বীজাণুও তো সচেতন ভাবেই, ইচ্ছাপূর্বকই শিক্ষাব্যবস্থায় বৃটিশ শাসক নিজের প্রয়োজনে ঢুকালো। হয়তো তারা একটা স্তরের নীচে মড়ককে আটকাতে পারবে ভেবেছিলো, কিন্তু রোগের সম্ভাব্য তেজ তাদের হিসাবে ছিলো না।

মণ্টিথ ১৮৬৫-৬৬ সালেই লক্ষ্য করেছিলেন:[৬] "বাংলার মতো ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে উচ্চতর শিক্ষার অর্থমূল্য (money value) এতো বেশি চোখে পড়ে না।" হাওয়েল তাঁর নোটে[৭] একটু শ্লেষের সঙ্গে লিখলেন: "বাস্তবিকই কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না যে, বাংলার যে সব অধিবাসী তাদের হাতের কাছের সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে, তাদের জন্য খোলা রয়েছে আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে অর্থকরী ও মর্যাদার এক ভবিষ্যৎ; তাই "ভালো চাকুরীর ভাষা"টির জ্ঞানসমেত উচ্চতর শিক্ষার এক প্রতিষ্ঠিত বাজার দর এবং ভালো চাহিদা আছে।" স্কুলব্যবস্থার ফলও অনুরূপই হ'ল। বাংলায় স্কুল উন্নয়নের সরকারী কমিটি লিখলেন "সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলির এক বড়ো অংশের কেবল ক্ষমতা রয়েছে তাদেরই প্রয়োজন মেটাতে, শুধু যারা সস্তায়, ঘর না ছেড়ে নিম্ন পর্যায়ের কেরাণী, নকল নবিস, বিক্রেতা ইত্যাদি বলবার জন্য ঠিক যতটুকু ইংরাজী লাগে ততটুকুই শিখতে চায়, তার একতিলও বেশি নয়।"[৬] D.P.I. লিখলেন: "নিজেদের সন্তানদের আমাদের ভাষার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর উদ্দেশ্যটির জন্যই একমাত্র

বলতে গেলে মানুষ পয়সা খরচ করতে রাজী। এর জন্য তারা এমন খরচও করবে যা তাদের সাধ্যের সঙ্গে আদৌ মানানসই বলে মনে হবে না।"[৬]

দেশের চিন্তাশীল লোকজনের মধ্যেও চালু শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জমা হয়েছিলো। বিজ্ঞানাচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখাগুলি থেকে সেই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখার আদর অধুনা বড়ো একটা নেই। তাই উদ্ধৃতিগুলি দীর্ঘই রাখা হয়েছে। এই সময় বিজ্ঞান নিয়ে বেশ একটু সাড়াই পড়ে গিয়েছিলো। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার সাফল্য বৃটিশ শিক্ষাধিকারী আমলাদের বাঁধা গণ্ডী পেরিয়ে খোদ বিলাতেই সমাদর পেয়েছিলো। বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ-সঞ্চার মহেন্দ্রলাল সরকারকে উদ্বুদ্ধ করলো ভারতীয় পরিচালনায় স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানচর্চার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা সমিতি (যাদবপুরের 'এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে'র পূর্বসূরী) স্থাপনে। অবশ্য এই সাড়ার পিছনে যে কোনো দীর্ঘস্থায়ী চালিকাশক্তি কাজ করছে না, এই উৎসাহ যে ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য, তা রামেন্দ্রসুন্দরের নজর এড়াতে পারে নি।

১৮৯৯ সালে তিনি লিখলেন, "আমাদের বিদ্যালয় সংযুক্ত ল্যাবরেটরিগুলিতে যে সকল ছাত্র অতি মনোযোগসহকারে ব্যাটারি ও থার্মোমিটর লইয়া নাড়াচাড়া করে, পাঁচ বৎসর পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বৈঠকখানার আলমারিগুলি পুরাতন পুরাতন ল-রিপোর্টের সারিতে সুশোভিত হইয়াছে, এবং চাপকানের উপর চাদর ও মস্তকে শামলা পরিধান করিয়া তাঁহারা নবীন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন।" ('সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার', সাহিত্য, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬)।[৮]

বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে এই অবস্থা তাঁকে বেদনা দিতো। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, ডিগ্রির জন্য বিজ্ঞান মুখস্থ করলে বিজ্ঞানচর্চারও কোনো ভবিষ্যৎ নেই আর বিজ্ঞাননির্ভর মানকিকতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও কম। এমন কি এ ধরণের বিজ্ঞানশিক্ষা কুসংস্কারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কুসংস্কারকে বাড়াতেও সক্ষম হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি শ্লেষভরে বলেছেন যে, এ অসম্ভব নয় যে, জোয়ার ভাঁটার উপর চাঁদের প্রভাবের কথা জেনে বিজ্ঞানের ছাত্রের গ্রহশান্তির উপর নির্ভরতাই বাড়বে। ১৯১০ সালেও তিনি লিখলেন: "ছাত্রেরা দিনের পর দিন পলিটিকাল ইকনমিশাস্ত্রে লেকচার

শুনিতেছে, কিন্তু পলিটিকাল ইকনমির সমুদয় সিদ্ধান্ত যদি মিথ্যা হয়, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষোভের হেতু নাই।

"ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া লেবরেটরিতে দাঁড়াইয়া তাহারা কষ্টিক লোশন মধ্যে রূপার আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু রূপা না থাকিয়া যদি সীসা থাকিত, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না; পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক আছে কি না, এই লইয়া তাহারা অনেক বিচার-বিতর্ক মুখস্থ করিতেছে; কিন্তু ভূকেন্দ্রে চুম্বক না থাকিয়া একটা ভল্লুক থাকিলেও তাহারা কিছুমাত্র বিস্মিত হইত না। তাহারা চায় কেবল একখানা ডিপ্লোমা যাহার বলে ভবিষ্যতে মুনসেফী বা কেরাণীত্ব ঘটিবে, যেখানে চুম্বক বা ভল্লুক উভয়েরই সমান মর্যাদা; নিতান্ত দায়ে পড়িয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহিত পলিটিকাল ইকনমির লেকচার শোনার অত্যাচার সহ্য করিতেছে" ('যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী', মানসী, আশ্বিন ১৩১৭)।[৮] রামেন্দ্রসুন্দরের সমালোচনার সারবত্তা বোধহয় আজও প্রাসঙ্গিক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের ধারায় আলাদা বি. এস. সি ডিগ্রী প্রবর্তন করলেন, রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন: "চল্লিশ বৎসর হইল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ দেশের উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত এদেশের লোকের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্তি জন্মিল না। মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনব্যাপী উদ্যম এখন কেবল সাংবাৎসরিক নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত হইতেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য নতুন উপাধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন হইতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নামের পশ্চাতে নয়নানন্দকর অভিনব উপাধি সংযোগের অবসর পাইবে। কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্তি আমাদের ছাত্র সম্প্রদায় মধ্যে কতদূর বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে অনেকের মনে গভীর সংশয় রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় নূতন নূতন উপাধির প্রলোভন সামনে ধরিতে পারেন, এবং বড় বড় কেতাবের তালিকা দ্বারা তাঁহাদের ক্যালেণ্ডারের পাতা সুশোভিত করিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নাই। বিজ্ঞান শিখিতে যে যন্ত্র তন্ত্র কারখানা আবশ্যক তাহা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাইতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ক্ষমতা নাই। গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ। লর্ড কেলবিনের ন্যায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি স্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গভর্ণমেণ্ট অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই

প্রেসিডেন্সী কলেজেই যে কিছু সামান্য উপকরণ আছে, তাহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক খেলিবার অবসর পাইলে খেলিতে না পারে এমন নহে। এই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই দুইজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিদের নাম ভারতবর্ষের চতুঃসীমা ছাড়াইয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত মফঃস্বলের কলেজগুলির ও আমাদের দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত কলেজগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, সেখানে বিজ্ঞান শিখাইবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। এইরূপ মশলা লইয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর ফল যে স্বভাবসঙ্গত হইবে তাহার আশা একরূপ নাই বলিলেই চলে। উনানে আগুন ধরাইবার জন্য বাতাস দিতে ও ফু দিতে হয়, কিন্তু বাতাস দিবার পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণ ইন্ধন যোগান আবশ্যক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গণ্ডদ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া প্রাণপণে ফুৎকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত ইন্ধনের যেরূপ ঐকান্তিক অভাব, তাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যথেষ্ট গণ্ডপীড়া হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু দেশের মধ্যে বিজ্ঞানাগ্নি সন্দীপিত হইবার আশা সুদূর পরাহত" (ঐ)।

ইতিমধ্যে কারিগরী শিক্ষার বিস্তার আর এক মোহের জাল সৃষ্টি করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টভাবেই বুঝলেন যে, জাতীয় প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই শিক্ষা সংগঠিত করা সম্ভব হবে না। কারণও তিনি ব্যক্ত করলেন সোজাসুজি ঢঙে। তিনি লিখলেন: "বিজ্ঞান শিক্ষার সহিত নিকট সম্পর্ক-বিশিষ্ট আর একরকম শিক্ষা আছে, তাহাকে টেকনিক্যাল শিক্ষা বা হাতে কলমে শিক্ষা বলে। অনেকের মুখে আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই টেকনিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলেই দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। হাতে-কলমে শিক্ষা যে জাতীয় উন্নতির জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নিতান্ত নির্বোধ ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই শিক্ষার জন্য যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি বক্তৃতা করেন ও হা-হুতাশ করেন, তাঁহারা এ পর্যন্ত টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রণালীটা কিরূপ হইবে, তাহার একটা পরিষ্কার উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। অনেকের মতে ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভাকে দেশলাইয়ের বা সাবানের কারখানাতে পরিণত করিলেই আমাদের টেকনিক্যাল শিক্ষার একরকম বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। বঙ্গদেশের অদৃষ্টে নানাবিধ বিধিবিড়ম্বনা ঘটিয়াছে; বিজ্ঞান সভার অদৃষ্টেও এইরূপ

শোচনীয় পরিণতি আছে কি না জানি না ; তবে আশা করি সেই পরিণতি যেন বিলম্বিত হয়।.....

"ইউরোপের কলকারখানার সহিত আমাদের সনাতন প্রণালী এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সেইজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হাতে কলমে শিক্ষার যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা আমাদের দেশে অদ্যাপি বর্তমান নাই। দেশের মধ্যে কলকারখানা নাই ; দেশের লোক অনভিজ্ঞতাবশতঃ নতুন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ ; মূলধনের একান্ত অভাব ; যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহারা ত বিশ্বাস আর সাহসের অভাবে সেই ধনের ব্যবসায়ে নিয়োগে কুণ্ঠিত। বৈদেশিক রাজা দেশীয়দের সাহায্য করিতে একেবারে পরাঙ্মুখ। এরূপ স্থলে হাতে কলমে শিক্ষার অত্যন্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই এবং দেশের ত্রিশকোটি অধিবাসীর ষাটিকোটি খান হাতও বর্তমান রহিয়াছে, কেবল কলমের অভাবে শিক্ষাটা ঘটিয়া উঠিতেছে না" (ঐ)।

কার্জন পর্ব

ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার শিক্ষার হাল বোঝার জন্য কমিশন নিয়োগ প্রথা চালু করলেন, ১৮৮২তে একটি শিক্ষা কমিশন বসলো। তারপর সরকার নিয়োগ করলেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। ১৯০২ সালে কমিশন রিপোর্ট পেশ করলো। ১৯০৪ সালে মার্চে লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করলেন। উচ্চশিক্ষা সংকোচনের এক নির্দিষ্ট প্রবণতা দেখা গেলো। উচ্চশিক্ষার ব্যয় বাড়ানো হ'ল। প্রবেশিকা পরীক্ষাতে ইংরাজীর পাশমার্ক একশ'তে ৩৩ থেকে ৩৭ করে দেওয়া হ'ল। শিক্ষায় সরাসরি বেসরকারী, দেশী প্রভাব কমানোর নীতি দেখা গেল। সংকারী সাহায্য, সরকারী তদারক, সরকারী অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস, বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষায় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা চললো। বেসরকারী কলেজ-গুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠলো, কেননা পরীক্ষার মান উন্নয়নের ফলে আর কিছু ঘটুক না ঘটুক, ছাত্র সংখ্যা তো হ্রাস পাবেই। এতোদিন বাংলাদেশের বাবুদের শিক্ষা লালিত হচ্ছিলো বৃটিশ সরকারের নিজস্ব পেটোয়া ও আমলা তৈরীর প্রয়োজনে। শিক্ষিত বাবুর সংখ্যা সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ছাপিয়ে উঠেছে বেশ

কিছুদিন যাবৎ। সরকারও চিন্তিত 'শিল্পায়নের' নিম্নকাঠামো বানানোর উপযোগী শিক্ষা সাধারণ জনতার মধ্যে চালু করার জন্য, বাবু তৈরীর যন্ত্র তো চলছেই, এটি নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা কম। কার্জন সাহস করে কাঁচি চালাতে লাগলেন। আবার শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর এক অন্যতম কারণ ছিলো স্বাদেশিকতা ও জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি খর্ব করা। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। কমিশনের এক সদস্য সার গুরুদাস ব্যানার্জী রিপোর্টে ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করালেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এদেশীয় ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাসের বিরুদ্ধে।

অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ বললেন: "প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের শতকরা ৮০/৯০ জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে। সুতরাং আমাদের ছেলেদের এক বিরাট অংশ আর কোনোদিনই ঢুকতে পারবে না কলেজের হলে, জানবে না উচ্চশিক্ষা কাকে বলে। প্রতি বছর এদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। আমাদের দেশ ভরে যাবে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীভুক্ত হাজার হাজার অর্ধশিক্ষিত লোকে। এরা হয়ে উঠবে সমাজের হয় অপদার্থ নয় বিপজ্জনক সদস্য।"

উপস্থিত স্বার্থহানি ছাড়াও মৌলিক কিছু সমস্যা প্রসঙ্গে ভারতীয় সমালোচকেরা কলম ধরলেন। এইরকম একটি বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সর্বস্বতা। 'ডন' সোসাইটির সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মুখার্জি 'ডন' পত্রিকায় লিখলেন,[৯] (এপ্রিল-জুন, ১৯০২): "সন্দেহই নেই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুখস্থ বিদ্যায় উৎসাহ দিয়েছেন। এই ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন সম্ভব···প্রশ্ন করা হয় ছাত্রের নিজস্ব পড়াশুনা বা নিরীক্ষণ, সমালোচনা বা সাধারণীকরণের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য নয়, বরং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রশ্নের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র নির্ধারিত বা প্রস্তাবিত বইগুলির আক্ষরিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বা ঐ বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতির বহর বিচার। ভারতীয় কলেজশিক্ষার উপর এই ধরণের পরীক্ষাব্যবস্থার কী প্রতিক্রিয়া পড়ে তা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় ব্যবস্থা শেখায় ও পুরস্কৃত করে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়কে; কেরাণীগিরির যেমনভাবে অনুশীলন করায় তার [ব্যবহারিক ফলের] প্রশংসাই করতে হয় (যদিও এ বিষয়ে ভিন্নমত থাকতে বাধ্য), কিন্তু পাঁচবছরের শিক্ষাক্রমের পরেও স্বকীয় চিন্তা ও কাজের ব্যাপারে ছাত্রকে ততটাই অসহায় রেখে দেয়, যতটা সে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশের দিনে।···পাঠদানকারী (teaching) বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিই আনতো এক

বিপ্লব, যদি অর্থের দিক থেকে তা অসম্ভব নাও হতো; কিন্তু উপযুক্ত অবস্থায় যে এ ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবন সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ অল্পই।" ১৯০২ সালের সমাবর্তনে লর্ড কার্জন তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমরা সকলেই জানি যে, এ দেশে শিক্ষার চালু ধারার এক বিরাট দোষ, জ্ঞান চর্চা স্মৃতিনির্ভর, মননির্ভর নয়।' এর উত্তরে উল্লেখিত প্রবন্ধটিতে সতীশচন্দ্র লিখলেন: "এর কারণ কী? এর কারণ ভারতীয় কলেজগুলি অক্সফোর্ড কিংবা কেম্‌ব্রুজের মতো আসল কলেজ নয়, অর্থাৎ শিক্ষা বা অনুশীলনের প্রতিষ্ঠান নয়। তাদের কাজ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থী তৈরী করা। যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়, কলেজগুলি তাসের ঘরের মতো পড়ে যাবে; তাদের অস্তিত্বের কারণটিই উঠে যাবে যে।" এর আগেই, ১৮৯৮ সালে 'ডন'-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় সতীশচন্দ্র লিখেছিলেন,[৯] "জ্ঞানীগুণীজনের উপস্থিতির মাপকাঠিতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অকৃতকার্য, কারণ, এগুলি পরীক্ষার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার নয়। ফলে বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতি বিভাগে স্বকীয় গবেষণার পীঠে সমস্ত সময় ও শক্তি অর্পণ করেছেন বিদ্বজ্জনের এমন কোনো গোষ্ঠিকেই এরা নিজেদের ছায়ায় টেনে আনতে পারেনি।"

রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন: "কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলিকে বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে বলেন নাই; পরীক্ষা কার্যকেই আরও কঠিন করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে যথোচিত অর্থ সাহায্য করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে বলেন নাই; তৎপ্রতি শিক্ষাভার অর্পণের কথা অতি সন্তর্পণে তুলিয়াছেন; প্রতিভাবান অধ্যাপক সংগ্রহ করিবার কথা তুলেন নাই, শিক্ষক ছাঁকিয়া লইবার জন্য নূতন একটি পরীক্ষা প্রবর্তনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন; দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে নগরাবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তোলেন নাই, দেশীয় ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসাদি শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা দিতে সাহস না করিয়া প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গোড়ায় গলদ রাখিয়া দিয়াছেন।...আমাদের টাকাও নাই, টাকা দিবার লোকও নাই। ইউনিভার্সিটি কমিশন যেখানে টাকার কথা উঠিয়াছে, সেইখানেই চোখে সরিষার ফুল দেখিয়াছেন...Teaching University কি পদার্থ, কমিশন না জানেন এমন নহে; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কাছে তাহার ব্যয় চাহিতে সাহস করেন নাই। কমিশন বলিয়াছেন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি কালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হইবে, কালে আপনার

অধ্যাপক নিযুক্ত করিবে, পুস্তকালয় রাখিবে, যন্ত্রাগার বসাইবে ইত্যাদি," কিন্তু খরচ যোগাবার নির্দিষ্ট কোন চিন্তা রামেন্দ্রসুন্দর দেখতে পেলেন না। যেটুকু উল্লেখ এ বিষয়ে দেখলেন—রাজা মহারাজাদের উপাধি দিয়ে ফেলো সাজিয়ে টাকা হাতানো আর প্রাইভেট কলেজগুলির উপর চাপ, কোনটিই তাঁর খুব বাস্তবসম্মত মনে হ'ল না। সর্বোপরি, "আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি গভর্ণমেণ্টের অধীন···যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ছিলো তাও বুঝি থাকে না; অথচ গভর্ণমেণ্ট আশা করেন বাহিরের বদান্যতায় বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হইবে।" ('অরণ্যে রোদন', সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩০৯)।[৮]

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোড়ন বিলাতেও পৌঁছালো। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর বেশী জোর দেওয়ার জন্য হার্বার্ট স্পেন্সার ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কশাঘাত করে লিখলেন[৯]: যে ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার যোগ্যতা পরীক্ষা হয় বিদেশী এক ভাষার বিশেষ বিশেষ পরিভাষা, চলিত শব্দ, প্রাকৃত শব্দ, এমনকি অধুনালুপ্ত প্রাকৃত শব্দের উপর দখলের ভিত্তিতে, সেই ব্যবস্থায় ছাত্রদের অকৃত-কার্যতা কেবল শিক্ষকদের যোগ্যতার অভাবই প্রমাণ করে।

এ ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার অনুপস্থিতিও সমালোচকদের বিশেষ বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিলো। ভারতীয় চিন্তাবিদ মহলে এই প্রশ্নটি খুবই উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলো, এই প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিলো নবজাত দেশাত্মবোধের কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ। ১৮৯৯'এর সেপ্টেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় সতীশচন্দ্র লিখলেন,[৯] সরকারের শিক্ষানীতি এতদিন ভারতীয়দের কেবল শিখিয়েছে, এক সরু সড়ক ধরে এগোতে—সরকারী দাক্ষিণ্য বা পেশাদারী প্রতিষ্ঠা। পূর্বের বা পশ্চিমের কোনো চিন্তাধারার উচ্চতর মার্গে তাঁদের প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়নি। বিবর্তনের পথে জাতীয় অগ্রগতির জন্য, সতীশচন্দ্র বললেন, পূর্বের উচ্চতর চিন্তা ও বিদ্যার চর্চা পশ্চিমের উচ্চতর সংস্কৃতির চর্চার চেয়ে ন্যূন নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার পক্ষে এ্যানি বেসান্তের বহুখ্যাত ও বিতর্কিত ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাতও এই সময় থেকে। এমনকি ইণ্ডিয়া অফিস থেকে সার জর্জ বার্ডউড সতীশচন্দ্র ও 'ডন' পত্রিকার কাছে এই বিষয়ে তাঁর সমর্থন জানিয়ে চিঠি লিখলেন। চালু শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষের আর এক কারণ ছিলো নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

এ ছাড়া ছিলো 'অত্যুৎপাদন'-এর সমস্যা। 'বাবু'র সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে বৃটিশ শাসকদের যেমন অসুবিধা হচ্ছিলো চাকুরী দেওয়ার, 'বাবু'দেরও উপর একই

সংকট চেপে বসছিলো। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের 'ডন'-এ সতীশচন্দ্র আরো লিখলেন[৯]: "ব্যবসায়িক দিক থেকে এই [ব্যবস্থা] স্নাতক ও প্রাক-স্নাতক দুই ধরণের ছাত্রেরই বিপুল গরিষ্ঠাংশের কাছে অপ্রিয়। সাহিত্য বা আধা-বিজ্ঞান ভিত্তিক অল্পবিদ্যার সম্বল নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য কিছু উপায় করতেও তারা খুব কষ্টে পড়তো।" ভারতে লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদপ্রেরক লিখলেন,[৯]: "জীবন ধারণের ব্যয় দ্রুত বাড়ার ফলে পুরানো কেরানীপ্রসবিনী জাত (caste) গুলির চেয়ে অন্য কোনো বর্গ বেশী মার খায়নি। এই জাতগুলি থেকেই আমাদের স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও ছাত্ররা উদ্ভুত।...যেখানে কুশলী কারিগর এমন কি অকুশলী শ্রমিক অনেক সময় বারো আনা থেকে এক টাকা দিনে উপায় করতে পারে, সেখানে যে যুবক উচ্চশিক্ষার পুরো পাঠক্রম সম্পূর্ণ করতে গিয়ে নিজে ভুগেছে ও পরিবারকে ভুগিয়েছে, সে ত্রিশ বা এমন কি বিশ টাকা বেতনের জন্যও অনেক সময় বৃথা ঘুরে বেড়ায়।"

এমন অবস্থায় এলো বঙ্গভঙ্গ এবং 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' আন্দোলন। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়লো এই আন্দোলনে। বাংলা সরকারের অস্থায়ী প্রধান সচিব কার্লাইল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ বন্ধ করানোর জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের এক সারকুলার মারফৎ নির্দেশ দিলেন। স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই নিষেধাজ্ঞা পালন করতে বাধ্য করানোর জন্য কুখ্যাত এই 'কার্লাইল সার্কুলার' সরকারী অনুদান বন্ধ, বৃত্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি প্রত্যাহার আদি হাতিয়ার ব্যবহার করতে উপদেশ দিলো। বিভিন্ন স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হ'ল।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনার চিন্তা হচ্ছিলো। সার সৈয়দ আমেদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আলিগড় কলেজকে স্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টা চলছিলো। এ্যানি বেসান্ত হিন্দুদের আহ্বান করছিলেন বারাণসীতে এক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য। বাংলার কিছু বড়ো জমিদারও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিদ্যালয় গঠনের সংকল্প করছিলেন। 'কার্লাইল সার্কুলার' ও পরবর্তী দমন-পীড়ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে জাতীয় স্কুল কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের চিন্তা জরুরী করে তুললো।

রংপুর জিলা স্কুলের ৮৬জন ছাত্র ও রংপুর কারিগরী শিক্ষালয়ের ৩৬জন ছাত্রসহ মফঃস্বলের অনেক ছাত্রই 'কার্লাইল সারকুলার'এর বলি হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বয়কটেরও এক আবেগ এসেছিলো। ১৯০৫ সালের ৮ই নভেম্বর রংপুরে জাতীয় স্কুল স্থাপিত হ'ল। বিতাড়িত ও বয়কটকামী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী ১৩ই নভেম্বর 'বাংলা জমি-মালিক সমিতির' ঘরে এক সভা ডাকলেন। সভায় এক জাতীয় শিক্ষা-পর্ষৎ গঠন করার সিদ্ধান্ত হ'ল। ইতিমধ্যেই সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরবর্তীকালে ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি পর্ষতের হাতে তুলে দেন।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তথাকথিত 'নরম' ও 'গরম' দুই পন্থার উপস্থিতি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে তফাতের স্বরূপ নিয়ে পরে আলোচনা হবে। কিন্তু প্রথমেই এঁদের সংঘাতের ফলে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে সকলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলেন না। 'গরম' পন্থীদের মধ্যে ছিলেন গুরুদাস ব্যানার্জী, সতীশচন্দ্র মুখার্জি, সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আশুতোষ চৌধুরী। এঁরা সম্পূর্ণ জাতীয় নিয়ন্ত্রণে স্বাধীন শিক্ষাক্রমের প্রবক্তা ছিলেন; সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যা মিলিয়ে এই শিক্ষা হবে 'ত্রিমাত্রিক'। অপরদিকে তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নীলরতন সরকার, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও অন্যান্যরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে বর্জন না করে, তার প্রয়োগবিমুখ, সাহিত্য-ঘেঁষা ঝোঁকের কুফল কাটানোর জন্য জাতীয় নিয়ন্ত্রণে কেবল কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন।

দুই পক্ষ একই দিনে, ১লা জুন, ১৯০৬ তারিখে দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রী করালেন: 'জাতীয় শিক্ষা-পর্ষৎ' ও 'কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি'। দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতি হলেন রাসবিহারী ঘোষ ও অনেকেই দুই প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য ছিলেন। পর্ষৎ প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল, সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌স্টিটিউট।

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ঘোষ, সুপারিণ্টেডেণ্ট হলেন সতীশ মুখার্জী। জাতীয় কলেজে মাধ্যমিক বিজ্ঞান পাঠক্রমে গবেষণাগারে

কাজসহ পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন পড়ানো হ'ত। এছাড়া চারটি বিষয়-সমষ্টি থেকে যে কোনো একটি নিতে হ'ত: (ক) অঙ্ক, অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ অনুশীলন; (খ) জীবনবিজ্ঞান ও শারীরবৃত্ত; (গ) ভূতত্ত্ব ও জীবনবিজ্ঞান; (ঘ) কৃষি ও জীবনবিজ্ঞান। শেষ তিনটি বিষয়সমষ্টিতেও গবেষণাগারে কাজ চলতো। এই পাঠক্রমের শেষে ছাত্রদের এফ. এ. বা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের সমতুল্য ধরা হ'ত। মাধ্যমিক কারিগরী পাঠক্রমে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্ক ও অঙ্কনের সাধারণ পাঠক্রমের পাশাপাশি বিশেষ পাঠক্রম ছিলো মেশিন ড্রয়িং, গতিবিদ্যা, স্টিম এঞ্জিন, বয়লার ও প্রাইম মুভার, হাতের ও মেশিনের জন্য উপযোগী যন্ত্রপাতি, নক্সা তৈরী, পিতল ঢালাই, কামারশালার কাজ, টার্নিং ও ফিটিংয়ের বিষয়গুলিতে। আগে নিয়মিত শিক্ষা পায়নি, এমন ছাত্রদেরও এই পাঠক্রমে শিক্ষানবিশ হিসাবে নেওয়ার বন্দোবস্ত ছিলো।

কলেজ বিভাগে বিজ্ঞান পাঠক্রমে তিনটি বিষয়সমষ্টি ছিলো: (ক) বিশুদ্ধ অঙ্ক, ও অপ্রধান বিষয় হিসাবে মিশ্র অঙ্ক, অথবা মিশ্র অঙ্ক, ও অপ্রধান বিষয় হিসাবে বিশুদ্ধ অঙ্ক; (খ) পদার্থবিদ্যা এবং অপ্রধান বিষয় হিসাবে রসায়ন ও অঙ্ক; (গ) রসায়ন এবং অপ্রধান বিষয় হিসাবে পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক। এ ছাড়া তিনটি পাঠক্রম ছিলো যন্ত্রশিল্পের—মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং, ফলিত রসায়ন ও বৈজ্ঞানিক ভেষজবিদ্যা।

সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হ'ত দেশীয় ভাষাতে। মাধ্যমিক স্তরের শেষের দুই বছর ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি'র ত্রিমাত্রাই আবশ্যক ছিলো। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আবশ্যক ছিলো ইংরাজী। শরীর গঠন সম্পর্কে শিক্ষা এবং হিন্দু ছাত্রদের নীতি ও ধর্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিলো। এই শেষ বিষয়টির জন্য ব্রজেন্দ্র কিশোর এক আলাদা তহবিলের ব্যবস্থা করেন। হিন্দী ও মারাঠী পড়ায় উৎসাহ দেওয়া হ'ত। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, কলা ও বিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণা ও এই উদ্দেশ্যের সাহায্যার্থে পালি ও সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এ ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন পাঠে সহায়তা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চায় পাশ্চাত্য প্রণালীর সঙ্গে পরিচিতির জন্য ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

কারিগরী বিভাগের একটি নির্মাণ-শাখাও ছিলো। চল্লিশজন কারিগর এই শাখায় নিযুক্ত ছিলেন। সন্তোষজনকভাবে বাইরের অর্ডার সরবরাহ করার

জন্য এই শাখার সুনাম হয়। বিজ্ঞান বিভাগেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার একটি নির্মাণ-শাখা ছিলো।

রাধাকুমুদ মুখার্জি ভারতীয় অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্ব নিলেন। বিনয়কুমার সরকার শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করলেন। সখারাম গণেশ দেওস্কর ভারতের ইতিহাসের মারাঠা-পর্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ধর্মানন্দ কোসাম্বি ভার নিলেন বৌদ্ধ দর্শনের। পদার্থবিদ্যার দায়িত্বে রইলেন জগদিন্দু রায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার তাঁকে সাহায্য করতেন। জীবনবিজ্ঞান বিভাগ গড়ে উঠলো ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক ও অন্যান্যদের পরামর্শ অনুসারে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার অধিকর্তা। কারিগরী বিভাগের দায়িত্বে রইলেন বি. বি. রাণাডে। বোম্বাই'র ভিক্টোরিয়া জুবিলী কারিগরী ইন্‌স্টিটিউট থেকে পাশ ইঞ্জিনীয়ার ভি. কে. পরাঞ্জপে যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

কারিগরী ইন্‌স্টিটিউটের ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগে ফিটিং, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক কাজকর্ম, রঙের কাজ, ছুতারের কাজ, লিথোগ্রাফি, সাবান তৈরী, চামড়া ট্যানিং, ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং আদি বিভাগে অনুশীলন করানো হত। অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরাজীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মাধ্যমিক বিভাগে ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠক্রমের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক বিষয়গুলিতে এবং রসায়ন পাঠক্রমের অন্তর্গত চীনামাটির কাজ, রঙের কাজ, সাবান তৈরী, চামড়া ট্যানিং ও কারিগরী বিষয়গুলিতে তত্ত্বগত ও প্রয়োগভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। প্রথমেই উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট প্রবেশ করেনি। এই প্রতিষ্ঠানেরও একটি নির্মাণ বিভাগ ছিলো, যেখানে ছাত্ররা বিভিন্ন বস্তু তৈরী করতো এবং মোটরগাড়ি, ছাপার যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র ও মেশিন সারাইয়ের কাজ করতো। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন প্রমথনাথ বসু।

১৯০৮ সাল শেষ হতে না হতেই সারা বাংলার দেড়শ' প্রাথমিক ও ইণ্টার-মিডিয়েট স্কুল পর্যতের সঙ্গে যুক্ত হ'ল। কিছু কিছু স্কুলে গবেষণাগার ও ওয়ার্ক-শপের ব্যবস্থাও হ'ল। জাতীয় স্কুলগুলিতে ত্রিমাত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য পর্ষৎ কিছু কিছু অনুদানের সংস্থান করলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন তিলক, লাজপৎ রায় ও অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো। মহারাষ্ট্রের পুণায় 'মহারাষ্ট্র বিদ্যালয়' ও পুণা জেলার আর এক জায়গায় 'সমর্থ বিদ্যালয়', এই

দু'টি জাতীয় স্কুল স্থাপিত হ'ল। বেরারের অমরাওটি'তে 'বিদ্যাগৃহ' ও 'ইয়েওটমল'এ 'ইয়েওটমল জাতীয় স্কুল' স্থাপিত হ'ল। 'অন্ধ্র জাতীয় বিদ্যা পর্ষৎ' স্থাপিত হ'ল অন্ধ্রের মসুলিপত্তনে। রাজামুন্দ্রিতে মাধ্যমিক জাতীয় স্কুল ও মসুলিপত্তনে 'অন্ধ্র কলাশালা' কলেজ স্থাপিত হ'ল। এর প্রতিটি জায়গাতেই ত্রিমাত্রিক শিক্ষা ও শিক্ষার জাতীয় নিয়ন্ত্রণের আদর্শ তুলে ধরা হ'ল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। ১৮৯৮ সালেই সতীশচন্দ্র 'ডন' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখেছিলেন: "বিদেশী শিক্ষা অক্ষম হয়েছে আমাদের মধ্য থেকে স্বকীয়তায় ভাস্বর মানুষ তৈরী করতে। বিদেশী শিক্ষা আমাদের করতে পারেনি স্বনির্ভর, স্বাধীনচেতা, ত্যাগী বা দেশপ্রেমিক।··· আমরা কি করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবো যতদিন না ধ্বংসের মহাকাল আমাদের নির্বাপিত করে? চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যায় যে, এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উত্তরের জন্য আমরা অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি না। পাবনায় কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারী ১৯০৮) অরবিন্দ আশা প্রকাশ করলেন, জাতীয় স্কুলগুলি এমন সব কর্মী তৈরী করবে যারা সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে নিজেদের মগ্ন রাখবে এবং দেশকে গরিমার সেই শাশ্বত স্থানে নিয়ে যাবে, যে স্থান তার একদিন ছিলো সকল জাতির মধ্যে। অল্প পরেই পাবনা জেলা সম্মেলনে অরবিন্দ বললেন যে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও প্রণালী দুইই ত্রুটিপূর্ণ এবং এগুলির লক্ষ্য সরকারের মৎলব সাধন, দেশের প্রয়োজন মিটানো নয়। এই ব্যবস্থা মানুষ তৈরী করে না, সরকারী ও পেশাদারী কাজকর্মের জন্য কল বানায়। তিনি বললেন যে, শিক্ষার জাতীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিলো জাতি তৈরী। এই ব্যবস্থায় তৈরী করতে হবে এমন মানুষ, যাঁদের সমস্ত সাধনক্ষমতা (faculties) থাকবে অনুশীলিত, যাঁরা পূর্ণ হবেন দেশপ্রেমে, এবং মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক দিক থেকে যাঁরা সমকক্ষ হবেন যে কোনো জাতির মানুষের। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদীঘির গোলামখানা' আখ্যা দেন। "দাঁতে দাঁত চেপে বলতেন, 'ঐ গোলামখানা চুরমার করে ফেল'।"[১০]

কিন্তু বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে কার্যকর সংগ্রামে নামার কোনো কার্যক্রমের অংশ হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। ফলে একদিকে শিক্ষার

রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার ইচ্ছা, অপরদিকে ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা তৈরীর প্রচেষ্টা, এই দু'য়ের মধ্যেকার স্ববিরোধ প্রথম থেকে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে নানা সমস্যার জন্ম দিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত, আমরা দেখতে পাবো, জাতীয় শিক্ষাকে রূপান্তরিত করে জাতীয়তাবিরোধী শিক্ষায়। এই স্ববিরোধের ইতিহাস দেখা যাক।

প্রথমেই সমস্যা ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে। আশুতোষ চৌধুরীর আহ্বানে শিক্ষা-পর্ষৎ গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পাঁচদিন আগেই তিনি কলেজ স্কোয়ারে দশ হাজার ছাত্রের এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটিকে সমর্থন করেও বলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট না করে বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হয়েই দেশের কাজে আরো বড়ো অবদান রাখা যেতে পারে। এই সময় আবেগ ছিল তুঙ্গে; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., পি. আর. এস. ও অন্যান্য পাঠক্রমের পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করার জন্য টগবগ করে ফুটছিলেন। এই উত্তেজনাকে বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে চালনা করার উপযুক্ত পথ খোঁজা ও তৈরী করার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কর্ণধারেরা প্রথম থেকে চেষ্টা করতে থাকেন এই আবেগকে নিরাপদ খাতে বইয়ে দিয়ে শক্তিক্ষয় করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। পর্ষৎ যে সভাতে গঠিত হয়, সেই সভাতেই যে সব পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বয়কট করতে উদ্যত হয়েছিলেন তাঁদের এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন গুরুদাস ব্যানার্জী ও সমর্থন করেন রাসবিহারী ঘোষ। ১১ই মার্চ, ১৯০৬ তারিখে 'জমি-মালিক সমিতি'র ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শিক্ষা সম্মেলনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় যে, পর্ষতের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ জাতীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষাদান—"প্রচলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাগুলি **থেকে স্বতন্ত্রভাবে, এগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নয়**" (গুরুত্ব নির্দেশ মূলপাঠ অনুযায়ী)।[৯] অর্থাৎ পর্ষৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে গররাজী হলেন। হারাণচন্দ্র চাকলাদারের মতে এই কথাগুলি যোগ করেন সতীশচন্দ্র। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিনয়কুমার সরকার এই সংযোজনে গুরুদাসের হাত দেখেছেন। বিনয় সরকার বলেছেন যে, গুরুদাস চাননি যে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন, অথচ

তিনি একান্ত পৃথক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষাও চেয়েছিলেন।[৯] যে স্ববিরোধের কথা বলা হয়েছে, এখানে সেটি প্রকট।

এই স্ববিরোধের ক্রিয়াকে বৃটিশ সরকারও নিপুণ হাতে প্রভাবিত করতে থাকলেন। একদিকে সমস্ত 'গঠনমূলক' কাজকে তাঁরা উৎসাহিত করতে লাগলেন। ভুলে গেলে চলবে না যে, অনেক চেষ্টা করেও উচ্চ শ্রেণীগুলিকে নিজেদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করাতে সরকার সফল হন নি। সেদিক থেকে সরকারের উপর রাগে ভদ্রলোকেরা আপন অর্থ ব্যয় করে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বানাচ্ছেন, এতে সরকারেরই একটি নীতি কার্যকর হচ্ছিলো। 'গঠনমূলক' কাজ তাঁরা আপন নিয়ন্ত্রণে চালালেও, সরকারী নিয়ন্ত্রণের কার্জন-নীতি অনুসৃত না হলেও, সরকার বিব্রত বোধ করেন নি কাজটির 'গঠনমূলক' দিকটির ব্যাপারে। এই দিকটিকে অনায়াসে তাঁরা পরে নিজ নিয়ন্ত্রণে কেমন ভাবে নিয়ে আসেন তা'ও আমরা দেখবো। এই পরিপ্রেক্ষিত থাকার ফলে সার জর্জ বার্ডউডের মতো সাম্রাজ্যবাদী আমলাও শিক্ষা আন্দোলনকে, এমন কি আপন নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকেও উৎসাহ দিয়ে যেতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কলেজে তৈরী যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী পর্ষৎ মাঝে মাঝে করতেন। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক পল ব্রুহ্‌ল, কলকাতা ম্যুনিসিপাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সার চার্ল্‌স এ্যালেন, শিবপুর কলেজের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইঞ্জিনীয়ারিঙের অধ্যাপক এভারেট ও অন্যান্য সরকারী লোকজন প্রদর্শনীতে এসেছেন ও প্রশংসা করে গেছেন। কলেজ পরিদর্শন করে যান কীয়ের হার্ডি (বৃটিশ লেবার পার্টির এক নেতা) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেম্‌স্ সাহেব, ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের গ্রিফিথ সাহেব, বিখ্যাত পদার্থবিদ শুষ্টার ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার কামিন্স। যখন কেবল 'গঠনমূলক' কাজই চলছে, তখন ১৯০৯ সালে সাম্রাজ্যবাদী মতামতের বিশ্বস্ত পরিবেশক স্টেট্‌স্‌ম্যান, স্টেটিস্ট ও ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ সংবাদপত্রগুলিতে পর্ষতের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

কিন্তু 'গঠনমূলক' কাজ ছেড়ে 'অন্তর্ঘাতী' কাজের যখন যেটুকু নিদর্শন দেখা যেতো তাকেই সরকার এগিয়ে এসে মৃদু বেত্রচালনা দ্বারা পরিমার্জিত করতেন, মৃদু চালনার অন্তরালে থাকতো বেয়নেট ও কারাগারের হুমকী। ১৯০৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাস পরীক্ষায় অরবিন্দ ও চন্দ্রনাথ বসু প্রশ্ন রাখেন: "কবে এবং কীভাবে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগাযোগ শুরু হয়েছিলো, এবং

এই যোগাযোগের বর্তমান প্রকৃতি কী?" পরবর্তী বছরগুলিতেও এই ধরণের প্রশ্ন ছিলো। এই ধরণের প্রশ্ন এবং জাতীয় শিক্ষা পর্ষতের প্রস্তাব ও পাঠ্যপুস্তকে সরকার রাজদ্রোহের গন্ধ পান. ও সি. আই. ডি. প্রধান রাসবিহারী ঘোষের কাছে কৈফিয়ৎ চান। ১৯০৮ সালে গুরুদাস ও সতীশচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শের পর রাসবিহারী ঘোষ সরকারকে জানান যে, পর্ষতের পাঠক্রমে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে এমন ধরণের "অত্যধিক জাতীয়তাবাদী আবেগ" ভবিষ্যতের প্রশ্নে থাকবে না, রাসবিহারী ঘোষ নিজে এই দায়িত্বও নেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন যাতে আন্দোলনের নেতাদের রাজনৈতিক কাজকর্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে অরবিন্দ অগাস্ট, ১৯০৭'এ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন (এই সময় তাঁর বিরুদ্ধে 'বন্দে মাতরম' মামলা তৈরী হচ্ছিলো)। ১৯০৮ সাল পর্যন্ত অরবিন্দ অবশ্য ইতিহাস ও রাজনীতির অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন যত তীব্র হতে থাকে, তত বাড়তে থাকে দমননীতি, আর ততই জাতীয় শিক্ষা-পর্ষৎ তার কাজকর্মের 'জাতীয়' অংশটির সংকোচন ঘটাতে থাকে। বলা যেতে পারে যে, আর কিছুই তো করণীয় ছিলো না, বেশী আস্ফালন করলে বৃটিশ সরকার সব জাতীয় স্কুল-কলেজ বন্ধ করে ক্রেতাদের জেলে পুরতো। বটেই তো। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে থেকে, কী কাজই বা করার থাকতে পারে? জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন তাই তার গৃহীত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কিছু মৃদু সংস্কারের দিকে হাত বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি! কী সংস্কার আর কেন সংস্কার, এই প্রশ্নে যাবার আগে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের এই সীতার গণ্ডী সম্পর্কে তৎকালীন একটি বিতর্কের বিবরণ প্রাসঙ্গিক হবে।

রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর

রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালেই বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর উদ্দীপক ভূমিকা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। ১৩ই নভেম্বর, ১৯০৪ তারিখে শিক্ষা-পর্ষৎ গঠনের সিদ্ধান্তের আগে পান্তি'র মাঠে (যেখানে আজ বিদ্যাসাগর হস্টেল) ২ নভেম্বর, ১৯০৫ তারিখে ছাত্রদের এক

সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন সতীশচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, মোহিতচন্দ্র সেন, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্যদের সঙ্গে। ২২ শংকর ঘোষ লেনে মেট্রপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে 'ডন' সোসাইটির ৫ই নভেম্বর তারিখের সভায় রবীন্দ্রনাথ এক আবেগময় বক্তৃতা দেন। কিন্তু ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ তারিখে 'ডন' সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ অনেক নীচুগ্রামে বাঁধা এক বক্তৃতা দিলেন, বললেন, "এই স্বদেশী আন্দোলনে সকলেরই মন কিছু না কিছু উত্তেজিত হইয়াছিল। আমিও এ উত্তেজনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি নাই, একথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না। প্রথমে আমার আশাও খুব বড় ছিল। কিন্তু আমি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে আমরা হুড়মুড় করিয়া জড় জিনিসকে পাইতে পারি বটে, কিন্তু দেশের স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠান (Institution) স্থাপন করা এত তাড়াতাড়িতে হয় না।" কিন্তু ১৪ই অগাস্ট, ১৯০৬ তারিখে জাতীয় কলেজের শুভারম্ভ উপলক্ষ্যে টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ আবার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন: "বাঙালীর হৃদয়ের যজ্ঞ হুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন —আমাদের বহু দিনের শূন্য আলোচনায় বন্ধ্যাত্ব বুঝি আজ ঘুচিবে।" আবার, ১৯০৭ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩১৪, সংখ্যায় 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো নীচু গ্রামে নেমে বললেন যে, হৈ চৈ না করে এখন কাজ করাটাই দরকায়। উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর ঐ পত্রিকারই আশ্বিন সংখ্যায় একই নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন। বাঙ্গালী বাবুর রাজনৈতিক অসহায়তা ফুটিয়ে তুললেন তিনি স্পষ্ট করে ও নির্মমভাবে: [৮] "দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রূকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ কর।" রবীন্দ্রনাথকে খুবই অমায়িকভাবে তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে, হৈ চৈ শুরু করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, গান, কবিতাও যথেষ্ট উদ্দীপনা যুগিয়েছিলো। তবে কিছুদূর পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের মত সমর্থন করলেন: "অস্বাভাবিক আস্ফালনে বলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া এই পথকেই [রবীন্দ্রনাথের পথকে] আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত নহি।" কিন্তু, "বাস্তবিকই আমরা সেই পথেও বিনা বাধায় চলিতে পাইব কি না ভাবিবার সময় আসিয়াছে," এই বলে নিজের

বিশ্লেষণ উপস্থিত করলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্লেষণ মন দিয়ে অনুধাবন যোগ্য : "অকস্মাৎ বঙ্গবিভাগের ধাক্কা খাইয়া বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ প্রায় একবাক্যে কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল—না, আমরা আর ইংরেজের কাছে ঘেঁষিব না, উহাদের ছায়া স্পর্শ করিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিব না। আমরা এখন বুঝিলাম যে, ইংরেজ তোষামোদের কেহ নয়; কেহ ভাবিলেন, ইংরেজকে ভয় দেখাইয়া বরং কিছু আদায় হইতে পারে, অন্যে বলিলেন, ভয় দেখানর প্রয়োজন নাই; যেটুকু পার, নিজে কর, ইংরেজের নিকট কাঙালের মত হাত পাতিও না।…আমাদের মধ্যে কাহারও ছিল আস্ফালন বেশী, কাহারও ছিল ডিপ্লোমাসি বেশী…বঙ্গ বিভাগের পূর্বে আমাদের সমুদয় চেষ্টা ছিল ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির অভিমুখে, পরে চেষ্টা দাঁড়াইল পরাঙমুখে।…

"যাঁহারা বলেন, রাজনীতির চর্চা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্যান্য উপায়ে স্বহস্তে স্বদেশের হিতকর্মসাধনে নিযুক্ত থাকাই আমাদের কর্তব্য…শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি এই উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ অনেকেই বলিতেছেন, 'স্বদেশী'কে রাজনীতির সঙ্গে জড়ান একবারেই উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের 'অনেস্ট স্বদেশী' থাকাই কর্তব্য।…দেশের শিল্পের উন্নতি 'অনেস্ট স্বদেশী'র একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন আমাদের শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী শিল্পের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, আমরা যে পরিমাণে নিজের তৈয়ারা জিনিস ব্যবহার করিব, বিলাতের তৈয়ারী জিনিসের আমদানি ঠিক সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে, তখন এই 'অনেস্ট স্বদেশী'ই বা কিরূপে মাথা তুলিবে তাহা বুঝিতে পারি না। ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পীর অর্থ সঞ্চয় কম হইবে, সেখানকার মজুরেরা অন্নাভাবে মনিবের জানালা ভাঙ্গিবে, আর ইংরেজের শাসন নীতি নিদ্রামগ্ন হইয়া নাক ডাকাইবে, ইহা কি বিশ্বাস্য? যতদিন ইংরেজদের বাণিজ্য নীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট থাকিবে, ততদিন 'অনেস্ট স্বদেশী'র মাথা তুলিবার ক্ষমতা কতটুকু?…

"শুধু শিল্পবাণিজ্য কেন, আজ যদি ইংরেজ বলেন, তোমাদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতে রাজভক্তি শিখাইবার সম্যক্ ব্যবস্থা নাই, উহা উঠাইয়া দেওয়া হউক, তখন এক অর্ডিনান্সের ধাক্কায় কলিকাতার শিক্ষা পর্ব ও টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট হইতে বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পর্য্যন্ত সমস্তই লীলা সংবরণে বাধ্য হইবে।…ফলে চীৎকার না করিয়া কাজ করা উচিত, ইহা ঠিক কথা কিন্তু কাজ

করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে কি? এবং এখনও যাহা আছে, কালে সকল অবস্থাতেই থাকিবে কি?…

"রবীন্দ্রবাবু বলিয়া আসিতেছেন, রাজার হাতে কাজের ভার দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কর্মভার স্বহস্তে গ্রহণ কর, ইহাই রবীন্দ্রবাবুর উপদেশ এবং আজিকার স্বদেশী আন্দোলনের মজ্জাগত শিক্ষাই ইহা। আমি এখানে প্রশ্ন তুলিব, বাস্তবিকই আমরা কর্মে অধিকার ইংরেজের হাতে আপনা হইতেই তুলিয়া দিতেছি, না—ইংরেজ উহা আমাদিগকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়াই, আমাদের অনুমতির বা ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই, আপনা হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন?…যাঁহার হাতে এখন রাষ্ট্রশক্তি—বেয়নেট সমেত রাষ্ট্রশক্তি—নিহিত আছে, তিনিই একে একে আমাদিগকে কর্মে অব্যাহতি দিয়া স্বহস্তে সকল অধিকার গ্রাস করিতেছেন। আমরা কিরূপে ইহার প্রতিরোধ করিব?

"গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া দেশের লোককে কিছু কর্তৃত্ব দিতে পারিতেন। কিন্তু এখনও উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার জন্য যাঁহারা নিজ ব্যয়ে স্কুল কলেজ স্থাপনা ও পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের ও আপনার স্থাপিত স্কুল কলেজের উপর কিছু কর্তৃত্ব না আছে এমন নহে। কিন্তু সে কর্তৃত্বের মূল্য কি? রিজলি সার্কুলারেই তাহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে…গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে বা অনুমোদনে যদি কেহ ছেলেদিগকে ক, খ, শিখাইবার জন্য পাঠশালা খুলিতে না পায় তাহা হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে দেশের লোকের কর্তব্য কি থাকিবে, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।"

রামেন্দ্রসুন্দর জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার কেন্দ্রবিন্দুটি উদ্ঘাটিত করলেন। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে কেবল বিদেশী শক্তি যা গ্রহণ করতে রাজী তার চেয়ে বেশি করা সম্ভব নয়। এইটুকুতে যদি সন্তোষ না পাও, তবে যে চিন্তা করতে হবে তা সরাসরিভাবে রাজনৈতিক। কাঠামোগত পরিবর্তনটি হবে রাজার দয়ায়, নিজের নিয়ন্ত্রণে নয়।

সংস্কারপন্থার দৌড়

কাঠামোর মধ্যে তাঁদের দৌড় কতখানি তাও জাতীয় শিক্ষার নায়কদের হাতে নাতে টের পেতে হ'ল। পর্যতের মানপত্র কোনো চাকুরীর ক্ষেত্রেই স্বীকৃত নয়, ফলে পর্যতের জাতক অপাংক্তেয়। অথচ তার যে সতীর্থ গোলদীঘি বা অন্য কোন

জায়গার সরকারী গোলামখানার ছাপ নিয়ে বাজারে নামছে তার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। গোলামখানার জাতকের সম্মানও অক্ষুণ্ণ, কেন না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তো বয়কট করা হয়নি, সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করার কোনো সিদ্ধান্ত তো হয়নি, তবে যে গোলামখানায় ঢুকেছিলো তার দোষ কোথায়?

ছাত্রদের সামনে একমাত্র লক্ষ্য রাখা যেতো দেশের সেবা। এই লক্ষ্যে তাদের উদ্বুদ্ধ করা যেতো একমাত্র 'অন্তর্ঘাতী' শিক্ষার মারফৎ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই লক্ষ্য বা শিক্ষার এই উদ্দেশ্য জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ গ্রহণ তো করেনই নি, আর তাঁদের কর্ণে সরকারের আকর্ষণ যত বেশী পরিমাণে অনুভূত হতে থাকলো, ততই তাঁরা পশ্চাতে মার্চ চালাতে থাকলেন।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা-পর্ষতের অবৈতনিক সম্পাদকদ্বয় আশুতোষ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে কার্যকরী-সমিতি সমস্ত জাতীয় স্কুলের সম্পাদকদের এক সার্কুলার পাঠালেন। সার্কুলারে "এক বিশেষ শ্রেণীর" সমিতির বিরুদ্ধে সরকারের আইনের উল্লেখ করা হ'ল। আরও বলা হ'ল যে পর্ষতের গঠনের সনদেই রয়েছে যে "দেশের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অনুশাসন" রক্ষা করতে হবে। এই দুই অজুহাত তুলে প্রতি স্কুলের কাছে মুচলেকা চাওয়া হ'ল এই মর্মে যে, বিশুদ্ধ সাহিত্য সমিতি ছাড়া তাঁদের স্কুলের অন্য কোনো ধরণের সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এই মুচলেখা না পাওয়া গেলে অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে, জানানো হ'ল। সর্বোপরি স্কুলের কার্যকরী সমিতির বিনা অনুমতিতে ছাত্রদের কোনো সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অবাঞ্ছনীয়তা তাদের বুঝিয়ে দিতে বলা হ'ল। আরো বলা হ'ল যে, এই নির্দেশ যে পালন করবে না তার বেলায় "কড়া অনুশাসন কার্যকর" করে "প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা" যেন নেওয়া হয়। যে শিক্ষা আন্দোলনের জন্ম কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৮ তারিখের সার্কুলারটিতে পরোক্ষে তার মৃত্যু ঘোষিত হ'ল। 'জাতীয়' বিশ্ববিদ্যালয় কার্যতঃ জাতীয় আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহণ করলো।

৭ই অগাস্ট, 'বয়কট'—'স্বদেশী' আন্দোলন দিবসটি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে স্বাভাবিক কারণেই এক স্মরণীয় দিবস। ১৯০৭ সালেও ঐ দিন জাতীয় কলেজ ও স্কুলের সব ছাত্র ভোরবেলা কলেজ থেকে খালি পায়ে, কেবল উড়নী গায়ে মিছিল করে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে। তারপর কলেজে ফেরার পর 'বন্দে মাতরম্'

ধ্বনি দিতে দিতে 'জাতীয় শিক্ষা ভাণ্ডার' খোলা হয়। কিন্তু ১৯০৯ সালের পর সমস্ত 'জাতীয়' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭ই অগাস্ট পালন নিষিদ্ধ হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের এই হাল কেন দাঁড়ালো? নেতৃত্বে ছিলেন জমিদার ভদ্রলোকেরা ও তাঁদের ঘরের ছেলেরা, এঁরা সকলেই একশ' বছর ধরে বশংবদ বুদ্ধিজীবী তৈরীর প্রক্রিয়ার ফল। 'অত্যুৎপাদনে'র ফলে এদের মধ্যে চাকুরী লাভের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিলো। এ ছাড়া ভারতে বৃটিশ শাসন যত পোক্ত হয়ে চেপে বসতে লাগলো ততই সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আত্মবিক্রয়ী উচ্চ শ্রেণীগুলির উপর নির্ভরতা কমতে থাকলো। প্রথম পর্বে বৃটিশ উদ্দেশ্যই ছিলো এদের সন্তুষ্ট রাখা ও বিভিন্নভাবে এদের বিশ্বাসঘাতকতাকে পুরস্কৃত করা। লর্ড কার্জনের সময়ে এসে বৃটিশরা ধরে নিলো যে, সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে এদের স্বার্থ জড়িয়ে গেছে ওতপ্রোতভাবে এবং এদের আলাদা করে লালন করার প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু এই আত্মবিক্রয়ীদের একটি 'বাম' অংশও পাশাপাশি বিকশিত হচ্ছিল। এদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিলো দেশীয় উৎপাদন, বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্পে। কিন্তু এই ভিত্তি ছিলো অত্যন্ত নড়বড়ে, কেন না এই দেশীয় পুঁজিপতিরা বিকাশ লাভ করেছিলো বিদেশী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ও তাদের প্রসাদে। হিন্দুদের মধ্যে এক কাল্পনিক গৌরবময় প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণযুগ এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ব ও একতার স্বপ্ন যোগাচ্ছিল আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ। ফলে এই 'বাম' অংশের রাজনীতি দাঁড়ালো ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো। আমরা যে সময় নিয়ে আলোচনা করছি তখন ভারতীয় উচ্চ শ্রেণীগুলির সাধারণ চরিত্র ছিল এই। অবশ্য 'বাম' অংশের মধ্যে আরো বিভাজন এই সময়ে চলছে। ১৮৯২ সালে কাউন্সিল আইনের ধোঁকা ও তার মোকাবিলা করতে কংগ্রেস আন্দোলনের অসহায়তার ফলে তিলক, লাজপৎ রায় ও বিপিন পালের নেতৃত্বে স্বরাজের প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ালো। 'নরম' ও 'গরম' পন্থার বিখ্যাত লড়াই শুরু হ'ল। কিন্তু কোনো পন্থাই দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষকদের উপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ধারে কাছেও গেলো না—বিভিন্ন পন্থার নেতা, প্রবক্তা ও সমর্থকদের শ্রেণীস্বার্থ যতটা ছিলো সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিপরীতে, তার চেয়েও বেশী ছিলো কৃষকদের স্বার্থের বিপরীতে। ফলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো বাস্তব

কার্যক্রম উদ্ভূত হলো না। অন্য কোনো কার্যকরী পথের অনুপস্থিতিতে শ্রেণীগত অর্থনৈতিক সঙ্কট নিম্ন-মধ্যবিত্ত যুবকদের টানতে থাকলো সন্ত্রাসবাদের পথে।

শিক্ষায় 'অত্যুৎপাদনে'র অবস্থায় কার্জন শিক্ষাব্যবস্থায় দেশীয় প্রভাব কমানোর যে কার্যক্রম নিলেন তারই প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয়েছিলো জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। কর্ণধারদের শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী তাঁরা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করার কোন কার্যক্রম উপস্থিত করলেন না, এই সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই তাঁরা বৃটিশ শাসকদের কাছে চাইলেন পরিচালনায় আরো বেশী করে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা মাত্র। আসলে তাঁদের আন্দোলন নির্দেশ করলো কোন কোন দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করলে তা ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এই আসল লক্ষ্যটুকু 'কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি'র কার্যক্রমের মধ্যে উপস্থিত ছিলো। এঁদের উপর 'চরমপন্থী' রাজনীতির প্রভাব ছিলো না। তাই তাঁরা না ভোলাচ্ছিলেন নিজেদের, না অন্যদের। শুধু তাই নয়, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে সত্যিই কারিগরী শিক্ষার এক কার্যক্রমের প্রয়োজন ছিলো। এই প্রয়োজন অনুভব করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিপূরণের উদ্দেশ্যে তাঁরা এই সীমিত কার্যক্রম চালু করলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি জমিদারসুলভ যতটা, তার চেয়ে বেশি উঠতি মুৎসুদ্দী পুঁজিপতিসুলভ। পর্যতের স্নাতকদের কোনো চাহিদাই ছিলো না সমাজে। কিন্তু সমিতির কারিগরদের সামনে তবু কিছু সুযোগ সম্ভাবনা ছিলো।

শিক্ষা পর্ষৎ বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দের 'চরমপন্থী' রাজনীতির দ্বারা প্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। ফলে তার উচ্চাশা ছিলো বেশী। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিপূরক শিক্ষাক্রম চালু না করে তাঁরা ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে চাইলেন। ফল বা ফলের অভাব আমরা অনেক দূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছি। অস্তিত্বের অমোঘ তাগিদে পর্ষৎ সরকারের কাছে আরো বেশী করে আত্মসমর্পণ করতে থাকলেন। যতই 'চরমপন্থী' হোন না কেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ের কোনও কার্যকর নীতি এঁদের শ্রেণীচিন্তা থেকে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব ছিলো না, কোনো ক্ষেত্রেই। শিক্ষার ক্ষেত্রও ব্যতিক্রম নয়। জনসাধারণকে, বিশেষ করে কৃষকদের জাতীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার এমন কি ছাত্রদেরও এই কাজ করতে প্রস্তুত করার কোনো কার্যক্রম জমিদার-শ্রেণী উদ্ভূত

নেতৃবৃন্দের নেওয়া সম্ভব ছিলো না। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ন্যূনতম জাতীয় কার্যক্রম এটাই হতে পারতো।

রামেন্দ্রসুন্দর এতদূর পর্যন্তও দেখেছিলেন। তিনি বললেন যে, আসল ব্যাধি দেশের লোকের মধ্যে 'নেশন' বোধের অভাব। আবার বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের প্রায় অপ্রত্যাশিত সাফল্য থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে 'নেশন'এর বীজ পাওয়া যাচ্ছে। "সাবধানে সঙ্গোপনে সেই অল্পপ্রাণ বীজকে এখন রক্ষা করা আবশ্যক। অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে বজ্র নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিষ্যতের ভরসা থাকিবে না। ইহারই নাম 'কূর্মবৃত্তি' [কাছিম যেমন দাঁত বার করে কামড় দেওয়ার আগে পর্যন্ত খোলার মধ্য থেকে বার হয় না] নীরবে বল সঞ্চয়—আস্থানিক ও অস্বাভাবিক আস্ফালনেও যেরূপ ইহার প্রাণহানির শঙ্কা আছে, সেইরূপ নিষ্ঠার অভাব, অনুরাগের অভাব, যাহা বিজ্ঞের দল [শিক্ষা-পর্ষৎ ও এ ধরণের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির নেতারা] দেখাইতেছেন—সেই অভাবেও তাহা শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।...

"...শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে কিছু চেষ্টা, তাঁহাদের আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে; অশিক্ষিত জনসঙ্ঘের প্রতি তাঁহারা করুণ দৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাঁহারা প্রাণের বেদনা লইয়া প্রবেশ করেন নাই।...এক পুকুরে জলের উপর একফোঁটা তেল যেমন ছড়াইয়া পড়িয়া ভাসিয়া বেড়ায় মাত্র, তাঁহারাও তেমন এই বিশাল জনসমুদ্রের উপর নিঃসম্পর্কভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন মাত্র।

"বর্তমান আন্দোলনের একটা শুভ লক্ষণ এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মূক জনসঙ্ঘের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে...এই [নেশনের বীজ] জলসেচের কাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে" ('ব্যাধি ও প্রতিকার', প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৪)।[৮]

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন বটে "দৃষ্টি পড়িয়াছে", কিন্তু শ্রেণীচিন্তা এই দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে রাখলো, অন্ততঃ জাতীয় শিক্ষার্থীদের সামনে এই দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারলো না। ফলে কোনো পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও পুলিশের কৃপাদৃষ্টি, ফাঁপরের এই দুই শিঙের গুঁতোর ফলে অনেক শিক্ষার্থীই চুপিচুপি ফের সরকারী চাকুরী আর সওদাগর অফিসের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালো। মানুষ তৈরীর পরীক্ষা বর্জিত হয়েছে দেখে একে একে 'চরমপন্থী' পর্ষৎ ত্যাগ করতে লাগলেন। একেবারেই প্রথমে সরে গেলেন ব্রহ্মবান্ধব। "...নেতাদের

দুনৌকায় পা রাখার প্রবৃত্তির দরুণ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তেজ কমে গেল। তার একটা প্রমাণ, তখনকার নামজাদা অধ্যাপকদের প্রায় কেউই নিজেদের কলেজ ছেড়ে ন্যাশনাল কলেজে যোগ দেননি।...তিনি [ব্রহ্মবান্ধব] চেয়েছিলেন, শিক্ষা যুগপৎ স্বাধীন এবং জাতীয় ভাবাদর্শ-সম্মত হবে।...তিনি যখন দেখলেন যে, ন্যাশনাল কলেজও পরানুকরণের পথ ধরেছে, তখন তিনি ন্যাশনাল কলেজ ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন সম্বন্ধে নিরাশ হন। মনের ভাব গোপন রাখেননি; বার বার স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।"[১০] পর্ষতের কিছু নেতার সঙ্গে বিরোধ লাগায় সতীশচন্দ্র সরে গেলেন অরবিন্দের কিছু পরেই। জুলাই ১৯০৯ থেকে জুন ১৯১০, এই এক বছরের মধ্যে বারোজন অধ্যাপক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পদত্যাগ করেন।

পর্ষৎ আর সমিতি, কোনোটিতেই আর 'গরম পন্থা'র প্রভাব এখন কার্যকর ছিলো না। ফলে ২৫শে জুন, ১৯১০ তারিখে সংগঠন দুটি একত্রে মিলে যায়। কলা ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিভাগ যুক্ত থাকে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের সঙ্গে এবং ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা থাকে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে। ৯২, আপার সারকুলার রোডে তারক পালিতের পার্শিবাগানের বাড়িতে এতদিন কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি'র দপ্তর ছিলো। যুক্ত পর্ষতের দপ্তর নিয়ে যাওয়া হ'ল ঐ বাড়িতে। আলোকপ্রাপ্ত জমিদার এবং জমিদার শ্রেণী-উদ্ভূত যে বুদ্ধিজীবী ও পেশাদার মানুষদের মধ্যে থেকে চাকুরীজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছিলো, শ্রেণীসুলভ অস্পষ্টতায় ঢাকা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল পর্ষতে। তাই পর্ষৎ প্রথমে ঝুঁকেছিলো 'গরম পন্থা'র দিকে। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় পর্ষতের কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা 'গরম পন্থী'দের করলো হতাশ। বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির সেবার্থে কারিগরী শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে চালু শিক্ষাব্যবস্থার পাদপূরণের 'নরমপন্থী' মুৎসুদ্দী পুঁজিপতিসুলভ কার্যক্রমের বিজয়ই সূচিত হ'ল ১৯১০ সালের মিলনে।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে

ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকারের শিক্ষানীতি আর এক বাঁকের সামনে এসে দাঁড়ালো। বৃটেনে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক ধরে ভারতে বৃটিশ লগ্নী পুঁজি প্রবেশ করতে থাকলো ক্রমবর্ধমান

গতিতে। মেশিন আমদানি শুরু হ'ল বৃটেন থেকে, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে কার্পাস বস্ত্রশিল্প ও পূর্ব ভারতে পাটশিল্পের প্রয়োজনীয় মেশিন। বৃটিশ পুঁজি ভারতেই শিল্পদ্রব্য তৈরী শুরু করলো। সরকারী শুল্ক ব্যবস্থা ও বৃটিশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে দেশীয় পুঁজিরও বিকাশ চলতে থাকলো। প্রয়োজন পড়লো কুশলী প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানকর্মী, এমন কি গবেষকের।

ফলে এই প্রথম বৃটিশ সরকার বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার এক সাধারণ নীতি প্রণয়নের দিকে এগোতে বাধ্য হ'ল।

১৯০৪ সালে চারটি পশু চিকিৎসার কলেজ খোলা হ'ল। মুক্তেশ্বরের বীজাণু-শাস্ত্রের গবেষণাগারে পশু-চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা শুরু হ'ল। ১৯০৫ সালে পুসা'য় কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার এক কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান খোলা হ'ল। এ ছাড়া ছয়টি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কলেজে কৃষিজীবীদের জন্য প্রয়োগের ক্লাসের বন্দোবস্ত হ'ল। কানপুরে চিনি তৈরী, চামড়া, কাপড় এবং অম্ল ও ক্ষারক সংক্রান্ত রসায়ন বিভাগ নিয়ে একটি কারিগরী প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হলো।

১৯১১ সালে সরকার এলাহাবাদে এক শিক্ষা-সম্মেলন ডাকলেন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স এবং বিদেশী ও দেশী পুঁজিপতিরা বিভিন্ন শিল্পের জন্য বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ব্যক্ত করেন।[১১] রুরকি টমাসন কলেজের অধ্যক্ষ অ্যাট্‌কিন্সন ও বোম্বাই ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডসন, এই দুই সাহেবকে তদন্ত করতে করতে দেওয়া হল কীভাবে ভারতে 'শ্রমের নিয়োগকর্তা'দের সঙ্গে কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধ স্থাপন করা যেতে পারে। তাঁরা জানালেন যে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাহিদা কেমন তা ভালোভাবে অধ্যয়ন করে জানতে হবে, শিল্পোদ্যোগে ভারতীয় পুঁজি আকর্ষণ করতে হবে এবং হাতে কলমে শিক্ষানবিসি দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে কলেজ শিক্ষার। সাধারণভাবে তাঁরা বললেন যে উচ্চতম পদগুলিকে বাদ দিলে অন্যত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয়দের চাকুরীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

১৯১১ সালেই প্রতিষ্ঠিত হ'ল ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। প্রতিষ্ঠা ঘটলো প্রধানতঃ জামসেদজী টাটার উদ্যোগে এবং টাটা, বৃটিশ সরকার ও মহীশূর

মহারাজার দানে। উদ্দেশ্য রইলো গবেষণা, শিল্পে নূতন নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ এবং দক্ষ পরিচালক (ম্যানেজার) তৈরী।

১৯১৩ সালে ভারত সরকার নূতন শিক্ষা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।[১২] শিক্ষা খাতে ব্যয় এই প্রথম এক লাফে অনেকটা বেড়ে গেলো: ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে এই ব্যয় চার কোটি টাকা থেকে বেড়ে হল সোয়া সাত কোটি টাকা। এলাহাবাদে সম্মেলনের কারিগরী ও শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হ'ল শিক্ষা প্রস্তাবে। বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটকে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হ'ল। বৃহত্তর প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান-গুলিতে এমনভাবে কাজকর্ম পরিচালনা ও দেখাশুনার বাস্তবপদ্ধতি শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হ'ল যাতে বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত স্থানীয় শিল্পগুলিতে এই শিক্ষা প্রয়োগ করা যায়। শিল্পোদ্যোগ যেমন যেমন বাড়বে এবং ম্যানেজার ও চেয়ার-ম্যানদের চাহিদাও বাড়বে তার সঙ্গে তাল রেখে, তেমন তেমন ভাবে অন্যান্য বিভিন্ন পাঠক্রম চালু করা যাবে। আর বিভিন্ন পেশা (ট্রেড) শেখানোর স্কুলগুলি যেমন, সেই ধরণের নিম্নতর শিল্পসংক্রান্ত বিদ্যালয়গুলির স্থায়ী বিকাশ সাধন করতে হবে আশেপাশের শিল্পগুলির প্রয়োজন অনুসারে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উপরও নজর পড়লো। ১৯১৩ সালের মধ্যে ভারতে গড়ে উঠেছিলো পাঁচটি কলেজ ও পনেরটি স্বীকৃত স্কুল। এগুলি থেকে গড়ে প্রতি বছর ছয় থেকে সাত হাজার পাশ করা ডাক্তার বার হচ্ছিলো। এবার ডাক্তারদের বাধ্যতামূলক নাম-রেজিস্ট্রি করার রীতি চালু হ'ল। ডেহরা ডুনে খোলা হ'ল একটি রঞ্জন রশ্মি ইনস্টিটিউট। কাসাউলির কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু করা হ'ল। এই পাঠক্রমে যুক্ত হ'ল বীজাণু-শাস্ত্র, তার বিভিন্ন কলাকৌশল এবং বিশেষ বিশেষ গবেষণার প্রস্তুতিপর্ব। অমৃতসরে বছরে দু'বার করে ম্যালেরিয়া নিরোধক ব্যবস্থার ক্লাস চলতে লাগলো। কলকাতার মেডিকাল কলেজে ট্রপিকাল চিকিৎসার একটি স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের পরিকল্পনা গৃহীত হ'ল। মাদ্রাজ সরকার প্যাথোলজির একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন ও মাদ্রাজের মেডিকাল কলেজে প্যাথোলজির জন্য একজন পুরোসময়ের অধ্যাপক নিয়োগের সুপারিশ জানালেন।

পর্ষৎ ও সমিতি কারিগরী শিক্ষার উপরে যে জোর দিয়েছিলেন বস্তুগতভাবে তা মুৎসুদ্দী পুঁজির প্রয়োজনের বহিঃপ্রকাশ হলেও, তার সচেতন উদ্দেশ্য ছিলো

কিন্তু শিল্পের বিকাশ সাধন। জাতীয় কলেজের নির্মাণ-বিভাগের অর্ডারগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহু এদেশী ব্যক্তির ছোটো কারখানার (হোসিয়ারি, বরফ কল, চিনির কল, বোনার কল, ছাপার কল, চালকল, পাটচাপার কল) মেশিন, ইঞ্জিন, বয়লার সারাই ও কল বসানোর কাজ চলেছিলো। অর্থাৎ কিছু দেশী ছোটো শিল্পপতি এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিখ্যাত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অর্ডারও তালিকায় দেখা যায়। ফলে জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে কিছু জাতীয় পুঁজিপতির সংযোগ ছিলো। কিন্তু এদের সংখ্যা ও ক্ষমতা এতই সীমিত ছিলো যে, কেবল তাঁদের প্রয়োজন ও কাজের জন্য জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মতো ছোটোখাটো উদ্যোগও অপ্রয়োজনীয় ছিলো—এতো জাতীয় শিক্ষার্থী পোষার ক্ষমতা তাঁদের ছিলো না। তাঁদের দ্রুত বৃদ্ধির প্রসারের কোনো আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলো না। সময়ের সঙ্গে এই শ্রেণী যদি বিস্তার লাভ করতো ও শ্রেণী হিসাবে সংহত হয়ে উঠতো, তাহলে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন তো বটেই, অনেক জাতীয় আন্দোলনের ধারাই অন্যরকম হ'ত। কিন্তু বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ পুঁজিপতি (বিশেষ করে ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি) জাতীয় পুঁজির স্বাধীন বিকাশকে খর্ব করতে সক্ষম হ'ল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ব্যর্থতার এটিই প্রধান কারণ। যে শ্রেণীর এটি নিজস্ব কার্যক্রম হতে পারতো সেই শ্রেণীই ভালো করে গড়ে উঠতে পারলো না। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্বও এই কারণেই রয়ে গেলো মূলতঃ জমিদার ও বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের হাতে, এবং এই নেতৃত্ব থেকে আবার, তুলনামূলকভাবে বেশী জাতীয় ভাবাপন্ন আলোকপ্রাপ্ত জমিদার ও নবগঠিত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ 'চরমপন্থী'দের বিদায় নিতে হ'ল।

প্রায় একই ধরণের কারিগরী শিক্ষাক্রম বৃটিশ সরকারই চালু করলেন ব্যাপক হারে নিজেদের লগ্নীপুঁজির স্বার্থে। ১৯০৪ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে কারিগরী ও শিল্পোদ্যোগসংক্রান্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৮ থেকে বেড়ে হ'ল ২১৮, ছাত্রের সংখ্যা বাড়লো ৫০৭২ থেকে ১০,৫৩৫'এ। বস্তুতঃপক্ষে জাতীয় কারিগরী শিক্ষানীতি বৃটিশ শাসকেরা খুব খুঁটিয়ে দেখে এবং তার থেকে শিক্ষা নেয়। "বাংলায় কারিগরী ও শিল্পসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, ১৮৮৮-১৯০৮" শীর্ষক সরকারী প্রতিবেদনে প্রেসিডেন্সী কমিশনার কামিন্স পর্যতের শিক্ষাক্রমের প্রশংসা করেন।[৯] ১৯০৬-১৯০৯ সালের মধ্যে ভারতের বাৎসরিক শিল্পসম্পর্কিত সম্মেলনগুলিতেও

পর্বতের পাঠক্রমের প্রশংসা লক্ষ্য করা যায়।[২] মাদ্রাজ থেকে লণ্ডন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বৃটিশ সরকারী কর্মচারীরা ভারতের 'শিল্পায়নের' জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষানীতির আলোচনায় পর্বৎ-অনুসৃত নীতির অনুসরণ করতে থাকলেন।[৯]

নিজস্ব ও নিয়ন্ত্রিত লগ্নী পুঁজির সেবার্থে দেশব্যাপী কারিগরী শিক্ষাক্রমের যে যজ্ঞ শুরু হ'ল তাতে জাতীয় কারিগরী নীতি হয়ে পড়লো অপ্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ফাঁকগুলিকে উপলক্ষ্য করে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিলো, সেগুলিকে সরকার বাহাদুর ভরাট করতে লাগলেন।

১৯১৩ সালের ঘোষণায় বড়লাট জানালেন যে, ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশিক্ষার অনুপস্থিতিতে ব্যথিত বলে, এই শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হোক মহাভারত, রামায়ণ, এবং হাফিজ, সাদী ও রুমী ও অন্যান্য লেখক কৃত সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও পালি গ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করে। প্রাচ্য সংস্কৃতি অধ্যয়নের উন্নতি ঘটানোর জন্য খুবই মাথাব্যথা দেখানো হ'ল। সিমলায় ১৯১১ সালে প্রাচ্য পণ্ডিতদের সম্মেলনে হ্যানয়ের 'দূর প্রাচ্যের ফরাসী শিক্ষালয়' ধাঁচের এক কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার প্রস্তাব আসে। বড়লাট আগ্রহ দেখালেন। তিনি বললেন যে, সরকার চান স্বকীয় গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রাচ্য বিশারদেরা ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব অধ্যয়নের পরম্পরার সৃষ্টি করবেন। এঁরা যেমন গবেষণার পশ্চিমী কায়দা ব্যবহার করে ভারতীয় সভ্যতার উপর আধুনিক চিন্তার আলো ফেলবেন, তেমনই আবার প্রাচীন ও নব্য রীতিদ্বয়ের সঙ্গম ঘটাবার জন্য ডেকে আনতে হবে পণ্ডিত ও মৌলবীদের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হ'ল। আশুতোষ মুখার্জি ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন। ১৯১৫-১৬ সালে এক রিপোর্টে কমিটি স্বীকার করলেন[১৩] যে, পড়ানোর সঙ্গে পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিযুক্তি ঘটেছিলো ও শিক্ষার উচ্চতম স্তরগুলিতে কোনো চর্চাই ছিলো না। বলা হল, এ সবের আসল কারণ অর্থাভাব, এখন অর্থ পাওয়া গেছে, ফলে সমস্যা দূর হবে। সংস্কৃত বই বিক্রির পয়সা দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল অধ্যাপক পদ সৃষ্ট হ'ল। এ ছাড়া শুরু হ'ল সংস্কৃত, ফারসী ও পালি শিক্ষা। শিক্ষা-পর্যতকে

উৎখাত করে সার তারকনাথ পালিত তাঁর পার্শিবাগানের বাড়ি দান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের জন্য। এই বাড়ির মূল্য শুদ্ধ তিনি মোট পনের লক্ষ টাকা সরকারকে দিলেন পদার্থ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ শিক্ষার জন্য। বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তিবাবদ সার রাসবিহারী ঘোষ দিলেন দশ লক্ষ টাকা।

ফলিত অঙ্কের অধ্যাপক হয়ে এলেন গণেশ প্রসাদ, ইনি গটিংজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাইনের কাছে ছাত্র হিসাবে গবেষণা করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ২৭ বছর অধ্যাপনার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজে এলেন রসায়নের অধ্যাপক হয়ে। পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ করা হ'ল সি ভি. রমণ ও দেবেন্দ্রমোহন বসুকে। পদার্থবিদ্যায় গবেষক হিসাবে বৃত্তি পেলেন অবিনাশচন্দ্র সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা। এ ছাড়া ১৯০৮ সাল থেকেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী, মিশ্র অঙ্ক, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ক্লাস চলছিলো। পরে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও শারীরবৃত্তে এই ক্লাস চালু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ছাড়া খোলা হ'ল পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যার বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হলেন ব্রজেন শীল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে সব প্রশ্ন নিয়ে আলোড়ন চলেছিলো, তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো Teaching University, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত। প্রতিটি বিষয়েই বাহ্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয় সমালোচনা অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটালো। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের রাজনৈতিক মর্মবস্তুর ব্যাপারে সরকার বাহাদুর কোনো ছাড় দিলেন না। বড়লাট স্কুল সংক্রান্ত শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বললেন, "বেসরকারী পরিচালনাধীন স্কুল থাকবে যথোপযুক্ত কোনো পর্যতের পর্যবেক্ষণে, কার্যকারিতা রক্ষিত হবে সরকারী পরিদর্শন, স্বীকৃতি, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদানের সাহায্যে।"[১২] তিনি বললেন, এই নীতি প্রণীত উডের ডেস্‌প্যাচে, স্বীকৃত ও বর্ধিত ১৮৮২র কমিশন দ্বারা এবং ১৯০৪ সালে কার্জনের প্রস্তাবে এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার উপর সরকারী কব্জা বাড়লো বই কমলো না।

১৯১৩ সালের শিক্ষানীতি মুমূর্ষু জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন টিকে থাকার বাহ্যিক কারণগুলিকে দূর করে দিলো। ১৯১৫-১৬ সালে দেখা গেলো বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের বেঞ্চি খালি। বাকী রইলো বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনস্টিটিউট।

ভারতব্যাপী বিজ্ঞান ও কারিগরী নীতির অংশ হিসাবে কলকাতায় একটি টেকনোলাজিকাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনের ব্যাপারে একটি সরকারী কমিটি হয়। তাঁর সম্পাদক এভারেট সাহেব বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনস্টিটিউটে চিঠি দিয়ে জানান যে, এই প্রতিষ্ঠানকেই ঐ উদ্দেশ্যে সরকার অধিগ্রহণ করতে চাচ্ছেন। অজুহাত দেখানো হয় যে, এ্যাটকিন্সন ও ডসনের কমিশন কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন। তারক পালিত, নীলরতন সরকার ইত্যাদিরা সরকারী প্রস্তাব সমর্থন করেন। বিরোধিতা করেন গুরুদাস ব্যানার্জি প্রমুখেরা। ভোটে হেরে যাওয়ার পর তারক পালিত টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন ও তাঁর বাড়ি থেকে ছ'মাসের মধ্যে জাতীয় কলেজকে তুলে নিতে নোটিশ জারী করেন।[৯] ঐ বাড়িতেই পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের টাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়।

ছাত্র, শিক্ষক ছাড়াই প্রায়, কোনোক্রমে টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বালিয়ে রাখে জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ ও মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান সভা। পরে পর্ষতের কারিগরী বিভাগ থেকে রূপ নেয় যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্‌নোলজি এবং অবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উপযুক্ত স্মৃতিফলক হবে বিনয় সরকারের মূল্যায়ন : "পুরোপুরি ডাল-ভাতের দর্শন এবং বিশুদ্ধ বস্তুবাদ বা মোটাভাবে বলতে গেলে মিস্ত্রী তৈরী স.ত্বও বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌স্টিটিউট শিল্পোদ্যোগসংক্রান্ত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যার ছাত্র টানতে পারলো না। আবার বাঙালী বিপ্লবের দেশপ্রেম, জাতীয় আদর্শবাদ, স্বদেশী স্বরাজ দর্শন, মিস্ত্রী তৈরী-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের যুক্ত আদর্শও বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে সাহিত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা নিতে 'ইয়ং বেঙ্গল'কে টেনে আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না। সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর্ত রক্ষণশীলতা বড়ো বেশী শক্তিশালী ছিলো। মধ্যযুগীয় চিন্তা, জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা, অবৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যারহিত সাহিত্যচর্চাসুলভ ধারাকে অন্তর্ঘাতে কাৎ করা গেলো না।"[৯]

উপসংহার

আমরা দেখলাম যে, ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনে বৃটিশ শাসকদের প্রথমে কেবল উদ্দেশ্য ছিলো ভারতীয় 'উচ্চ' শ্রেণীগুলির সামনে বৃটিশ সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা ও শ্রেণীগুলির মধ্য থেকে বৃটিশ ভাবধারা অনুসারী

এক বশংবদ বুদ্ধিজীবী বর্গ তৈরী করা। এটিকে আমরা বলেছি মেকলে পর্ব। যখন ভারতকে বৃটিশ পণ্যের বাজার ও বৃটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসাবে এক কেন্দ্রীভূত উপনিবেশে পরিণত করার নীতি পরিপক্ক হতে থাকে, তখন নীতিপ্রণয়নে আসে এক পরিবর্তন। জোর গিয়ে পড়ে এই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা চালু করার কাজে অংশগ্রহণে সমর্থ পেশাদারী কর্মী, আমলা ও মজুর সৃষ্টির উপযোগী নীতি কার্যকর করার উপর। কারিগরী ও প্রাথমিক শিক্ষাকে, কাজে সব সময় না হলেও, নীতিগতভাবে উচ্চশিক্ষার চেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষাকে এক ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। এটিকে আমরা বলেছি উড পর্ব।

ইতিমধ্যে দেশী পুঁজি ও চেতনার বিকাশ শুরু হয়। ফলে বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের এক 'বাম' অংশ শিক্ষাসহ সকল বিভাগেই বেশী বেশী সুযোগ সুবিধা চাইতে থাকে এবং বৃটিশ সরকারবিরোধী সীমিত কিছু আন্দোলন শুরু হয়। এই অংশ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা সম্বলিত এক 'ত্রিমাত্রিক' ছক হাজির করে এবং শিক্ষায় আপন নিয়ন্ত্রণ চালু করার কার্যক্রম নেয়। কিন্তু 'বাম' অংশেরই মধ্যে এক দক্ষিণ ঝোঁক থাকে, বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে কিছু পরিপূরক কার্যক্রম নেওয়ার। আমাদের মনে হয়েছে যে, বৃটিশ নিয়ন্ত্রণের কাছে দেশী পুঁজির আত্মসমর্পণের যে ঝোঁক তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভাবে প্রতিফলিত হয়। বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ ও চাপের মুখে দেশী পুঁজির বিকাশের বিকৃতি ও ব্যর্থতাই শিক্ষাক্ষেত্রেও আত্মসমর্পণের ঝোঁকের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে। এই পর্যায়কে আমরা বলেছি কার্জন পর্ব।

বৃটেনে লগ্না পুঁজি ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ পুঁজি লগ্নী হতে থাকে এবং এই পুঁজি ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেশী পুঁজির বিনিয়োগ ভারতে শিল্পদ্রব্য তৈরীর আধুনিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। এর ফলে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় আবার এক পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক শিল্পের প্রয়োজনে দক্ষ শ্রমিক, কুশলী কারিগর, অনুশীলনপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদের চাহিদায় এক উল্লম্ফন ঘটে। এমন কি, বিভিন্ন শিল্পে প্রাথমিক গবেষণার বাস্তব প্রয়োজনে পেশাদার বিজ্ঞানকর্মীর চাহিদাও দেখা দেয়। এই প্রথম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পরোক্ষ স্বার্থ ছাড়াও সরাসরি বিজ্ঞান শিক্ষাকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে লাগানোর প্রয়োজন ঘটলো। ফলে এই প্রথম এক সামগ্রিক বিজ্ঞান ও কারিগরী

নীতি প্রণয়ন শুরু হ'ল। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁকের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটতে লাগলো, কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে ভারী শিল্প পর্যন্ত স্থাপনের প্রয়োজন স্বীকৃত হ'ল, শুরু হল ভারতের 'শিল্পায়ন'।

এই প্রবন্ধে আমরা মূলতঃ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসের বিবরণই রাখার চেষ্টা করেছি। দেখার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন পর্যায়ে বৃটিশ শাসকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য ও প্রয়োজন কেমনভাবে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কিত নীতির বিবর্তনের ধারার দিক নির্দেশ করেছে। এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। এই প্রবন্ধের সীমিত প্রেক্ষাপটে সেই ভূমিকা আমরা যতদূর অনুধাবন করতে পেরেছি, তাতে আমাদের গভীর সন্দেহ জেগেছে তথাকথিত 'বাংলার নবজাগরণের' 'অমিত সেন'/সুশোভন সরকার প্রবর্তিত মূল্যায়ন এবং 'স্বদেশী' আন্দোলনের প্রচলিত ব্যাখ্যা কতদূর বাস্তবানুগ। যদি আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকরা এই প্রসঙ্গ-গুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন, তবে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল সম্প.র্ক সঠিক বিচারে উপনীত হওয়া যাবে।

সূত্র নির্দেশ

১ Selections from Educational Records, Vol. I, ed, Richey and Sharpe.
২ মার্কস্, 'The East India Company'.
৩ মার্কস্, 'The Future Results of British Rule in India'.
৪ Collection of Despatches (1854-1868), Home Department.
৫ Stanley's Despatch, India Office.
৬ Selections from Educational Records, Vol. II (1859-71).
৭ A.P. Howell, 'Note on State of Education in India during 1866-67'.
৮ 'রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা সমগ্র', সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।
৯ হরিদাস ও উমা মুখার্জি, Origins of the National Education Movement
(জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বাংলা রচনার এই গ্রন্থটির তথ্য ও উদ্ধৃতির বহুল ব্যবহার রয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। এটি একটি তথ্যসমৃদ্ধ, মূল্যবান আকর গ্রন্থ।)
১০ মনোরঞ্জন গুহ, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়'।
১১ Educational Conference, Allahabad, 1911 : Papers.
১২ Indian Educational Policy (1913) : Resolution of Governor-General in Council (21.2.13)
১৩ Report of Committee Appointed to consider Arrangements for Post-Graduate Teaching in the University of Calcutta.

মহাশ্বেতা দেবী

আজকের লেখা ঃ কি ও কেন

দীর্ঘদিন ধরে, অসুস্থ হবার পরে, মাথার ভেতরে কোথায় একটা যন্ত্রণা শুরু হয়, তাতে গভীর অস্বস্তি। যন্ত্রণাটি আমাকে ভীত করে, শঙ্কিতও। কেন না কিছুতে ব্যথাটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। একই ভাবে, ইদানিং অন্য এক বিপদের চিন্তায় আমি ভীষণ সন্ত্রস্ত। মনের এই সব উদ্বেগ অশান্তির মধ্যে অবাধ্য ও একগুঁয়ে কোন গানের সুরের মত একটা কথা প্রায় আমাকে ভূতে তাড়ায়। এক তরুণ বন্ধুর কথা, লেখক সে। চশমা খুলে ফেললে তার চোখ ও মুখ বাইরে অটুট, তবু জীর্ণ। সে বলেছিল, মহাশ্বেতাদি, মানুষ ও মাছ—দুটোরই পচ ধরে মাথা থেকে। কথাটা আমার প্রায় মনে হয়, ভয় হয়।

কোন প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সত্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে চূড়ান্ত ঔদাসীন্য সৃষ্টি করার এক আধুনিক ও উন্নত উপায় আছে। কোন বিশেষ, নিষ্ঠুর সত্যকে বারবার চোখের সামনে হাজির করলে মনে গড়ে ওঠে প্রতিরোধের দেওয়াল। যেমন চলচ্চিত্র। ধরে নেওয়া যাক, অতীব সদুদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল যে সকল চলচ্চিত্র। এক সময়ে চলচ্চিত্রে নাৎসী জার্মানীর ভয়াল বর্বরতা, ইহুদী গণহত্যা, জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ, এগুলি তৎকালীন দর্শক খুবই দেখেছেন। দেখতে দেখতে মনে কোথাও এসেছিল ক্লান্তি, ঔদাসীন্য। নাৎসী বর্বরতা বিষয়েও আর প্রয়োজনীয় ধিক্কার মনে আসত না। একই সঙ্গে কোথাও ছিল চোরা "আহা" মনোভাব। যথেষ্ট তো হয়েছে, আর কেন! মোট কথা, যে প্রতিক্রিয়া হওয়া প্রয়োজন, তা হয়নি। বেশি কচলে লেবু তেতো হয়েছিল মাত্র। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের উদ্দেশ্য সফল হয়। আমরা, বিশ্বের চলচ্চিত্র দর্শকরা, যখন আর নাৎসীদের নিয়ে ভাবতে রাজী ছিলাম না, তার মধ্যেই বহু নাৎসী যুদ্ধাপরাধী (অচিহ্নিত) বিভিন্ন দেশে প্রশাসন যন্ত্রের ফাঁক ফোকরে প্রয়োজনীয় নাট-বোল্টু হয়ে ঢুকে যান। ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। দেশ চালাতে হলে দানব সেনা প্রয়োজন—নানা ক্ষেত্রেই।

একই ব্যাপার কি ঘটেনি ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকার বর্বর ভূমিকা নিয়ে? অন্যান্য বহু দেশে তো বটেই, আমেরিকাতেও ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন কম হয়নি। আন্দোলন হয়েছে, আক্রমণও চলেছে। আমেরিকার সচেতন মানুষের কাছেই কি সে আন্দোলন পরের দিকে সমান সত্য ছিল, না তাতে এ যুদ্ধে সৈন্যদের অর্জিত সম্মানাদির মূল্য মার্কিন দেশে খুব কমেছে?

আমাদের দেশে এই দশক বিষয়ক অভিজ্ঞতা খুবই দ্যোতক। নকশাল আন্দোলনে মধ্যবিত্তের ঘরে জোর টান পড়েছিল। যে কারণে এই প্রথম ভদ্রলোকদের মনে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শহরে আন্দোলন শুরু হওয়াতেই ঘটে এই তাৎক্ষণিক বিপর্যয়। নইলে কৃষিজীবী নিরন্ন মানুষের সংগ্রাম মধ্যবিত্তকে কোনদিনই বিচলিত করে নি। এখনো তা করে না। কিন্তু ঘরের ছেলেরা জড়িত, চোখ একেবারে বুজে থাকাও যায় নি। ১৯৭৯ নাগাদ দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত নির্বেদ। এই নির্বেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং এই সঙ্গে আসছে আমার আশঙ্কার কথা।

নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা খ্যাত, তার পিছনে যে আছে বহু কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস, বহু কৃষক ও আদিবাসী অভ্যুত্থানের ইতিহাস, স্বাধীন ভারতে আইনের নামে—গণতন্ত্রের মহিমার নামে নির্মম শোষণের ও অত্যাচারের ইতিহাস, এ সব তথ্য বুদ্ধিজীবীরা জানতে চাইলে জানতে পারতেন। দেশে ও মানুষে আগ্রহ থাকলে। কিন্তু "আনন্দবাজার" ও "স্টেটসম্যান" জানায় নি, অতএব তাঁরা যে সব জানলে-ই না। সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবীরা মোটামুটি এই ভাবে বলে থাকেন, "কি আত্মত্যাগ! না, মানতেই হবে এরা দেখিয়ে দিল আদর্শের জন্যে মরতে ভয় পায় না।" অনেকে নিদারুণ শোকাহত মুখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন। অত্যুগ্র উৎসাহীরা অবশ্য বলেন, বিপ্লব এরা এনে দিয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণী সব সময়ে সব চেয়ে নিরাপদ জায়গায় থাকেন। তাঁর স্বমত প্রকাশের শিল্প-মাধ্যম যাই হোক—বিপ্লব তাঁর কাছে বিক্রীতব্য পণ্য। বিপ্লব থেকেই তিনি তাঁর ফায়দা তুলে নেন। এঁরা পরোক্ষে এসটাব্লিশমেন্টের স্বার্থরক্ষা করেছেন—চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে, নাটকে এনেছেন শুধু শহুরে নকশালদের। তাদের সঙ্গেও চূড়ান্ত অপরিচয়। অতএব গভীর মমতা নিয়েও, তাঁরা এদের যে ভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে মনে হয় এরা অ্যাডভেঞ্চারিস্ট ও রোমান্টিসিস্ট্। মরার জন্যেই এদের যত হুড়োহুড়ি।

দর্শক-পাঠক লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্ত। চলচ্চিত্র দেখে বা বই পড়েও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিজীবনের ধান্দাগুলি ভোলেন না। তাঁর মনে হবে, যারা নিজেরা বাঁচতে জানে না, হত্যার রাজনীতি করে, তারা আবার অপরকে বাঁচাবে কি করে ?

নকশাল আন্দোলনের ব্যাপারটিকে এঁরা এবং এঁরা যে শ্রেণীর মানুষ, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শহরের শিক্ষিত ছেলেদের শহরে সংগ্রাম, হত্যা করা ও নিহত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। জেলে বন্দী হত্যাও এঁরা মনে রাখেন, অত্যাচারও, কেননা জেলগুলি শহরে শহরে অবস্থিত। এবং এঁরা এও ধরে নিয়েছেন, যেহেতু সে অধ্যায় বিগত, সেহেতু আন্দোলনও শেষ। চিন্তার এই প্রেমিসে অবস্থান তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক। গ্রামাঞ্চলে কি ঘটেছে তা তাঁদের না জানলে এসে যায় না। শহরই সব। বস্তুত চলচ্চিত্রকার ও লেখকদের বহুজনের জীবনকালেই ঘটেছে কাকদ্বীপে রক্তাক্ত সংগ্রাম, তেভাগা তেলেঙ্গানা। কিন্তু তাতে তাঁদের ঘরে দোরে টান পড়েনি।

রক্তাক্ত এ দশকের কারণ তো আসলে নিহিত গরীব চাষী-খেতমজুর-বর্গাদার-আদিবাসী-জঙ্গলজীবী-বর্ণধর্ম নির্বিশেষে এদের উপর নির্লজ্জ শোষণে, যা আজও আছে অব্যাহত। তার কারণ তো নিহিত বর্ণজাতিধর্ম নির্বিশেষে পরিপূর্ণ সেক্যুলার উদারতায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যেভাবে ভারতের নয়া জমিদার এই জোতদারদের মদত দিয়ে থাকে সৈন্যে-পুলিশে-হুকুমবরদারিতে-চালাও বন্দুক প্রদানে—তার মধ্যে। চলচ্চিত্রে সেসব কারণ থাকে অনুপস্থিত : চলচ্চিত্রে নকশালরা কমই আসে। যখন আসে, তখন সে হয় এক সুদর্শন, স্বপ্নতাড়িত, আদর্শাবেগে দীপ্ত, উচ্চশিক্ষিত ফ্যানাটিক। হয় সে পালিয়ে আশ্রয় খোঁজে, নয় পুলিশের হাতে নিহত হয়। জঙ্গলের গোপন ঘাঁটিতে যুধ্যমান ছেলেদের সঙ্গে থাকে না কোন গ্রামীণ, কোন আদিবাসী। অথচ দূরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধে আঞ্চলিক মদত নকশাল ছেলেরা আগেকার কৃষক-কারণে সংগ্রামী রাজনীতিক যোদ্ধাদের মতই পেয়েছে হয়ত। সময় তো কৃষক ও আদিবাসীকে বেশী করে সংগ্রাম-সচেতন করেছে।

আন্দোলন-অনভিজ্ঞ মানুষদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের কথা বলছি। সত্তর থেকে বাহাত্তর—পশ্চিম বঙ্গের বহু জায়গা ও কলকাতা যখন রক্তাক্ত হচ্ছিল, তখন পেশাদারী সাহিত্যিকরা কতখানি নীরব ছিলেন, সবাই জানেন। প্রত্যেকে নন। তবে প্রায় সকলে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বারবার বলেছি। এই আনইন-

ভল্‌ভমেণ্ট এক ক্ষমার অযোগ্য অবিবেকী পাপ। যখন সৈন্য-দি আর পি-প্রশাসনী মস্তানরা দেশকে এক রক্তাক্ত বধ্যভূমি করে আইন ও শৃঙ্খলা পুনর্বাসিত করল, তখনও সবাই চুপচাপ। বিহারের গ্রামাঞ্চলে ও অরণ্যে, অন্ধ্রে, সংগ্রাম চলল বটে, তবে সে তো স্বরাজ্যে নয়। ক্রমে লেখকদের এক বৃহদংশের হৃদয় উদ্বেল হল। নকশাল প্রসঙ্গ এল পেশাদারী সাহিত্যে। কথামৃতে রামকৃষ্ণ বলেছেন, বাড়ীতে মাছ এলে মা জানেন কার কি দরকার। কাকে দিচ্ছেন ভাজা, কাকে দিচ্ছেন ঝোল, ইত্যাদি। ছেলেরা তখন জেলে। নকশাল প্রসঙ্গ লেখকরা হাতে পেলেন। যে যেমন বুঝলেন, সে তেমন লিখলেন। নইলে পেশাদারী সাহিত্যের নকশালরাও ভ্রান্ত আদর্শোন্মত্ত তরুণ। অবিবেকী হত্যা করে তারা, শেষ অবধি মরে। কতজন খেললেন বাঘের খেলা। এই সমস্ত বছরগুলি ধরে তরুণরা আন্তর নিষ্ঠায় কবিতা, গল্প, নাটক, (সাহিত্যমানে সব হয়ত উৎরোয়নি) ইত্যাদি লিখে বয়স্কদের অনুষ্ঠিত পাপের প্রাচিত্তির করেছেন।

বাহাত্তরের পরে ক্রমে ক্রমে বেজায় অদ্ভুত সব শিবিরে নকশালদের সমর্থনে ঝকঝকে কাগজপত্রের ভিড়। ছেলেরা তখন জেলে। নেতারা জেলে, নিহত, মৃত। জবাব দেবার কেউ নেই। কলকাতার হাওয়াকে কিছুদিন স্বাস্থ্য দিয়েছিল বারুদের গন্ধ। তারপরই কলকাতার হাওয়া প্রাচীন বিষ ফিরে পেল। রক্তাক্ত দশককে নিঃশেষে হননের চেষ্টা শুরু হল। কয়েক বছরের মধ্যে অত্যদ্ভুত সব লোকেরা অসম্ভব ট্রাপিজ দেখিয়ে জেলে গেলেন। বীরদের এ আত্মোৎসর্গ অপুরস্কৃত যায়নি, ১৯৭৯ সালে সে কথা বলতে পেরে বড় ভাল লাগছে। যা হোক আন্দোলনের কর্মীরা কোনদিন জেল থেকে বেরোবেন এ কথা মনে রেখে আন্দোলনের চরিত্রহননের ষড়যন্ত্র হল শুরু। কোন কাগজের বিশেষ সংখ্যা।

(১) এরা সহানুভূতি দেখাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে, কাগজ বের করছে কেন? (২) এরা কোন শিবিরের লোক তা সবাই জানে। তাহলে দুয়ে-দুয়ে চার হল। এ কথা পরিষ্কার হল, আন্দোলনটি বিদেশী স্বার্থসিদ্ধির কারণে বিদেশী অর্থপুষ্ট। (৩) ছেলেদের আন্তরিকতা ছিল। তরুণদের থাকে। তবুও এটা একটা রোমান্টিক-অ্যাডভেঞ্চারিস্ট ব্যাপার।

কে বলবে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি? মানুষ অনীহ হতে থাকল। শিক্ষিত লোকজন অনীহ। তখন প্রেসের কণ্ঠরুদ্ধ। জেলে হত্যা ও ফাঁসী, নির্যাতন, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রে গণনির্যাতন চলল। চলছে, চলবে। আর জেল

থেকে বন্দীমুক্তি যখন ঘটতে থাকে—তার আগেই কলকাতার হাওয়া বলে দিল, সবাই কেনা-বেচা হয়ে বেরুচ্ছেন। বলাই স্বাভাবিক। রাজনীতিতে ডাইনে-বাঁয়ে সকলেই তো কোন না কোন দামে বিকিয়ে আছেন। এ রকম বলাই সম্ভব। অর্থাৎ, শহুরে শিক্ষিত নকশাল বা নেতা, এঁরা ছাড়া আর কারো বিষয়ে প্রশাসন বা বিরোধী শিবিরগুলির ভাবনা নেই। এখন বিগত কয়েক বছরের গল্প-উপন্যাসের খতিয়ানে যা দেখা যাবে, তা হল সাংস্কৃতিক জার্ম-ওয়ারফেয়ার। নকশাল আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের কাজ ফুরায় না।

বড়ই সংকট কাল। অথচ একটা কথা তো খুবই সত্যি। রূঢ় হলেও সত্যি। এতজন জেলে ছিলেন এতদিন। তবু তো চলেছে সংগ্রাম, চলছে? প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে খনিমজুরদের লড়াই, খেতমজুরের লড়াই, সিংভূমে-পালামৌয়ে অরণ্য-অধিকারের লড়াই, কোনটা তো থেমে নেই? ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নবতম পর্যায়ে তো শোষিত আদিবাসীর চাপে বিহারের বহু সক্রিয় রাজনীতিক দল একসঙ্গে মিলতে বাধ্য হয়েছে।

প্রশাসন ও বিরোধী শিবিরসকল চায় না সেদিকে দৃষ্টি পড়ুক। সে সকল কথা সাহিত্যে, সিনেমায়, থিয়েটারে আসুক।

আমার সরাসরি বক্তব্য, এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন যাঁরা, এ আন্দোলন নিয়ে লিখতে চান যাঁরা, সেইসব লেখকদের উদ্দেশ্যে। তাঁদের সকলের সব লেখা পড়েছি, এ রকম অস্বাভাবিক দাবী করব না। অনেক পড়েছি। তাঁদের দায়িত্ব ছিল, আছে, এই আন্দোলনের পশ্চাৎপটকে বারবার টেনে আনা। একাধিক উপন্যাসে দেখেছি এই প্রসঙ্গ, একটি ছেলে বা একাধিক ছেলে, অবশ্যই সি. পি. এম. এল., গ্রামে যায়; গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মিশে অ্যাকশান করে; পুলিস এলে যুদ্ধ করে, ধরা পড়ে, সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়; প্রায় সকলেই গভীর বিশ্বাসে চীনা কবিতা ও গান বা চীনের চেয়ারম্যানের বাণী বলে। এইসব লেখকদের সততা, আন্তরিকতা, আত্মোৎসর্গের সংকল্প, কৃষিবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার সাধনা, সব সত্যি। এঁদের মধ্যে নেই কোন অসততা।

কিন্তু আমারও পাঠক হিসাবে মনে হয়, কেমন করে এক বা একাধিক শহরের ছেলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মানুষ বা আদিবাসীর কাছে বিশ্বাসভাজন হতে পারল? কৃষিজীবী মানুষ শোষিত, বলা যথেষ্ট নয়। শোষণ কি কি চেহারায় আসে? এগুলি না থাকার ফলে এই সব লেখা কি সময়ের যথার্থ দলিল হয়ে উঠতে

পেরেছে? অথবা, নকশাল ছেলেদের সৃষ্ট সাহিত্যে শোষণ ও অবিচারের মেকানিজমের যথাযথ রূপ উদ্‌ঘাটিত যদি না হয়, বৈপ্লবিক আবেগই হয় মুখ্য, তাহলে তা পড়ে এঁদের অ্যাডভেঞ্চারিস্ট-রোমান্টিসিস্ট বলে প্রচার করার সুবিধা কি পায় না বিরোধীপক্ষ?

এই দশকে পশ্চিমবঙ্গে, প্রতিবেশী বিহারে, কি আদিবাসী-গ্রামীণ-স্থানীয় মানুষ সময়ের প্রয়োজনে হাতিয়ার ধরেননি? তাঁদের প্রধান ভূমিকায় রেখে, (যা যথার্থ ভূমিকা) কেন লেখা হল না কিছু? চীনের কবিতাই বা সব সময়ে কেন? আমাদের গ্রামীণ মানুষ ও আদিবাসীরা তো সব কথাই ধরে রাখেন গানে। যে গান কবিতাই।

তারপর, আজই বা তাঁরা কি করছেন, এই ভয়ংকর সংকট কালে? এখন কেন তাঁরা বিভিন্ন জার্নাল থেকেই জেনে নিচ্ছেন না কোথায় চলছে সংগ্রাম? যে সকল কারণে নকশাল আন্দোলন ঘটেছিল, সে কারণগুলি কি মুছে গেছে, না এই সব একদা অঙ্গীকারবদ্ধ লেখকরাই হয়ে পড়েছেন উটপাখি? এঁদেরই আমি বার বার বলব, অন্যদের বলে লাভ নেই।

ভারতের ভূমিব্যবস্থার জটিল জাল, সহস্র আইনের আড়ালে কৃষিজীবী মানুষকে শোষণ, বর্ণের নামে নিপীড়ন, বর্ণ ও শ্রেণীর যুক্ত কারণে নিপীড়ন, প্রশাসনের আসল রূপ, তথাকথিত আপসপন্থী বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন—এই সমগ্র মেকানিজমের শক্ত বনেদের ওপর ভিত্তি করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাই হবে একমাত্র উত্তর।

এইসব লেখকরা কি মনে করছেন, শিক্ষিত ছেলেরা জেলে গেল, নিহত হল, নির্যাতন সইল, তাতে সংগ্রাম ফুরায়? আমার একমাত্র বিশ্বাস, যা আমাকে প্রবল প্রতিকূলতার মুখেও নিজের মধ্যে ধরে রাখে, তা হল—সংগ্রাম কখনো ফুরায় না। সংগ্রাম যেখানে চলবার, চলছে। তা দমনের কাজও আছে অব্যাহত।

তরুণ, এইসব লেখকরা, পেশাদারী লেখকদের অসততা ও পলায়নী মনোভাব নিয়ে ধিক্কার দেন। একশো বার দিন। কিন্তু আমার বক্তব্য হল, "তাদের কাছে তো কিছু প্রত্যাশার নেই রে বাপু। সে তো জানাই গেছে। তোমরা নিজেরা যা করতে পারতে, তা কি করছ?" বিহারের জগদীশ মাহাতো, গম্ভীরা, রামেশ্বর আহীর, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও আদিবাসী যোদ্ধারা, এঁদের

জীবনী, দাল্লি-রাঝারা খনি সংগ্রাম, সাগোয়ানা লড়াই, এগুলি কোন তরুণ লেখককে আকৃষ্ট করল না? কেউ লিখলেন না বেঠবেগার বা খেতমজুর বা বনডেড লেবার সমস্যা নিয়ে? এখন কি চুপ করে থাকার সময়?

তাঁরা যদি মনে করেন, সবাই সব জানেন—সে ক্ষমাহীন ভুল। কেউ কোন খবর রাখে না—পাঠক সমাজের বৃহদংশ। আমার লেখা "অপারেশন? বসাই টুডু" পড়ে বহু তথাকথিত সচেতন সৃজনকর্মা মানুষ বলেছেন আমাকেই, এ সব তাঁরা জানতেন না। এইসব লেখকরা যেন মনে রাখেন, সাধারণত মানুষ কিন্তু জানতে চায় না। একজন লোক অত্যুগ্র বামদরদী বলে পরিচিত হয়ে গেছেন (ধরা যাক), তিনি মোটেই জানতে চান না কোথায় পালামৌয়ে একটা আদিবাসী তিরিশ বছর আগে টিপছাপ দিয়ে ন-আনা (ছাপান্ন) পয়সা নিয়েছিল বলে "বনডেড লেবার" নিষিদ্ধ হবার পর ১৯৭৭ অবধি ছিল ক্রীতদাস। তিনি জানতে চান না শাল কেটে সেগুন লাগালে সিংভূমের আদিবাসী মানুষ তীরধনুক নিয়ে লড়াইয়ে নামছে কেন।

আমি এই তরুণ লেখক-শিল্পীদের বলব, বারবার, শোষণের নকশা খুলে দেখিয়ে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে লিখে চলতে। সিনেমায় ভদ্র নকশাল ছেলেদেরই দেখা যাবে। তারা যেমন, তেমন নয়—পরিচালক সুকৌশলে তাদের অন্যভাবে দেখাবেন। সে তো হবেই। তাঁরা কি ভুমাইয়া ও গৌড় বা গম্ভীরা বা জগদীশকে নিয়ে ছবি করতে যাবেন?

এতবার বলছি কেন একই কথা? সময় বড় মন্দ। সময়ের নাড়ির এখন কুঞ্চিত সর্পিল গতি, নকশালদের বিষয়ে দেশের মনকে অনীহ করে দেওয়া কেন দরকার? কেন না একমাত্র তারাই ভুল করে হোক, যে ভাবে হোক, মৌল সমস্যার দিকে মানুষের চোখ ফেরাতে পারে। নিঃস্ব ও বঞ্চিতের সংগ্রাম এখনো চলছে, দিল্লীর শাহীবদল-পালার মধ্যেই।

অতএব, একদিকে নকশাল নেতৃত্বে ডেবরা অঞ্চলে সরকারী হারে খেত মজুরি চাইলে পুলিস নামিয়ে দাও, অন্যদিকে সযত্নে লুকানো থাক দমন-নীতি। বরং বিপ্লবকে করে দাও বিক্রীতব্য পণ্য। বিপ্লব তো এখন চড়া দামে বিকোচ্ছে। যাত্রায় বিপ্লব সবচেয়ে বেশি। আজ রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা, কাল সিঁদুর দিও না মুছে, পরশু হো চি-মিন। পালানাট্য লিখছেন বিশাল বিপ্লবী। টাকার খেলাও ছোটখাট জাতীয় প্রকল্প ব্যয় প্রমাণ। বস্তুত বিপ্লব এখন বিশাল প্রমোদ-শিল্প।

সিনেমায় বিপ্লব, যাত্রায় বিপ্লব, থিয়েটারে বিপ্লব। এতে কি জনমানসে এ ধারণাও হয় না, যে বিপ্লব শেষ অবধি জনসাধারণকে আমোদ দেবার ব্যাপার মাত্র? ওদিকে কোটি কোটি টাকা লগ্নী করে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কাগজ পত্রপত্রিকা বের করার আয়োজন সম্পূর্ণ। মাথায় পচ ধরাতেই হবে।

সংকট কাল। আমার ধারণা, এর চেয়ে বড় সংকট এর আগে আসে নি। এখন সময় কাজ করার। "আমরা তো করেছি যা করবার"—এই আত্মসন্তুষ্টির সময় নয়। কেন না যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁরা পেশাদারী লেখক শিল্পীকে ক্ষমা করেন নি। এইসব সচেতন ও অঙ্গীকারবদ্ধ লেখক-শিল্পীর দায়িত্ব হল, চলমান ও অতীত সংগ্রামকে যুক্তি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক যাথার্থ্যে উপস্থাপিত করা। তা করা হয়নি বলে এই সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অসীম ঔদ্ধত্যে বাঙালী অর্থনীতিবিদ সুপরিকল্পনায় আন্দোলনকে নস্যাৎ করেন ও পার পেয়ে যান। দায়িত্ব পালন না করলে চলমান সংগ্রামের মানুষগুলি এই সব লেখককেও ক্ষমা করবেন না। যাদের কাছে আশা করার কিছু নেই, তাদের দোষারোপ করে চলা নিজেকে অপচয় করা মাত্র। এ একটি মধ্যবিত্ত অভ্যাস। এতে নিজের ভূমিকা পালন না করার দোষ ক্ষালন হয় না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

কালকেতু ফুল্লরার গল্প

(মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল মনে রেখে)

ফুরায় না
ফুল্লরার বারমাস্যা
আর
শূন্য হাতে কালকেতুর
ফিরে আসা
ঘরে
মুখোমুখি
দারুণ উপবাসে ;
ফুরায় না
দুটি অসহায় মানুষের
সারাদিন
ক্ষুধায় জ্বলতে থাকা
সারা রাত···
তবু
তারা স্বপ্ন দেখে
মাঠ ভর্তি ধানের
আর
বুকভর্তি ভালবাসার
আর
স্বপ্ন দেখতে দেখতে
কালকেতু রাজা হয়, ফুল্লরার মুখে
আবির লাগে।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

চলচ্চিত্র

টুপী মাথায় মানুষ

বুড়ো আঙুলে আকাশ মাপছে
মানুষটা
ব্যাঙের ছাতার মস্ত টুপী মাথায় দিয়ে,

বামনের দেশে।

চোরের মা

চুরির ধন আগলে রাখেন মা :
ছেলে
আজ আছে মন্ত্রী, কাল নেই।

সময়, স্বদেশ, রাজনীতি

মনে হয়
কোথাও এই অমানুষিকতার
শেষ আছে।

ভাবতে ভাল লাগে।

২৮ অগাস্ট, ১৯৭৯

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

শাদা মেঘ

রাত বারোটার পর দক্ষিণের নীল সমুদ্র থেকে বড় বড়
শাদা মেঘ উঠে আসে।
দেশি হাওয়া তাদের টেনে আনে দোটানায়-ভোগা
নির্জলা শহরের দিকে, সঙ্গে থাকে
ঘোট-পাকানো দু'রকম বিদেশি বাতাসের ফুসলানি,
এই সব ভ্রষ্ট ভাসমান তুলোর পাহাড়ে কোনো বৃষ্টি নেই—
শুধু রাত্রির আকাশ থেকে চাষ-না-পড়া জমির
ফাটলের ভিতর নেমে আসে অন্ধকারের শুকনো জিভ—
সমস্ত তেষ্টাকে পরাস্ত ক'রে যে সামান্য গিমাশাক টিকে ছিলো
তাদের সমগ্র রস চুষে নিয়ে এই রাত্রি চ'লে যায়
পুরোনো এবং ভয়ানক নতুন করাতে চিরে-ফেলা দিনের দিকে
রাত্রির প্রান্ত হাল্কা লাল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে
মেঘের চাঁইরাও শাদা বাঘের মত
দিগন্তের দিকে গা-ঢাকা দেয়,
তাদের ঠোঁটে লেগে থাকে ভারতীয় জননীর রক্ত—
আর একটা রস-চোষা রাত্রির জন্য তারা
পশ্চিম গোলার্ধে অপেক্ষা করে।

ঘটনা এবং চরিত্রের ঠিক মাঝখানে চাপা থাকে
মালসায় ভরা তুষের আগুন—
প্রতিটি বুক এবং আঙুল গোপনে সুসিদ্ধ হবার আগে ও পরে
নাটকে বা চলচ্চিত্রে তারা মহৎ এবং উপভোগ্য, কিন্তু
বাস্তবে নিজের নিজের অস্থির ভিতরে বা শ্রেণীগত দহনে
তাদের বহন করতে গেলে পাঁজর খসে যায়,

মাঝরাতে সেইসব সঙ্ঘবদ্ধ সন্ত্রাস শাদা পোষাকে বের হয়—
মাথার ভিতরে অনিদ্রার ভিতরে স্মৃতি এবং ক্ষরণের ভিতরে
জন্ম ও যান্ত্রিকতার ভিতরে তারা হল্লা করে এবং
লুটপাট ক'রে বেড়ায়—
স্বপ্নের ভিতরেই মানুষের অর্ধেক সংসার,
তার উপার্জিত স্বাধীনতা এবং অন্তহীন ভ্রমণ,
অসমাপ্ত সাধনা এবং দুষ্প্রাপ্য পরমায়ু,
তাই জাগরণে বড় কষ্ট, তার উপর এই কালো রাত্রির নিচে
লক্ষ লক্ষ কালো চামড়ার কালো অঙ্গীকারে এক সশস্ত্র প্রতীক্ষা—
আর ঠিক মাঝরাতে কালো সমুদ্র থেকে উঠে আসে
অ্যালুমিনিয়ামে তৈরী বিরাট বিরাট সাঁজোয়াগাড়ি—
তারা ক্রমাগত স্বপ্ন এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে
সারা আকাশে টহল দিয়ে বেড়ায়।

তারপর একদিন রাত্রির অনিবার্য কৃষকেরা
প্রস্তুত ঘোড়াগুলোকে প্রচণ্ড চাবুক কষিয়ে
এক লাফে অনন্ত আকাশে উঠে যায়,
বিশাল বিশাল মেঘখণ্ডকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে
সারা আকাশে ছড়িয়ে দেয়—
দু'একটা মোড়ল মেঘ হাত ফসকে পশ্চিমা বাতাসে পালিয়ে যায়,
শিশুদের বুকে দমবন্ধ গ্রীষ্মের উপর যে দুঃস্বপ্নের
চারখানা জগদ্দল লেপ চাপা ছিলো
ঘোড়ার ক্ষুরের লাথিতে লাথিতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে
ভিতরের শাদা সন্ত্রাস সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে,
আক্ষিপ্ত আতঙ্কে আর নিষ্পেষিত মমতায় তারা
ধীরে ধীরে গলতে থাকে—
আকাশ ভেঙে নেমে আসে গ্রাম শহরের
নামকরা জলহীন জড় ও চৈতন্যের অন্তহীন
দ্বন্দ্বের উপর—

ধীরে ধীরে জেগে ওঠে পর্যাপ্ত পানের বরজ এবং
সরল সুপারি বাগান।

কিন্তু এ সব তো পদাহত স্বপ্নের ভিতরে
পরাহত স্বাধীনতার সংক্রামক সংলাপ।
আজও মাঝ রাতে কালো কালির সমুদ্র থেকে
ল্যাজ-আছড়ানো শাদা মেঘ হামাগুড়ি দিয়ে
উঠে আসে, আর
আতঙ্কে অবশ হয়ে যায় ঘুমন্ত অপ্রস্তুত জনপদ,
কলকারখানা-অফিস-আদালতে সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে
কর্মীদের বুকের ভিতরে দাপিয়ে বেড়ায় টুকরো টুকরো শাদা মেঘ,
উত্থানকে ঘিরে উপার্জনকে ঘিরে অন্ধত্ব এবং
অনিশ্চয়তাকে ঘিরে প্রচেষ্টা এবং ব্যর্থতাকে ঘিরে
বিবেক এবং বিসর্জনকে ঘিরে
তারা সারাদিন সারারাত কখনো ঘন ধোঁয়ার মত
কখনো বা শাদা চিতার লোমের মত গুচ্ছ গুচ্ছ উড়ে বেড়ায়—
আবার ভোর হবার আগেই নিহত রাত্রির রক্তে স্নান ক'রে
পশ্চিমের পৃথক পৃথক দুর্গে পালিয়ে যায়
দু'রকম শাদা মেঘ—
আজও তারা দল বেঁধে আসে, মাঝরাতে, কখনো কখনো
ঠিক বারোটায়, বা বারোটার
একটু পরে।

সব্যসাচী দেব

উষ্ণতার জন্য

শীতের সকালে নদীর জলে পা ডুবিয়ে
রুখা মানুষ হেঁটে যায় জঙ্গলের দিকে,
তার খড়ি-ওঠা মুখে আবহমান সূর্যাস্ত ;
হিমহাওয়া কাঁপিয়ে দেয় তার শরীরকে
টিলার ওপরে বুনো ঝোপের আড়ালে
লুকিয়ে থাকা কুয়াশা ঝাঁপিয়ে পড়ে।
তার শুকনো ফাটা ঠোঁটে কোনদিন উড়ে আসেনি
জলপাই পাতা,
কোনদিন ঠিকানা পায়নি সে কোন
জোতদারবিহীন স্বদেশের,
তার জাগরণে যায় বিভাবরী ক্ষিধের জ্বালায় আর
বুনো শূয়োর তাড়িয়ে,
এর মাঝে সে এক সঙ্গে জ্বলে উঠতে দেখেছে
খেতমজুরের কুঁড়েঘর আর বাবুদের ঝাড়লণ্ঠন।

সেও একটু উত্তাপ খোঁজে শরীর উম্ রাখার জন্য ;
নদী পেরিয়ে সে হেঁটে যায় জঙ্গলের দিকে,
যেখানে গাছেরা মাথা উঁচিয়ে দিয়েছে সূর্যের দিকে,
শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে আনে সে ;
কাঠে কাঠ ঘসতে ঘসতে সে টের পায়
তার হাতের মধ্যে এসে যাচ্ছে আগুন—
শীত, কুয়াশা, বুনো শূয়োর আর জোতদারের থাবার বাইরে
জীবনকে সেঁকে নেবার জন্য
এক বিশাল, মহিমময় আগুন।

সব্যসাচী সেনগুপ্ত

শার্দুল পুরাণ

(একটি পুরাণো গল্প)

বাঘ দেখে ভয় পেয়েছিল ছেলেগুলো।
তখন অবশ্য ছোট্ট ওরা, একেবারেই ছোট্ট।
সবাই ওদের বলেছিল, "এই খোকারা, কাছে যাস্‌নি। বাঘ ধরবে।"
কাছে যায়নি।

বিরাট প্রাসাদচূড়ায় থাকতো বাঘ,
ঠিক যেন একটা রাজা।
ভয়েই ওদের কারো চোখ পুরো খুলত না।
এ ওকে ফিসফিসিয়ে বলতো "দেখেছিস্‌ বা-আ-ঘ।"
ব্যাস্‌, ওই পর্য্যন্তই।

বাঘের পাহারাদারেরা ভারী ওস্তাদ,
কী গম্ভীর ধরনের জ্ঞানী মুখ তাদের!
প্রতিদিন আস্‌তো ওরা ছেলেদের পাড়ায়,
ছেলেদের বাপ-দাদাদের কাছ
থেকে বাঘের খাজনা নিয়ে যেত।
তাই নাকি নিয়ম।

জ্ঞানের প্রথম প্রভাতে বাবারা দাদারা বলেছেন, "নিয়ম মেনে চলো।"
"নিয়ম সর্বব্যাপী, পৃথিবীও নিয়মে ঘোরে," বিজ্ঞানীরা বলেছেন।
বিনা প্রশ্নে খাজনা যেত পাড়া থেকে।
নিয়ম যে।

২

অবচেতনায় নিয়ম চলেনা, এই রক্ষে।
স্বপ্নে যদি ওদের কেউ চেঁচাত, "আমি বাঘ মারতে যাবো…,"
বুড়ী ঠান্‌দি কানে হাত চাপা দিত, বলতো, "খোকা, ঘুমো,"
খোকা ঘুমোল। প্রশ্নহীন আদিম শান্তিতে বাঘের পাড়া
তো জুড়িয়েই ছিল। তবুও দেশে কিছু একটা আসে।
নইলে মুশকিলে পড়েন ঐতিহাসিক।

ইতিহাসের প্রয়োজনেই তাই, বৃষ্টি এলো দেশে,
বাঘে গেয়েছে ধান, খাজনা যোগাতে আটচালার খড় গিয়েছে ভেসে।
বৃষ্টিতে ভিজে খোকাদের ঘুম ভাঙে।
চোখ কচলে বাঘের দিকে ভালোভাবে তাকায়, এই প্রথমবার।
—"বাঘের গায়ে ডোরা দাগ নেই কেন?"

স্বপ্নের বুলি, বৃষ্টির শব্দ ও কৌতূহল সাহস যোগায়,
সিঁড়ি বেয়ে একদৌড়ে উঠে যায় দামাল ছেলেগুলো,
একেবারে বাঘের কাছে,
বাঘ চেঁচায়ওনা একবারটি।
ওরা ছাখে, বাঘটা কাগজের।

এত বড় প্রাসাদের আবর্জনা পরিষ্কার করতে লোক লাগে প্রচুর।
ওরা হাত তুলে লোক ডাকে।
ডেকে বলে, "ছাখো হে, বাঘটা কাগজের।"

……

কবি এখানেই থামেন।
এরপর কলম ধরেন ঐতিহাসিক—
"এক সময়ে…দেশটিতে এক কাগজের বাঘ বাস করত…"
ইতিহাস এগিয়ে যায়।

রণজিৎ সিংহ

সাহিত্য-বাজার

ভেড়ির মালিক স্বপ্ন পেলেন : আমি সাহিত্যপত্রিকার মালিক। ভেড়ির মালিক সাহিত্যপত্রিকার মালিক হলেন।

সাহিত্যপত্রিকার মালিক শুঁড়িখানার নাগরকে বললেন : কাল থেকে তুমি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। শুঁড়িখানার নাগর সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক হলেন।

সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক নীলামে দর হাঁকলেন। গুটি গুটি এগিয়ে এলেন এক পাল কলমচি। ওজন বুঝে সম্পাদক তাদের ভাগ করলেন কয়েক সারে। হৃষ্টপুষ্টদের বললেন : কাল থেকে তোমরা ঔপন্যাসিক। হৃষ্টপুষ্টরা ঔপন্যাসিক হয়ে গেলেন। মাঝারিদের বললেন : কাল থেকে তোমরা সমালোচক। মাঝারিরা সমালোচক হয়ে গেলেন। ক্ষীণাঙ্গদের বললেন : কাল থেকে তোমরা কবি। ক্ষীণাঙ্গরা তক্ষুনি কিচির মিচির জুড়ে দিলেন।

দারুণ ধরল বাজার।

আজ এখানে কাল ওখানে পরশু সেখানে। সাহিত্যপত্রিকার মালিক পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব এবং প্রধান আতিথ্য সেরেসুরে আর ভেড়ির কারবার দেখার ফুরসৎ পান না।

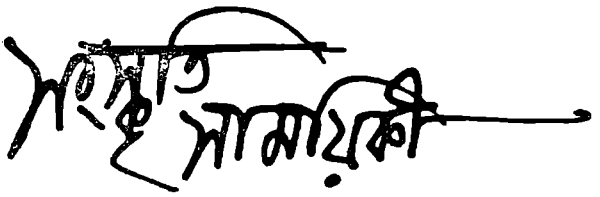

সংস্কৃতি সাময়িকী

সংসদীয় গণতন্ত্র ও ভারতীয় সমাজ-গণতন্ত্রীগণ

'৭৭-এর নির্বাচন ও জনতা দলের ক্ষমতায় আসীন হওয়াকে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রথম ধাপ বলে অভিহিত করেছিলেন। তৎকালে এই ঘটনাকে ভারতীয় জনগণের দ্বিতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তি বলেও বর্ণনা করা হয়েছিল। এমনকি CPI(M) নেতা শ্রীবাসবপুন্নাইয়া বলেছিলেন, 'একটি গুণগত-ভাবে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে' কারণ 'গত নব্বই বছরেরও বেশীকাল ধরে যে কংগ্রেস পার্টি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজেকে বিকশিত করেছিল সেই পার্টি চিরদিনের মতো তার প্রাধান্য হারিয়েছে।' (দেশহিতৈষী, শারদসংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬) এইসব বক্তব্য ও তত্ত্ব থেকে উচ্ছ্বাসটুকু বাদ দিলে অবশিষ্টাংশের হিসাব ইতিমধ্যে অনেকটাই পাওয়া গেছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে জরুরী অবস্থা চলাকালে ইন্দিরা গান্ধীর কর্মসূচী ভারতের শাসকশ্রেণীগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য—'sensitive and realistic'—ছিল। তবুও '৭৭-এর নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল। কারণ ভারতের নিরন্ন শোষিত জনগণকে ধোঁকা দেবার কাজে ইন্দিরা গান্ধীর উপযোগিতা তখনো কতখানি, সেটার একটা হিসাব শাসকশ্রেণীগুলোর কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ছিল। নচেৎ শোষকশ্রেণীগুলোর প্রিয়তম গ্রন্থ ভারতীয় সংবিধান ও ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর বিমূর্ত গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিটি কতখানি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। আমরা বলেছিলাম, ইন্দিরা গান্ধীর এই পরাজয় বস্তুত ভারতবর্ষের ঐ গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করেছে। (প্রস্তুতিপর্ব, এপ্রিল '৭৭)

বলা বাহুল্য শোষকশ্রেণীগুলো জনতা দলের মাধ্যমে তাদের কাম্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষত, CISF, CRP এবং পুলিশ বাহিনীর ব্যাপক

ও অনেক পরিমাণে সংগঠিত আন্দোলন ও সেই আন্দোলন দমনে জনতা পার্টি অনুসৃত পদ্ধতি ঐ দলের অর্বাচীনতা প্রকটভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। গত নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন—জনতা দলের কোন নেতা নেই। প্রচারটি যে শোষকশ্রেণীগুলির প্রতিই একটি হুঁশিয়ারী ছিল তা আজ প্রমাণিত।

নির্বাচনের পরে কমিশন, বিশেষ আদালত এবং জনগণের আন্তরিক ঘৃণার মুখোমুখি হয়েও ইন্দিরাজী জরুরী অবস্থা জারী করার জন্য এতটুকু লজ্জা প্রকাশ করেননি—হয়ত নিজের দূরদর্শিতায় গর্বিতই হয়েছেন। কারণ জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ মুখে যত বড় কথাই বলুন না কেন, বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো ভারতবর্ষে তাদের পুঁজি যথারীতি বাড়িয়েছে, লভ্যাংশ রয়্যালটি বেশী নিয়ে গেছে, শিল্প-সম্পর্ক বিল থেকে শুরু করে PD Act চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে বলেও জনতা দল মনে করে। অতএব ইন্দিরা গান্ধী শাসকশ্রেণীগুলোর কাছে একথা বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন যে বর্তমানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরনো সংসদীয় গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়েছে। সংবিধান অচল হয়ে গেছে। এবং জরুরী অবস্থাকালীন ব্যবস্থাই বর্তমানে প্রযোজ্য।

এক কথায় ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এমন একটা সংকটের মুখোমুখি হয়েছে যা থেকে শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষে মুক্তি পাওয়া ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছে। তার মানে অবশ্য একথা বলা নয় যে পার্লামেণ্ট কাল সকালেই ভেঙে পড়বে। তার মানে এই যে ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। এবং তার অর্থ, হয় ভারতের শ্রমজীবী জনগণ শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন ভবিষ্যৎ ছিনিয়ে আনবেন, নচেৎ জরুরী অবস্থাকালীন যে ব্যবস্থা আমরা এবার প্রত্যক্ষ করেছি তার পুনরাবৃত্তি—হয়ত অন্য মোড়কে, হয়ত বা আরো সুন্দর সমাজতন্ত্রের বুলি দিয়ে মোড়া। কিন্তু সবচেয়ে হাস্যকর এই যে, কোন রাজনৈতিক দলের কোন নেতাই মোরারজী সরকারের তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়াকে মোরারজীর প্রতি শাসকশ্রেণীগুলির অনাস্থাপ্রকাশ হিসাবে দেখতে এবং জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। যা করলে হয়তো গোটা দেশ জুড়ে একটা প্রকৃত বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা তৈরীর আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারত। এ কাজটি করার স্বঘোষিত দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা সংসদের মধ্যে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন যে সংসদের

বাইরের ব্যাপক জনগণের কথা তাঁদের নির্বাচনী প্রচারের আগে আর মনে পড়বে না। তাই তাঁরা শুধু বিকল্প সরকার গঠনের কৌশল নিয়েই ব্যস্ত।

লেনিনের সেই বিখ্যাত কথাগুলি স্মরণ করা যাক। "…শোষিত এবং নিপীড়িত জনগণ পুরোনো পদ্ধতিতে বেঁচে থাকার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করলেই এবং পরিবর্তনের দাবী জানালেই যে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবে, এমন নয়; বিপ্লব সংঘটনের জন্য এটা অপরিহার্য যে শোষকদেরকে আর পুরোনো পদ্ধতিতে বাঁচতে বা শাসন করতে দেওয়া হবে না। বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে তখনই যখন **নিম্নতর শ্রেণীগুলি আর পুরোনো পদ্ধতিতে জীবন চালাতে চায় না, এবং 'উচ্চতর শ্রেণীগুলি' আর পুরোনো পদ্ধতিতে জীবন চালাতে পারে না।**"

ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীগুলো যে আর পুরোনো পদ্ধতিতে শাসন করতে পারছে না সেটা পরিষ্কার। কেবল স্থায়ী রাজনৈতিক সংকটই নয়, পুলিশ, CISF, CRP-র বিদ্রোহও তার নিদর্শন। আর শোষিত, নিপীড়িত জনগণ যে পুরোনো পদ্ধতিতে জীবন চালাতে চান না, সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অথচ লেনিনের যুক্তি দিয়ে যাঁরা নির্বাচনে ও পার্লামেন্টে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের কথা বলে আসছেন, তাঁরা লেনিনের এই যুক্তিটা সম্পর্কে নীরব। পার্লামেন্ট আজ মুমূর্ষু, শাসকশ্রেণী আভ্যন্তরীণ সংকটে দ্বিধাগ্রস্ত। গোটা ব্যাপারটার প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ। আর, এইরকম অনুকূল অবস্থায় মার্কসবাদের ধ্বজাধারী কমিউনিস্ট পার্টি প্রাণপণে এই পচাগলা ব্যবস্থাটার প্রতি জনগণের মোহকে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন। বস্তুতঃ, তাঁরা পার্লামেন্টকে ব্যবহার করছেন, না পার্লামেন্ট তাঁদেরকে ব্যবহার করছেন? তাঁরা (লেনিনের কথামতো) সংসদীয় ব্যবস্থার মুখোশ খুলে দিচ্ছেন, না সংসদীয় ব্যবস্থা তাঁদের মুখোশ খুলে দিচ্ছে? 'আমরা জনতা দলকে সাবধান করেছিলাম, তাঁরা শোনেননি'—একথা বলার অর্থ কি নিজেদেরকে শাসকশ্রেণীর B-team হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা নয়?

অতএব আগামী "বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প" বলে যে মোর্চা হবার সম্ভাবনা প্রবল তা হল কংগ্রেস (এস)+জনতা (এস)+CPI(M)+CPI এবং অন্যান্য 'বামপন্থী' আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে। চরণ সিং তাতে নিমরাজী। 'কমিউনিস্ট'দের সঙ্গে চরণ সিং-এর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হতে আপাতত অন্তত আপত্তি নেই। (সাক্ষাৎকার, *Sunday* ২৬. ৮. ৭৯)

এই মিত্রতার মেয়াদ কি খুব বেশী হওয়া সম্ভব? এক মিনিটও পার্লামেণ্টে না বসে চরণ সিং সরকারের পক্ষ থেকে শিল্পমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী ও রেলমন্ত্রী টি. এ. পাই 'ভারতীয়' একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উদ্দেশে বলেছেন যে, বৃহৎ শিল্পকারখানাগুলির উৎপাদনের উপর যে বিধিনিষেধগুলি আছে সেগুলি তুলে নেওয়া হবে। (*Financial Express*, ৮. ৮. ৭৯)। বলা বাহুল্য যে শিল্প-পতিদের সংগঠন FICCI-এর সভাপতি শ্রীসিংহানিয়াও একই ওষুধ বাতলে-ছিলেন মাত্র কয়েকদিন আগে। যদিও জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ 'সমাজগণতন্ত্রী' ব্যক্তিত্ব হিসাবে 'বুর্জোয়া' পার্লামেণ্টে মন্ত্রী হয়ে থাকবার যে পদ্ধতি দেখিয়েছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য: শুধু মাঝে মাঝে TISCOকে জাতীয়করণের হুমকি দেখালেই প্রগতিশীল থাকা যায়!

অবশেষে আমরা মনে করি আগামী নির্বাচনে ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলির প্রভাবশালী অংশটি (খুব স্পষ্ট দুটি 'লবি' না থাকলেও) খুব সঙ্গত কারণেই জগজীবন রাম এবং ইন্দিরা গান্ধীর জন্য তাদের সামর্থ ব্যয় করবে। মার্কিন ও বৃটিশ পুঁজির সমর্থনও তাঁরাই এবার পাবেন।

আর সোভিয়েট পুঁজি? তাঁরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে চরণ সিং-এর নেতৃত্বে যে মোর্চা সেটা তাঁদেরই সুনজরে তৈরী। যদিও শেষ বিচারে, যারা সরকার গঠন করবে ব্রেঝনেভ তাদের।

—অংশু চৌধুরী

৯.৯.৭৯

রাজহরা সংবাদ

ভিলাই ষ্টিলের ফারনেসে লোহা সরবরাহ করা খনি রাজহরা। রাজহরার সংখ্যাগরিষ্ঠ জংগী সংগঠন CMSS (ছত্তিশগড় শ্রমিক সংঘ) গত ১৩/৭/৭৯ তারিখে বালোদ আদালত ভবন ঘেরাও করেন এবং ফার্ষ্টক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটকে আটক করে রাখেন। এ ঘটনা মধ্যপ্রদেশ প্রশাসনকে বেশ জোরালো নাড়া দিয়েছে এবং আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে।

হাস্যকর তোড়জোড় দেখা গেছে এর তেরোদিন পরে ২৬/৭/৭৯-এ। CMSS-এর নেতা শংকর গুহনিয়োগী এবং আরো চারজন কমরেড এদিন

আদালতে গেলে দেখতে পান প্রায় এক হাজার মিলিটারী, পুলিশ, রাইফেল, মেশিনগান আর ঢাল নিয়ে আদালতভবন ঘিরে আছে। বিচারকদের নিরাপত্তার খাতিরে, না এই বিচারব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার নিষ্ফল প্রয়াস? কেননা নিয়োগী সহ CMSS-এর বিরুদ্ধে অগুন্তি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং CMSS এই বিচারব্যবস্থা মানতে রাজী নয়।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে নিয়োগী জানিয়েছেন, রাজহরার কয়েকজন ঠিকাদার গত ২৯।৬।৭৯ তারিখে বালোদ আদালতে CMSS-এর বিরুদ্ধে একটি নূতন মামলা তুলেছেন—শ্রমিকরা ঠিকাদারদের ঘেরাও করতে পারবে না, হরতাল করলে অনুমতি চাইতে হবে, জংগী আন্দোলন আদৌ চলবে না।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ. পি. সেনের একটি মামলার রায় উদ্ধৃত করে বালোদের বিচারপতি CMSS-এর বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে হরতাল, ঘেরাও বন্ধ রাখা প্রয়োজন। এবং ঠিকাদারদের পক্ষে রায় দেন। এরপরই লাল সবুজ পতাকা আর ইউনিফর্ম পরা শ্রমিকরা কোর্ট ঘেরাও ক'রে বিচার ব্যবস্থা পণ্ড করে দেন। শ্লোগান ওঠে—"তুম আদালত চলতে হো তোমহারে পথ পর, হম লড়তে হ্যায় হমারে পথ পর।" "হরতাল ঘেরাও হমারে হক হ্যায়।" প্রশাসন বিস্মিত, কেননা এরকম খবর ছিল না যে এত দ্রুত গতিতে CMSS কোর্ট ঘেরাও করবে।

পরবর্তী অধ্যায় হাস্যকর। গত ২৬/৭/৭৯এ CMSS-এর পাঁচজন কমরেডকে নিয়ে আদালতে প্রায় এক হাজার মিলিটারি বন্দুক দিয়ে বিচারব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়।

স্থানীয় একটি হিন্দি দৈনিক "সবেরা সংকেত" অর্ধসত্য এক টুকরো খবর ছাপিয়ে নীরব। অন্যান্য বুর্জোয়া দুটো স্থানীয় কাগজের বক্তব্য—আদালতের নাকি অবমাননা করা হয়েছে ১৩ তারিখের ঘেরাওতে। অবশ্য ঠিকাদাররা যেসব নিন্দামূলক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে সেগুলোকে এরা ফলাও করে ছাপতে ওস্তাদ।

জি. এম. আনসার

১৩/৮/৭৯

রাজনৈতিক থিয়েটার গড়ে উঠেছে কি?

১৯৭৯র মাঝামাঝি হঠাৎ যদি কোন প্রতিষ্ঠিত এবং দায়িত্বশীল "গ্রুপ

থিয়েটার" সংস্থা উপরোক্ত শিরোনামে আলোচনাসভার আয়োজন করে, মুহূর্তেই যে আশা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা হল: নিশ্চয় নতুন করে রাজনৈতিক থিয়েটার সম্পর্কিত নতুন দিশার জন্যেই এই আলোচনা। কারণ, ইতিপূর্বে গণনাট্য যুগ অতিক্রান্ত, নবনাট্য ও অন্য থিয়েটারের রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় নিষ্ঠাবান সাংস্কৃতিক কর্মীরা আক্রান্ত এবং পণ্য-থিয়েটারের চক্রান্ত উদ্ঘাটিত। এ সবইতো এক এক জাতীয় রাজনীতিরই প্রতিফলন। ১৯৭৯-কে 'বর্ষপঞ্জী'র কয়েকটা সংখ্যার যোগফল মনে করলে ভুল হবে, এই সালের অভিজ্ঞতা বহু রকমের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনায় বিশেষভাবে চিহ্নিত। সুতরাং, দায়িত্বশীল গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা এই পরিপ্রেক্ষিতে কী হবে সেটাও এই আলোচনায় ছিল বাঞ্ছিত। আর এই কর্তব্যে অবহেলা, কিম্বা অন্য কোন কৌশল দ্বারা আগামী দিনের গ্রুপ থিয়েটারকে কুক্ষিগত করার চালাকী আজ অতি সহজে ধরা পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তাই ১১ই জুলাই "থিয়েটার ওয়ার্কশপ" আয়োজিত আলোচনা সভাটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়,, নির্বাচিত বক্তারা ছিলেন, উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও অরুণ মুখোপাধ্যায়। এবং 'এ্যাসিমিলেশনে'র দায়িত্ব ছিল শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। লোড শেডিং, অসহ্য গরমে দীর্ঘ-প্রতীক্ষা, "মুক্তি চাই", "আমার লেনিন" তথ্যচিত্রটি দুটি প্রদর্শন হবে না শুনে একশ্রেণীর আসন-গ্রহণ-করা শ্রোতার নৈরাশ্যের নিঃশ্বাস মাটির আসনগুলো ছুঁয়ে গেল। উৎপল দত্ত শুটিংএ ব্যস্ত; আসতে পারবেন না শোনা গেল।

আলোচনার শুরুতে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় "আপোষের মাধ্যমে সাধারণ মঞ্চে চলা"র ইঙ্গিত দেওয়াতেই বোঝা গেল আলোচনার সীমাবদ্ধতা। প্রথম বক্তারূপে হাজির হলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু রাজনৈতিক থিয়েটার সম্পর্কে কী যে বলবেন তাই খুঁজে পেলেন না। এদেশে রাজনৈতিক থিয়েটারের অগ্রগতি হয়েছে কি হয়নি, তার শুদ্ধতা, সততা এবং কি কারণে রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রসঙ্গ বারবার মাথা চাড়া দিচ্ছে এসবের একটা লাইনও তাঁর মুখে শোনা গেল না। সত্যি তো ওঁর কী বা আর বলার আছে? মনে হল. দুবছর ধরে এতবার বামফ্রন্ট শব্দটা মহড়া দিয়ে রপ্ত করেছেন যে, প্রতিবার "বামপন্থী" শব্দটা "বামফ…" বলেই শুধরে নিতে হচ্ছিল তাঁকে। তবু অতীত ঐতিহ্য পটেই যখন তাঁর এই মঞ্চে প্রবেশ সুতরাং গণনাট্য পরবর্তীকালে আদি ও

অকৃত্রিম "গ্রামে যাওয়া হয় নাই—হয় নাই" রেকর্ডের ওপর ভোঁতা পিনটা চালিয়ে গেলেন। কনফেশনের পিনটা ভেঙ্গে গেল, চাগিয়ে উঠল মহান দায়িত্ববোধ এবং সমালোচনার সময়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কোন এক সংস্থা (নাম বলেননি) গ্রুপ থিয়েটারকে আহ্বান না জানানোয় তিনি যে আহত, প্রমাণ করতে চাইলেন এবং সুযোগ সন্ধানী ক্ষোভ প্রকাশ করে গুটি গুটি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এরপর এলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। অন্তরঙ্গ বাচনিক কারুকৃতিতে শোনালেন তাঁর জীবনের সাম্প্রতিক দুটি বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা। এক, সিউড়ী অঞ্চলে আদিবাসী এলাকায় এক মায়ের করুণ কাহিনী। সভ্যজাগতিক মানুষদের আচার আচরণে এঁরা এতই ক্ষুব্ধ এবং উদাসীন যে মুমূর্ষু সন্তানের চিকিৎসার জন্য শ্রীচট্টোপাধ্যায়রা অনুরোধ জানালেও, সেই মা তা প্রত্যাখ্যান করে সন্তানকে নিয়ে ছুটে পালালেন জঙ্গলে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার স্থান, তেলেঙ্গানা। জনৈক কাজ না পাওয়া যুবক কৃষক তিনদিনের পণ্ডশ্রমে (!) একটি চামড়ার বেল্ট তৈরী করে দাঁড়িয়েছিল পথের ধারে, চট্টোপাধ্যায়রা তাদের হয়ে কাজ করতেই নাকি সেদিন সেখানে উপস্থিত। আকর্ষণীয় বেল্টটা এঁদের পছন্দ হওয়াতে কিনতে চাইলে সেই অভুক্ত যুবক কৃষক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বেচবে না বলে দিল। (বুর্জোয়া মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আদিখ্যেতা নিরক্ষর কৃষকেরা যে কত দ্রুত বুঝতে পারে···)। মর্মান্তিক পরিস্থিতিতেও, চূড়ান্ত শোষণের অবস্থাতেও কেন যে অরণ্য মানুষ, কৃষক মানুষেরা সভ্যদের, শিক্ষিতদের এমন ভাবে তাচ্ছিল্য ক'রে শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রে যোজন দূরে বাস ক'রে, কুসংস্কার, অশিক্ষায়, সামন্তীয় শোষণের মধ্যে আত্মহত্যা করে চলেছে তার একটু প্রাঞ্জল আলোচনা করলেই সমবেত শ্রোতারা কৃতজ্ঞ হত। আর সেইসঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারগুলোর সৌখিন মজুরী এবং নকল সহমর্মিতার ফিন্‌ফিনে মুখোশটাও যেত খুলে। কিন্তু তিনি শুধু দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হলেন। (অতঃপর উল্লেখনীয় সংযোজন : বিভাস চক্রবর্তী এসে মন্তব্য করে গেলেন, "বেশ জমে উঠেছে")।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে দেখা গেল বক্তৃতা মঞ্চে। আত্মভোলা টাইপের মানানসই ভঙ্গী নিয়ে নিজেকে অপ্রস্তুত এবং "পাগলাদাশু" বলে পরিচিত করালেন উৎকর্ণ শ্রোতাদের কাছে। "বেশ্যাবৃত্তি" নামক খিস্তি প্রয়োগ করে থিয়েটার নিয়ে যারা কারবার চালাচ্ছে সঙ্গে রাজনীতির হাতিয়ার নিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে পটকা ছুঁড়ে জানালেন উনি কত মহৎ। স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তিগত মহত্ত্বের

ও গুরুত্বের কথা বলাটা অনিবার্য ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। "ফুটবল" নাটকে উনি যুবমানসের উচ্ছৃঙ্খলতা, যন্ত্রণাকে এমন সুন্দর বাস্তব প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছেন যা আর কহতব্য নয়। কোলকাতার ফুটবল মাঠ, দল বেঁধে বাবার মাথায় জল দিতে তারকেশ্বরের পথে ঝাঁক ঝাঁক তরুণ তরুণীদের তাণ্ডবতার "fanaticism" হ'ল তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু যুব যন্ত্রণার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার সাম্প্রতিক এই রূপ কেন, এর জন্যে দায়ী কারা? রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা, এমন কি শাসক বামফ্রন্টও রাজনৈতিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে যে সকল প্রকরণ সম্প্রতি ব্যবহার করেছে তার পরিণতিতে যুব নৈরাজ্যের সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক ভাঙন ও সামাজিক মূল্যবোধের পচনের মূলে সর্বাপেক্ষা আগে যাদের চিহ্নিতকরণ এবং যাদের উন্মূলন করার আওয়াজই আজকের রাজনৈতিক থিয়েটার সহ প্রত্যেক শিল্পের, সাহিত্যের মর্মবাণী হয়ে ওঠা আবশ্যিক, সে নিয়ে "ফুটবলে" বা "রুদ্রপ্রসাদ"-এর মুখে এক ছত্র সংলাপ ব্যবহার হয়নি। আর এটা করতে গেলেই committed শব্দটা সেঁটে বসবে এবং এতেই এঁর সর্বাপেক্ষা বিরোধ। পাছে দর্শকে এঁর গায়ে কোন পার্টির লেবেল এঁটে দেয় তাই সভয়ে "তীর" "মানুষের অধিকারে"র প্রশংসা করেও, আনন্দমার্গীদের মড়ার খুলি নিয়ে মিছিলের বিরুদ্ধে সর্তকতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেও "গণমিছিল" "গণসংস্কৃতি" সম্পর্কে তিনি নীরব থাকেন। তবে জরুরী অবস্থার সময়ই "আন্তিগোনে" নাটকে সফোক্লেসের মূল অংশ সংযোজন করে তিনি যে গণতন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরেছেন, সেটা জানাতে গর্বে তাঁর মুখ ফুলে ফুলে ওঠে। অবশ্য তিনি বোধহয় দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যাননি, গেলেই দেখতে পেতেন এবং শুনতে পেতেন বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিয়ে '৪৭ সাল থেকে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা এবং ঘৃণা সঞ্চিত তার জন্য সফোক্লেসের সংযোজন নিয়ে বাগাড়ম্বর করাটা কতটা হাস্যকর এবং "বেশ্যাবৃত্তি" নামক শব্দটা যাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, আত্মদম্ভপূর্ণ ব্যবহারের জন্য এবং গণবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির জন্য অদূর ভবিষ্যতের ঐ বিশেষণ তাঁরও খুব কাছাকাছি এসে উপস্থিত হচ্ছে।

পাঠককে শুনিয়ে রাখা উচিত এতক্ষণ ধরে প্রত্যেক বক্তাই কিন্তু ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার কথাই বলে গেছেন। আজ দুনিয়ার কোথায় কেমনভাবে রাজনৈতিক থিয়েটারের আন্দোলন চলছে, তার উচ্চতর পর্যায় কেমন, সে সবের আলোকে এ দেশের রাজনৈতিক থিয়েটার কোনোভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে কিনা

তা একজনও কেউ উচ্চারণ করেননি। অথচ আন্তর্জাতিক থিয়েটার আন্দোলন সম্পর্কে এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা এখনও ভীষণভাবে অজ্ঞ এবং যেজন্য অধীরভাবে জানতে উৎসুক। কিন্তু এঁদের নীরবতা কি প্রমাণ করে?

অরুণ মুখোপাধ্যায়, শেষ বক্তা। সাফ সাফ জানালেন গ্রামে যেতে পারবেন না। তীব্র আক্রমণ চালালেন তাদের বিরুদ্ধে, যারা গ্রামে যাওয়ার কাঁদুনি গেয়ে গেয়ে standard of living উঁচু করতেই চলচ্চিত্রে এবং থিয়েটারে সত্তা বিকিয়ে দিয়েছে। জলন্ত কথা, কিন্তু তিনিও যেসব experiment করেছেন ঠাণ্ডা ঘরগুলোয়, সে সবগুলোই বা কাদের সেবা করছে? তাঁর experiment কাদের হয়ে, কাদের art instinct উল্লম্ফনে সাহায্য করছে? এ সকল experiment-এর সংবিদ কি ব্যাপক মানুষকে সংগ্রামী করে তুলতে সহায়ক, না art এর form নিয়ে পরীক্ষা এবং ক্রমশ পেটিবুর্জোয়া আত্মমগ্নতায় সমাধিস্থ হওয়ার হিপনোটিজম!

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের assimilation শুরু হ'ল। ব্যক্তিগত আক্রমণ যে বিচ্ছিন্ন পেটিবুর্জোয়াদের সহজাত স্বভাব এবং এ সবই যে সামগ্রিক আলোচনাকে কোনভাবেই সাহায্য না করে কেবল স্ব স্ব চিন্তাকে উৎক্ষিপ্ত করে চলে, সেটা বুঝেই তিনি শান্তি বারি দিলেন। '৪৮ সালেও বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন কেমন করে ছদ্মনামে থিয়েটার করেছিল, সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে আগামী দিনের অন্ধকারের আশঙ্কা জাগিয়ে কর্মব্রতী হতে আহ্বান জানালেন।

বোঝা গেল, এঁরা প্রত্যেকে সচেতনভাবেই গ্রামে যাওয়া না যাওয়া সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, শোষণ মুক্তি, মূল্যবোধ, ইন্দিরা সরকারের ভাঁওতাবাজী নিয়ে পরিবর্তিত অবস্থায় ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্য ব্যবহার করেন, কিন্তু শোষণমুক্তির জন্যে আজ এই মুহূর্ত হতে সর্বহারার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কাজই যে ভবিষ্যৎ অন্ধকারকে দূর করে আলোকিত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে এবং তার জন্য সমবেত সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্তব্য কী হওয়া উচিত সে সব সম্পর্কে নীরব থাকা শ্রেয় ভেবে "রাজনৈতিক থিয়েটার" আলোচনা শেষ করা শ্রেয়স্কর মনে করে ইতি টানেন।

—অনুপ রায়

চীনে ব্রেশ্‌ট্‌ চর্চা

পিকিঙের থিয়েটারভক্তরা এই প্রথম মঞ্চে একটি ব্রেশ্‌ট্‌ প্রযোজনা দেখার সুযোগ পেলেন। চীনের 'তরুণ আর্ট থিয়েটার' এখন **গ্যালিলিওর জীবন** নাটকটি করছেন। মার্চের শেষে নাটকটি শুরু করা হয়েছে। মধ্যযুগের বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রমাণ করেছিলেন যে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সঠিক—সূর্যই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। তিন ঘণ্টাব্যাপী এই নাটকে দেখানো হয়েছে কীভাবে অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে গ্যালিলিওকে তাঁর তত্ত্বপ্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল 'ইন্‌কুইজিশন'*। পরবর্তীকালে, জীবনের শেষ অধ্যায়ে, তিনি নিজেকে ভর্ৎসনা করেন এই সিদ্ধান্তের জন্য, এবং মানবসমাজের প্রগতির উদ্দেশ্যে তাঁর শেষদিনগুলিকে দিয়ে যাবার প্রয়াসে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যান।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন 'শাংহাই গণনাট্যের' প্রধান, ৭৩ বছর বয়স্ক হুয়াং জুওলিন—যিনি ৪০ বছর ধরে বিদেশী নাটক সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন; এবং চেন্‌ ইয়োং নাম্নী এক প্রতিভাময়ী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না মহিলা। এটি হুয়াঙের ১০১-তম প্রযোজনা। নাটকটি পরিচালনায় তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে হুয়াং বলেন: "সমাজের প্রতি বিজ্ঞানীর দায়িত্ব, এবং মানুষের কষ্ট লাঘবে বিজ্ঞান—নাট্যকারের এই দুই ভাবধারা আমরা অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করেছি। আর একই সঙ্গে, আমরা চেয়েছি কুসংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসার এবং গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোর ভাবধারাগুলিকেও ফুটিয়ে তুলতে।"

মূল নাটকের ১৫টি দৃশ্যকে কেটে পরিচালকদ্বয় ১২টি দৃশ্যতে নামিয়েছেন, এবং একই সঙ্গে মূল স্ক্রিপ্টের চরিত্রায়ন ও মঞ্চরূপায়ণের যতটা সম্ভব ধরে থাকার চেষ্টা করেছেন। অনুরূপভাবে, তাঁরা চীনা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ের ধরণ এবং দর্শকের রুচির উপযোগী করে নাটকটি উপস্থাপন করার প্রয়াসী হয়েছেন। ব্রেশ্‌টীয় আধা পর্দারীতি পরিচালকরা গ্রহণ করেছেন, এবং বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে সংগীতকে ব্যবহার করেছেন দুজন লোকগায়কের আবির্ভাব ঘটিয়ে। সরল বর্ণের দৃশ্যসজ্জা নির্ভেজাল সাদা আলোর ব্যবহারের সঙ্গে মিলে এর সামগ্রিক অভিঘাত হয়েছে চীনের দর্শকদের কাছে অভূতপূর্ব এবং উদ্দীপনাময়।

---

* শাস্ত্রবিরোধিতা রোধ করার উদ্দেশ্যে মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক গঠিত বিচারসভা।—স. প্র.

এই দুই প্রবীণ শিল্পী এবং চীনের 'তরুণ আর্ট থিয়েটার' **গ্যালিলিওর জীবন**কে বেছে নিয়েছেন, কারণ এই নাটকটিকে উপস্থাপিত ক'রে, এবং ব্রেশ্‌টের মূলনীতি অনুযায়ী অভিনয় ক'রে তাঁরা এই প্রথম ব্রেশটের তত্ত্বকে—অর্থাৎ, যুক্তির ওপর জোর দেওয়াকে—কাজে লাগাতে চেয়েছেন: দর্শকদের ভাবতে, বিচার করতে, এবং তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেওয়া হোক।

তবে, মহলা শুরু হবার সময় তাঁদের মনে আশংকা ছিল, তাঁরা ব্রেশটের নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি সফলভাবে রূপায়িত করতে এবং নিজেদেরকে বোধগম্য করে তুলতে পারবেন কিনা। কারণ **মাদার কারেজ এবং তার সন্তুতি** যখন শাংহাইতে ১৯৫৮ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তখন দর্শকদের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল খুবই শীতল। এ ধরণের সন্দেহ এত বেশি ব্যাপক ছিল যে **গ্যালিলিও** নির্দেশনা শুরু করার জন্য হুয়াং যখন পিকিঙের প্লেনে উঠছিলেন তখন তাঁর কন্যা তাঁর ডাক নাম দেন: "ফাদার কারেজ!"

গভীর দার্শনিক চিন্তাসমন্বিত ও অদ্বিতীয় শিল্পশৈলীর এই বিদেশী নাটকটি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সমাদর পাবে কিনা, সেটা পরীক্ষা করার জন্য এক ড্রেস রিহার্সালে দলটি আমন্ত্রণ জানান সেইসব শ্রমিককে যাঁরা পোষাক বানিয়েছেন এবং মঞ্চের সেট তৈরি করেছেন। তাঁরা যেন মোহিত হয়ে ছিলেন, কারণ সমগ্র অভিনয়টা জুড়ে প্রেক্ষাগৃহ অস্বাভাবিকরকম শান্ত ছিল, এবং অভিনয় শেষে সোল্লাস হর্ষধ্বনি ফেটে পড়ে। চেন ইয়োং সেই অবস্থাটা স্মরণ করে বলেছিলেন যে দর্শকদের এই প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁর মনে হলো যেন ঘাড়ের ওপর চেপে থাকা মস্ত পাথরটা কে তুলে নিল। পরমুহূর্তে তিনি তীব্র উল্লাস অনুভব করলেন, কারণ তখন এটা পরিষ্কার যে এমন একটা অসামান্য পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর যে প্রয়াস তাঁরা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়নি। তবু যেটুকু সন্দেহ টিকে ছিল তা দূর হয়ে গেল প্রথম অভিনয়ের বিপুল সাড়ায়। বিভিন্ন স্তরের থিয়েটার-দর্শকের—পশ্চিমী শিল্পচর্চা সম্পর্কে যাদের পরিচিতির মাত্রা নানারকম—তাঁদের কাছে **গ্যালিলিওর জীবন** একটা অতীব জনপ্রিয় এবং ভাবনা-উদ্রেককারী নাটক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

লক্ষ্য করার মতো, নতুন চীন প্রতিষ্ঠার ৩০ বর্ষপূর্তির উদ্দেশ্যে আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসবে নাটকটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এইসব অভিনয়ের ফলে এখন দেশের সমস্ত জায়গা থেকে যেসব পরামর্শ ও মন্তব্য আসছে, সেগুলিকে কাজে

লাগিয়ে স্ক্রিপ্টের আরো উন্নতি ঘটানো হবে।

১৯৫৭-র জার্মান সংস্করণ থেকে স্ক্রিপ্টটি অনুবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় নাট্য প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক। এঁকে সাহায্য করেছেন পিকিঙের একজন পশ্চিম জার্মান বিশেষজ্ঞ, এবং একজন চীনা জার্মান ভাষা-শিক্ষক। অনুবাদটিকে যথাসম্ভব মূলানুগ ও স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করেছেন এঁরা।

বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্ ছিলেন চীনা জনগণের আন্তরিক সুহৃদ, এবং চীনা সংস্কৃতির এক ছাত্রও বটে। বিশেষ করে দর্শন, কবিতা, অপেরা ও চেয়ারম্যান মাওয়ের রচনা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। চীন ভ্রমণের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন, এবং ভ্রমণের আমন্ত্রণও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চীনের শিল্পী ও থিয়েটারভক্তরা ব্রেশ্‌টের নাট্যকলা সম্পর্কে জানবার ও অনুসন্ধান করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। পঞ্চাশের দশকে তাঁর ছ'টি নাটক অনূদিত হয়েছিল। চীনা সর্বহারা নাট্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার পাশাপাশি, বিভিন্ন বিদেশী নাট্যঘরানা থেকেও চীন উপকৃত হতে ও জ্ঞানলাভ করতে পারে। **গ্যালিলিওর জীবন** থেকে একটি শ্লোক চীনা জনগণের মানসিকতাকে প্রকাশ করছে: "শিখতে হবে কী করে চোখ দুটোকে খোলা রাখা যায়। যা আমরা জানি তা বড়োই সামান্য। এ তো সবেমাত্র শুরু।"

—পিকিং রিভিয়ু
২৫/৫/৭৯

গ্রন্থ সমালোচনা

লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা ও আসাম—হেমাঙ্গ বিশ্বাস
(এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩; বারো টাকা)

শোনা যায় বিমূর্ত শিল্পের জগতেই নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন যে শিল্পী সেই পিকাসোও একদিন বিভিন্ন দেশের মানুষের পুতুল চর্চায় আগ্রহী হয়েছিলেন। তিনি নাকি লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন দেশের পুতুলের মধ্যে সেই সেই অঞ্চলের বা সমাজের এমন একটি প্রাণবন্ত বিশিষ্টতা আছে যা অন্য উচ্চাঙ্গ শিল্পে একেবারেই পাওয়া যায় না। হাজারটা একই বিষয়ের পুতুল এক জায়গায় রাখলেও একটি

সাধারণ মানুষ তার দেশের পুতুলটি ঠিক বার করে নিতে পারে। এই চেনার ব্যাপারটায় তার এতটুকু কষ্ট নেই। সুরের বেলাতেও তেমনি। প্রত্যেক দেশের বা প্রত্যেক অঞ্চলের লোকগীতে একটি স্বকীয় রাগরূপ ফুটে ওঠে। সেই রাগরূপেরও একটি বিশেষ পকড় বা সুরের অভিজ্ঞান থাকে। যেমন, আসাম উপত্যকার প্রাণ-ভোমরাটি লুকিয়ে আছে স জ্ঞ ম প-রচিত মধুচক্রটির মধ্যে। এটিকে অসমীয়া জাতির 'পকড়' বলা চলে। শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর বইতে আরও দেখিয়েছেন যে নেপালী লোকগীতের প্রাণটি স র ম প ধ প ম র ধ্ স-জাতীয় দুর্গারাগের পর্দায় ধরা পড়ে।

গ্রন্থমধ্যে ইতস্তত ভাবে এই রকম আরও অভিজ্ঞান আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি। "ভাটিয়ালীর অবরোহণে প ম গ ব ম ণ্ ধ্ মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম, ভাটিয়ালীর 'পকড়' বা প্রাণ সেখানেই। সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রাণ-ভোমরার এটাই হলো ফটিক মিনার।"

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের গ্রন্থ পড়তে পড়তে মনে হয় মার্গসঙ্গীতের নিয়মাবলীর কাঠামোতে লোকসঙ্গীতের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ কোনও কোনও লোকগীত শুনে তাকে রাগরূপের ব্যাকরণ অনুসারে চিনতে চেষ্টা করেছেন। যেমন লেখক প্রয়াত সঙ্গীতাচার্য সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতবিদরা এ ব্যাপারে এগিয়ে এলে জাতীয় কর্তব্য পালন করা হবে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের কৃতিত্ব এই যে তিনি এই প্রয়োজনীয়তার কথাটুকু ধরিয়ে দিয়েই থামেন নি। তিনি দেখালেন যে লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঐ ধরণের বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু লোকসঙ্গীতের মূল জিনিস হল তার 'আঞ্চলিক গায়কী, স্বরের রূপভেদ বা timbre, আঞ্চলিক চলনভঙ্গি, ছন্দ এবং উপভাষাগত ফোনেটিকস বা ধ্বনিবিজ্ঞান ও intonation বা বাগ্‌ভঙ্গি ইত্যাদি।'

এখান থেকেই বোঝা যায় যে নিছক academic পণ্ডিতদের মত শুষ্ক কৌতূহল তাঁর নয়। তিনি লোকসঙ্গীতের আলোচনাকালে লোকসঙ্গীত শিল্পীদের সংগ্রামময় জীবনের কথা ভোলেন না। ভোলেন না যে এই সংগ্রামময় জীবন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার জন্য, অবাধ উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-মিলনাত্মক নিরন্তর সাযুজ্যের জন্যই মেঠোসুরের গানের মধ্যে যে ভাঁজ, যে খাঁচখোঁচ রয়েছে তা শহুরে অনুশীলিত কণ্ঠে আসে না। বস্তুত লোকগীতকে এমন সঠিক প্রতিবেশে দেখে তার স্বরূপ আলোচনা আমরা এর আগে কখনও দেখিনি।

গ্রন্থটির মধ্যে ষোলটি প্রবন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে শেষের পাঁচটিতে আসামের লোকউৎসব ও লোকসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত শিল্পীর কথা। 'শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতে সুরবিচারে'র বিষয় তার নামেই স্পষ্ট। তেমনি স্পষ্ট 'লোকসঙ্গীতে যুদ্ধ ও শান্তি' এবং 'বাংলার লোকসঙ্গীতে হিন্দুমুসলিম ঐক্যের সাধনা' প্রবন্ধ দুটি। বাকি প্রবন্ধগুলিতে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন।

লেখক দেখিয়েছেন যে, লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক সমস্যা হল যে এর শহরে জনপ্রিয়তা কি বাড়ছে, অথবা যদি বাড়ে তাতে কি লোকসঙ্গীতের প্রকৃত আস্বাদন পাওয়া সম্ভব, কেননা লোকসঙ্গীত তার পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন কোনও শিল্পব্যাপার নয় অথচ শহুরে মঞ্চে লোকসঙ্গীত পরিবেশনে সেই ব্যাপারই ঘটে যায় প্রথমে। অপর সমস্যা হল গণজীবনের দিনানুদৈনিক কর্মকাণ্ডের থেকে শহরে শিক্ষিত সমাজের বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়ে লোকসঙ্গীতের বিকৃতি। অবস্থা এখন এইরকম যে বিকৃতি যে কতখানি সে বিচার করবার সামর্থ্যও আজ কারও নেই।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাস অবশ্য দেখিয়েছেন যে গণসঙ্গীতকারের অভিজ্ঞতা হল এই 'লৌকিক সুর ও রচনার ভঙ্গি অব্যাহত রেখে' নতুন গান রচনা করলে তা লক্ষ লোকের মনে আলোড়ন তুলবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে 'এটাই লোকসঙ্গীতের রূপান্তরের স্বাভাবিক ধারা।'

রূপান্তর যেমন করতে হবে তেমনি যা আছে, যা ছিল তাকেও সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট সহ জানতে হবে। এ ব্যাপারেও শ্রীযুক্ত বিশ্বাস সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তা ধরা পড়েছে। সেজন্য তিনি এর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি শ্রেণীসমাজের দারিদ্র্যের গর্ভেই যে লোকসঙ্গীতের জন্ম তার বিশ্লেষণও করেছেন। 'লোকসঙ্গীতের সংকটের স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে 'সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবের প্রকাশ হয় সুর বা সুরাংশকে অবলম্বন করে' অথচ গিয়ে পৌছয় পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রূপে। তিনি উদ্ধৃতি তোলেন এক শিল্পীর : 'It is the people who create music. We only arrange it.' তিনি লোকসঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে আধুনিক সহায়ক যন্ত্র-গুলির ব্যবহারের সমস্যাও আলোচনা করেন এবং লোকগীতের 'আঞ্চলিকানা'র বিশুদ্ধতা রক্ষার দাবীর ক্ষেত্রেও আপোষ করতে রাজী হন না। আবার সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের সাফল্যের আনন্দ ও

শ্রমের বঞ্চনার ইতিহাস কীভাবে তার গানের মাধ্যমে ধরা পড়েছে তাও তুলে ধরেন। মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অধিকারহীনতা, পুরুষপ্রাধান্য, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বৈধব্যপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ক্ষোভ যে কীভাবে আমাদের লোকগীতগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে—কীভাবে যে মধ্যযুগীয় সমাজে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ লোকভাবনার দ্বন্দ্বাত্মক প্রকৃতির উপরও তার আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রলেপ ফেলেছে এবং মৃত্যুভয় শাসনে প্রাণবন্ত সঙ্গীতকে কাব্যহীন প্রাণহীন পৌনঃপুনিকভাবে উচ্চারিত বিষয়ে নিয়ে গেছে সেকথা সুনিপুণ বিশ্লেষণে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিশ্লেষণের এই নিপুণতা এক প্রচণ্ড সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীল মন ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত উপভাষা, উপমা ও উচ্চারণ নিয়ে তাঁর উক্তিসমূহ আমাদের নতুন করে বিচ্ছিন্নতার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তিনি লিখেছেন : 'আমাদের উপভাষাগুলোর শ্রমজীবনের কর্মপ্রক্রিয়ার দ্যোতক শব্দগুলো বা বাক্যভঙ্গি প্রবাদবাক্য ইত্যাদি থেকে বাংলাভাষা নিজেকে বিশেষ সমৃদ্ধ করতে কি পেরেছে? তা পারেনি, বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধ ও লৌকিক এই দুই ধারার মধ্যে এক অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ বিরাজমান।'

লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও গীতরীতির মধ্যে তিনি সঙ্গীততাত্ত্বিক দিক থেকে বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। এরমধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের পার্থক্য যে কেবল সম্পূর্ণ ষাড়ব, ঔড়ব এবং চতুঃস্বরিক জাতির পার্থক্য এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। লোকসঙ্গীতেও চার, পাঁচ ছয় ও সাতস্বরের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েদের একান্ত নিজস্ব গৃহকর্মে আচারে অনুষ্ঠানে, যেমন ধরা যাক ঘুম-পাড়ানিয়া গান বা বিয়ের গানে রাজস্থান থেকে আসাম পর্যন্ত প্রায় যে একই ঘরানার, 'অনেকসময় যার scale বা ঠাট সাধারণভাবে সেই অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতের থেকে পৃথক'—এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রনিরীক্ষার ফলশ্রুতিটি চমকপ্রদ। এ যেন তাঁরই উদ্ধৃত লোকসঙ্গীতের দুটি কলিকেই প্রমাণ করছে : নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ। জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত। এমনি নানান চমকপ্রদ তথ্য, সুনিপুণ বিশ্লেষণ, চিন্তার উপাদান যোগানো, সমগ্র দরিদ্র, শোষিত মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঙ্গীতের নবমূল্যায়ন, ইত্যাদির সমাবেশে গ্রন্থটি অসাধারণ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। কেবল একটিই প্রার্থনা। তা হল

বিভিন্ন সময়ে লেখা এসব প্রবন্ধ সংকলন যেমন আছে থাকুক। বিভিন্ন সমস্যা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি আরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ রচনা করুন। বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সেটি হোক আরও একটি ফলপ্রদ কশাঘাত।

—প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

আমাদের দেশ ঃ একটি অর্থনৈতিক পরিচয়—নির্মল সেনগুপ্ত (বীক্ষণ প্রকাশনী, কলিকাতা-১৪ ; ছ টাকা)

১৯৬৭-র পর থেকে এদেশের কমিউনিস্ট রাজনীতি বড়ো জটিল হয়ে গেছে। মোটামুটি যে ধরণের ফরমূলা দিয়ে শ্রেণী, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল, নকশালবাড়ি-অনুপ্রাণিত রাজনীতি বহু ক্ষেত্রেই সেগুলিকে অ-পর্যাপ্ত বলে প্রমাণ করেছে। বহু নতুন ধারণার ও শব্দের আমদানি হয়েছে। যেমন, মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজি, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, ইত্যাদি। প্রায়শঃই এইসব নতুন ধারণা ও শব্দের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার বদলে আপ্তবাক্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা যেটুকু মিলেছে, তা-ও এত বেশি বিশ্ববিদ্যালয়িক পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত যে সাধারণ শিক্ষিত উৎসাহী পাঠকের তা অগম্য।

অবশেষে একটি বই পাওয়া গেল যাতে ঐরকম পাঠকের কথা মনে রেখে এদেশের অর্থনৈতিক শ্রেণীগত শোষণের একটা চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। নির্মলবাবুর বইটি যে পুরোপুরি অভাব মেটাতে পেরেছে, এমন কথা নিশ্চয়ই বলবোনা, কিন্তু একথা অবশ্যই বলবো যে সে-অভাব মেটানোর পথে এ বই একটা মস্ত পদক্ষেপ। সহজ কথা যায়না বলা সহজে। এত সহজ করে নির্মলবাবু কথা বলতে পারেন, এমন আশ্চর্য ছবি তুলে ধরেন সমাজের, শোষণের, যে ঈর্ষা জাগে। সরল করে বলতে গিয়ে অতিসরল করে ফেলার সমস্ত বিপদ সত্ত্বেও নির্মলবাবুর সাফল্য বহুলাংশে বিস্ময়কর। আগে তত্ত্বটা বলে নিয়ে, তারপর সমর্থক ব্যাখ্যা জোগানোর প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে লেখক এখানে প্রতিদিনের চোখে দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে তত্ত্বে পৌঁছে দিয়েছেন পাঠককে। বলা বাহুল্য, এর ফলে উৎসাহী কিন্তু তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তাঁর যুক্তি অনেক সহজে গ্রহণীয় হবে।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আমরা সকলেই একমত যে আমাদের

'স্বাধীনতা' ঝুটা। এদেশটা আসলে হরেকরকমের সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়াক্ষেত্র। এটা প্রমাণ করতে গিয়ে পণ্ডিত অর্থনীতিবিদরা ভূরি ভূরি তথ্য হাজির করেন। কিন্তু পরিসংখ্যানের সারণী দেখলেই যে পাঠক পিছিয়ে যান, তাঁর কাছে ব্যাপারটাকে কীভাবে উপস্থাপন করা যাবে? জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কোনো না কোনোভাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি কীভাবে আমাদের ঘিরে আছে তার একটা মর্মগ্রাহী ছবি এঁকে নির্মলবাবু পাঠককে প্রশ্ন করেছেন: এই কি স্বাধীনতা? এ কাজে তাঁর সাফল্য এত চমকপ্রদ যে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলানো শক্ত।—"সকালবেলা ঘুম ভাঙল ঘড়ির অ্যালার্মে। জনতা ঘড়ি, হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স্-এর (HMT) তৈরি, জাপানী সহযোগিতায়। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে নিলেন। টুথপেস্ট এবং টুথব্রাশ কলগেট-পামঅলিভ বা হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী। ততক্ষণে গিন্নী চা করে ফেলেছেন—লাল প্যাকেটে মোড়া ব্রুক বণ্ডের চা। ব্রুক বণ্ডের চা যদি ভালো না লাগে তবে খান 'লিপ্টন'-এর চা। দুটোই ব্রিটিশ কোম্পানি। এরপর ধীরে সুস্থে স্নান করতে যাবেন। সাবান মাখবেন? সে সস্তার লাইফবয়ই মাখুন বা দামী রেক্সোনাই মাখুন দুটোই হিন্দুস্থান লিভার কোম্পানীর তৈরি—ব্রিটিশ Unilever কোম্পানীর হিন্দুস্থানী শাখা। কাপড় কাচেন সানলাইট বা সার্ফে। তারও প্রস্তুতকারক হিন্দুস্থান লিভার কোম্পানী।' এমনি অজস্র ঘটনা তুলে ধরেছেন লেখক। এগুলোর প্রত্যেকটাই নিতান্ত সাদামাটা এবং সাধারণ বলেই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাঠককে একটু চমকে দেয় এগুলো, ভাবতে শেখায়। প্রত্যেকটা জিনিষেরই গায়ে ছাপমারা 'মেড ইন ইণ্ডিয়া,' অথচ ওগুলো তৈরি করে বিদেশী কোম্পানী। আমাদের স্বাধীনতা ব্যাপারটাও ঠিক অমনি।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণ সম্পর্কে প্রাক্-নকশালবাড়ি যুগের কমিউনিস্টরা বলতেন যে ওরা ভারী শিল্পে চট্ করে বিনিয়োগ করতে চায় না, পাছে ভারী শিল্পের বনেদ তৈরী হলে ভারত স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, তাঁরা বলতেন, সোভিয়েত রাশিয়া বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশেই সাহায্য করে, এবং এর ফলে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভরতা কমবে। আরো অনেক কিছুর মতো এই ধারণার অসত্যতাকেও প্রমাণ করে দিয়েছে নকশালবাড়ি-অনুপ্রাণিত রাজনীতি। সরকারী মালিকাধীন ভারী শিল্পক্ষেত্রে "সহায়তা"টাও যে এক ধরণের শোষণ হতে পারে, ভারতে সোভিয়েত কার্যকলাপ তার প্রমাণ। এ ব্যাপারেও নির্মলবাবু

বেশ পরিষ্কার করেই লিখেছেন, যদিও তাঁর তথ্য পর্যাপ্ত নয়। এ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য কিন্তু আজকাল সহজলভ্য।

আরেকটা কঠিন বিষয় আধা-সামন্ততন্ত্র। এক্ষেত্রেও লেখক তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি, অর্থাৎ চোখে-দেখা বাস্তব থেকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে তত্ত্বে পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর আলোচনা যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু আধাসামন্ততন্ত্র-তত্ত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি এত বেশি যে কোনো আলোচনাই যথেষ্ট তৃপ্তিকর বলে মনে হয় না।

লেখকের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। যেমন '১৯৪৭-র শুরুতে নেতারা প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন' (পৃ. ৫৫)। মুৎসুদ্দি শ্রেণীচরিত্র নিয়ে "প্রকৃত" স্বাধীনতার জন্য কি চেষ্টা করা যায়?

কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ নিয়েও প্রশ্ন আছে। যেমন, 'অর্ধ-সামন্তী।' আধা-সামন্ততান্ত্রিক কথাটাই প্রচলিত, এবং ইতিমধ্যে গৃহীত। কিংবা Finance Capital-এর বাংলা হিসেবে 'বিত্তীয় পুঁজি; হয়তো এটা 'লগ্নী পুঁজির' চেয়ে বেশি যথার্থ, কিন্তু প্রচলিত এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত পরিভাষার বদলে এখন নতুন শব্দ চালু করতে গেলে লেখকের যেটা প্রধান উদ্দেশ্য—পাঠককে যথাসম্ভব কম হোঁচট খাওয়ানো—সেটাই কি মার খেয়ে যায় না?

এগুলো অবশ্য গৌণ আপত্তি। ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই কৃশকায় (১০০ পৃ.) বইটি বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হতে পারে, কিন্তু সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক বা রাজনৈতিক কর্মীর কাছে এর গুরুত্ব অনেক। সুসম্পূর্ণতার কোনো অবাস্তব দাবি নেই লেখকের। কিন্তু সহজ করে কথা বলার কঠিন কাজে যে মুন্‌শিয়ানা তিনি দেখিয়েছেন তার জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণতর সংযোজনের অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

—বাদল দে

Registered with the Registrar of Newspapers for India under 27079/74 Vol V No. 3
Price Rs. 4.50

THE STALIN QUESTION

স্তালিন–শতবর্ষে অনন্য শ্রদ্ধার্ঘ্য

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভের "গোপন" বক্তৃতার পর থেকেই স্তালিন অনেকের কাছে হয়ে গেলেন "প্রশ্ন"। স্তালিনকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন প্রশ্নে দুনিয়া জুড়ে বিতর্কের ঝড় বয়েছে। এই প্রথম সেই সমস্ত বিতর্ক একত্রে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এতে থাকছে: ক্রুশ্চভের "গোপন" বক্তৃতা, লেনিনের "টেস্টামেন্ট", ট্রট্স্কি, কামেনেভ প্রমুখের প্রাসঙ্গিক রচনাংশ, মাও সেতুঙের স্তালিন-মূল্যায়ন, ইত্যাদি; এবং, সর্বোপরি থাকছেন স্তালিন স্বয়ং।

শ্রীবনবিহারী চক্রবর্তী–সম্পাদিত *The Stalin Question* স্তালিনের বস্তুগত মূল্যায়নের পক্ষে অপরিহার্য এক অমূল্য দলিল। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ৫ (পাঁচ) টাকা জমা দিয়ে ৩০% কমিশনে বইটি সংগ্রহ করার সুযোগ নিন। আনুমানিক মূল্য ৩৫ টাকা।

Naxalbari and After: A *Frontier* Anthology in 2 vols. এখনো পাওয়া যাচ্ছে।

কথাশিল্প

১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩